বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

শ্রীকামিনীকান্ত সেন

এক টাকা

নিবেদন

এই বইখানি লেখা হয়েছে ছেলেমেয়েদের জন্য। বইখানিতে প্রধান প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের কথা ও বিশেষভাবে প্রত্যেকটির ক্রমোন্নতির ধারা সহজ ও সরল ভাষায় বিবৃত করতে চেষ্টা ক'রেছি। ছেলেমেয়েরা বইখানি প'ড়ে কিছু আনন্দলাভ করলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব'।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

জেমস ওয়াট

[ষ্টিম ইঞ্জিনের কথা দ্রষ্টব্য]

রাইট ভ্রাতৃদ্বয়

[এরোপ্লেনের কথা দ্রষ্টব্য]

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

ছাপাখানার জন্মকথা
ও
জন গুটেনবার্গ

আমরা এখন যে সব বই, মাসিকপত্র ও খবরের কাগজ পড়ি, তা' সবই ছাপাখানাতে যন্ত্রের সাহায্যে ছাপা হ'য়ে থাকে—একথা তোমরা সবাই জান। কত রকমের রঙচঙে সুন্দর মলাটে বাঁধান বিচিত্র ছবিতে ভরা গল্পের বই, কবিতার বই, স্কুলের পড়ার বই, আরও নানা রকমের কত কি বই তোমরা বই'র দোকানে সাজান দেখ্‌তে পাও। এই সমস্তই এরূপ সুন্দর সাজে সজ্জিত হ'য়ে ছাপাখানা হ'তে বেরিয়ে আসে। এই ছাপাখানার জন্মকথা, বোধ করি, তোমাদের

মধ্যে অনেকে জান না। মুদ্রাযন্ত্রের কখন কোথায় জন্ম হ'ল ও ধীরে ধীরে তা বেড়ে উঠে আজ কি করে এমন বিরাট আকার ধারণ করল সেই গল্প এখন তোমাদের বলব।

এমন একসময় ছিল, যখন এসব ছাপাখানা ছিল না। তখনকার দিনে পুস্তকাদি সব হাতেই লেখা হ'ত। মাইনে দিয়ে লোক রেখে বই লেখান হ'ত। ইউরোপে ধর্ম্মযাজকরাও অনেক সময় নিজের হাতে বই লিখতেন। আমাদের দেশেও পুস্তক, পুঁথি প্রভৃতি আগেকার দিনে হাতেই লেখা হ'ত। এখনও এরকম হাতেলেখা অনেক পুঁথি কোন কোন জায়গায় সযত্নে রক্ষিত আছে দেখা যায়। তখনকার দিনে এক একখানি বই লেখা এত পরিশ্রম ও ব্যয়সাধ্য ছিল ও তাতে সময়ও এত বেশি লাগত যে, বইয়ের দাম করতে হ'ত খুবই বেশি। আর এত দাম দিয়ে কিনে ক'জন লোকই বা বই পড়তে পারে! কাজেই তখনকার দিনে ধনশালীরাই বই কিনতে পারত। সাধারণ লোকের পক্ষে তা' কিনে পড়া একরকম অসম্ভব ছিল, এই কারণে দেশের অধিকাংশ লোককে তখন বাধ্য হ'য়ে অজ্ঞ ও নিরক্ষর হয়ে থাকতে হ'ত। এখনকার দিনে কত লক্ষ লক্ষ পুস্তক ছাপাখানা হ'তে সহজে মুদ্রিত হয়ে আস্‌ছে, আর কত অসংখ্য লোক তা' পড়ে' জ্ঞান অর্জ্জন করছে। পুস্তকাদির দাম এখন এত সুলভ হয়েছে যে, বলা যায় এই মুদ্রাযন্ত্র আজ বিদ্যামন্দিরের দুয়ার ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলেরই নিকট উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

বহুপূর্ব্বকালে চীনদেশেই সর্ব্বপ্রথম কাঠের ওপর অক্ষর খোদাই করে' পুস্তক মুদ্রিত করবার উপায় উদ্ভাবিত হয়, পরে কোরিয়াতেও কাঠের ও মাটির অক্ষর তৈরি করে' তা' সাজিয়ে নিয়ে পুস্তকাদি মুদ্রিত করা হ'ত। কিন্তু চীনদেশে কি কোরিয়াতে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য আর বেশি

দূর অগ্রসর হ'তে পারেনি। বর্ত্তমানকালের মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবন এসব দশে হয়েছিল এ কথা ঠিক বলা যায় না।

যে অদ্ভুত প্রতিভাশালী পুরুষকে বর্ত্তমানকালের মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবন-কর্ত্তা বলা যায়, তাঁর নাম জন্ গুটেন্‌বার্গ।

গুটেন্‌বার্গ জার্ম্মানীর মেন্‌ঝ সহরে ১৪০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। খুব উন্নত ও শিক্ষিত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তিনি নিজেও খুব শিক্ষিত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। গুটেন্‌বার্গ হীরা, জহরৎ ও মণিমুক্তা কেনাবেচার ব্যবসা কর্‌তেন। মূল্যবান্ পাথরকাটা কাজে তিনি একজন ওস্তাদ ছিলেন, ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যায়ও তিনি একজন দক্ষ শিল্পী ব'লে তাঁর খ্যাতি খুব কম ছিল না।

কি করে' তাঁর মাথায় মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবনের খেয়ালটি প্রথম উদয় হ'ল তা' বড়ই কৌতুকাবহ ঘটনা। একদিন খাওয়া-দাওয়ার পরে তিনি আর তাঁর স্ত্রী তাঁর দোকানের পেছনের ঘরটিতে বসে বেশ আনন্দে গল্প-গুজব করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ গুটেন্‌বার্গের দৃষ্টি পড়ল গিয়ে একখানি তাসের ওপর। সেই তাসখানি তাঁদের সেই ঘরের মেজের ওপর প'ড়ে ছিল। গুটেন্‌বার্গ তাসখানি তুলে নিয়ে একদৃষ্টে তা' দেখতে লাগলেন এবং তা'কে উল্টেপাল্টে নানাভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন। কিছুতেই তাঁর দৃষ্টি আর অন্যদিকে যায় না। সব গল্পগুজব হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেল। এই ব্যাপারে তাঁর স্ত্রী একান্ত বিস্মিত হ'য়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ঐ তাসখানির ভিতর এমন কি অদ্ভুত জিনিষ রয়েছে যে, তুমি তা' অমন করে দেখছ? তুমি তা' এমন একাগ্রচিত্তে দেখছ যে, কেউ দেখলে ভাববে—তুমি কোন সাধুপুরুষ কি দেবতার মূর্ত্তিই বুঝি বা দেখছ।"

গুটেন্‌বার্গ বল্‌লেন—"আমি ভাবছিলুম এ ছবিখানি কি করে করলে।"

গুটেন্‌বার্গের স্ত্রী বল্‌লেন—"কেন অন্য দশটা ছবি যেমন করে আঁকা হয় এও তেমন করে আঁকা হ'য়েছে। প্রথম কতকগুলো রেখার সাহায্যে ছবিটি সুন্দর করে এঁকে নিয়ে তার ওপর রঙ দেওয়া হ'য়েছে। এ আর এমন কি।"

গুটেন্‌বার্গ বল্‌লেন—"দেখ তা' নয়, এরূপ ছবি আঁকবার তার চেয়ে ঢের সহজ ও সুন্দর উপায় আছে। এই লাইনগুলো প্রথম একখানা কাষ্ঠ-ফলকের ওপর সুন্দর করে আঁকা হয় এবং পরে সে সব লাইনের চারদিককার কাঠ খুব নিপুণভাবে এমন করে কেটে নেওয়া হয় যে, এই চিহ্নিত রেখাগুলো বেশ উঁচু হ'য়ে থাকে। এইভাবে খোদিত মূর্ত্তিটির ওপর ভাল করে' কালি লাগিয়ে পিস্‌-বোর্ডের ওপর তার ছবি মুদ্রিত করে নেওয়া হয়। এনা! এই হচ্ছে খুব সহজ উপায়। আলাদা আলাদা করে এক একখানা কার্ডে ছবি আঁকতে হ'লে ঢের পরিশ্রম ও সময়ের দরকার হয়। কিন্তু এই রকমের একখানি কাঠের ব্লক একবার তৈরি করে নিতে পারলে তা' হ'তে বিনা কষ্টে যত খুসী ছবি কার্ডে ছেপে নেওয়া যায়।"

এই ঘটনার পরে গুটেন্‌বার্গ খুব উৎসাহের সহিত এরূপ ব্লক নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'লেন, ও তিনি স্থিরসঙ্কল্প করলেন যে, এই উপায়ে ছবি এবং পুস্তকাদি সব ছেপে নেবেন।

গুটেন্‌বার্গ প্রথমে এ কাজ সুরু করতে গিয়েই এক টুক্‌রো কাঠ তাঁর দোকান থেকে নিয়ে এসে তার ওপর কয়েকটি রেখা এঁকে নিলেন; এবং সেই চিহ্নিত রেখার চারদিককার কাঠ বেশ সাবধানে কেটে বের করে নিলেন। এইভাবে প্রথম তাঁর স্ত্রীর নামটি খোদাই করে নিলেন। সেই নামটির ওপর কালি লাগিয়ে তা' এক টুক্‌রো কাগজের ওপর রেখে চাপ দিতেই ছাপা হয়ে গেল তা'র স্ত্রীর নামটি। তাঁর স্ত্রী এই উপায়ে

নিজের নামটি মুদ্রিত হ'তে দেখে অতি মাত্র চম্‌কে উঠে আনন্দে বলে উঠলেন—"বাঃ বেশ চমৎকার হয়েছে ত! এ যেন ঠিক হাতের লেখার মত হয়েছে দেখছি!"

গুটেন্‌বার্গের স্ত্রীর এইভাবে চমকে উঠবার কথা শুনে তোমরা বোধ হয় অনেকেই হাসবে। তোমরা বলবে—এতে আশ্চর্য্য হবার এমন কি আছে, একটি আলু কি কচি বেগুন চিরে নিয়ে একটি ছুরির সাহায্যে এ'ত যে কেউ করতে পারে। আর নামের ষ্টাম্প তৈরি করাবার দোকানও ত ঢের ঢের রয়েছে। কিন্তু একটি কথা মনে রেখো যে পাঁচশ বছর আগে যখন গুটেন্‌বার্গ এ কার্য্যে হাত দিয়েছিলেন, তখন পথে ঘাটে নামের ষ্টাম্প তৈরি করবার দোকানও ছিল না। আর এভাবে কিছু খোদাই করতে খুব কম লোকই জানত। তখনকার দিনের লোকেরা এ রকমের কাজ দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত—যেমনটি করে তোমরা এখন চেয়ে থাক, যখন বাতাসের ভিতর দিয়ে, নীল আকাশের নীচ দিয়ে গুঞ্জন করতে করতে ছুটে চলে "এরোপ্লেন্।"

এই প্রথম সাফল্যে অত্যন্ত উৎসাহিত হ'য়ে এবার এই খোদাই কার্য্যে গুটেন্‌বার্গ একাগ্রচিত্তে নিমগ্ন হলেন। তিনি নানা রকম কাঠ পরীক্ষা ক'রে এই কাজের জন্য বেছে নিলেন আপেল কাঠ। এই কাঠ বেশি নরমও নয় অথচ খুব কঠিনও নয়; তাই এই কাঠ তাঁর ব্লকনির্ম্মাণ কার্য্যের জন্যে খুব উপযোগী হবে মনে করলেন। এবার গুটেন্‌বার্গ একখানা কাষ্ঠ-ফলকের ওপর এক সাধুপুরুষের মূর্ত্তি আঁকলেন ও তার নীচে তাঁ'র নামটিও লিখে নিলেন। সেই মূর্ত্তিটি সুন্দররূপে কাষ্ঠ-ফলকের ওপর খোদাই করে নিয়ে যেই কালি লাগিয়ে একখানি কাগজের ওপর চাপলেন অমনি সাধুর মূর্ত্তি ও নামটি দিব্যি ছাপা হ'য়ে গেল। তিনি তখন তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন "দেখ এনা, এ ছবিটি তাসের ছবি হ'তে

পরিষ্কার হয়েছে, তবু সম্পূর্ণ ঠিক হয়নি। আরও ঘন কালিতে ছাপতে হবে, এ কালিটা বড় পাত্‌লা, তাই ছাপতে গিয়ে এমন চুপ্‌সে যায়।”

এইবার তিনি ঘন কালি ও কয়েক রকমের সুন্দর রঙ্ তৈরি করবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অতি সুন্দর ঘন কাল কালি ও কয়েকটি সুন্দর সুন্দর রঙ্ প্রস্তুত করে নিলেন। এখন তাঁর কালি ও রঙ্ সম্বন্ধে আর কোন অসুবিধা রইল না। এবার গুটেন্‌বার্গ এই নূতন কালি ও রঙ্ দিয়ে অনেক সাধু ও ধার্ম্মিক পুরুষের ছবি ছেপে নিলেন ও সে সব ছবি তাঁর দোকানে বেশ সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখলেন।

দোকান ছিল তাঁর হীরা, জহরৎ প্রভৃতি মূল্যবান পাথরের; আর এসব বিক্রি করে তাঁর লাভও হ'ত বেশ ভালরকম। কিন্তু যখন থেকে এই ছবিগুলো দোকানে সাজিয়ে রাখলেন তখন থেকে তা'র খরিদ্দাররা এসে তাঁর এই সব চিত্রের দিকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকত ও সেই চিত্রগুলোকে ও চিত্রকর গুটেন্‌বার্গকে খুবই প্রশংসা করত। যারা নানা মূল্যবান পাথর ও মণিমুক্তা কিনতে আসত তা'রা ছবি দেখে মণিমুক্তা, জহরৎ প্রভৃতির কথা ভুলে গিয়ে ছবি কিনেই বাড়ী ফিরত।

এই রকম কাণ্ড দেখে গুটেন্‌বার্গ একদিন তাঁ'র স্ত্রীকে বল্‌লেন—“দেখ এনা, এরকম ছবি এঁকে দোকানে রাখলে আমার আসল ব্যবসা মাটি হয়ে যাবে দেখছি। দেখ আমার মনে হচ্ছে এই ছবি আঁকা কাজটি বন্ধ করে দেওয়াই ভাল।”

গুটেন্‌বার্গের স্ত্রী বল্‌লেন—“দেখ তা' করো না; এই ছবির কাজটি চলুক, এর পরে এই কাজটি এমন একটি বড় ব্যবসায়ে পরিণত হ'য়ে উঠতে পারে যে, উহা তোমার মূল্যবান্ হীরা, জহরতের কাজ হ'তেও সম্ভবত বেশি লাভজনক হ'য়ে উঠবে। আমারত এই বিশ্বাস।” এই

কথা শুনে গুটেন্‌বার্গ তাঁ'র নূতন ব্যবসাটি বন্ধ করে দেওয়ার মতলব ত্যাগ কর্‌লেন।

এই ছবি অঙ্কনের নূতন আবিষ্কারটি গুটেন্‌বার্গ অতি যত্নের সহিত গোপন করে রাখলেন। এর ভিতরকার কৌশলটি কা'কেও বল্‌লেন না।

একদিন গুটেন্‌বার্গ তাঁর স্ত্রীর পরামর্শ শুনে এই নূতন উপায়ে অঙ্কিত কয়েকটি চিত্র তাঁদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী মঠের পাদ্রিকে দেখালেন। পাদ্রি সাহেব সে সব ছবি দেখে পরম আনন্দিত হলেন ও তাঁর দোকানে যত ছবি ছিল সব কিনে নিয়ে এসে মঠের দেয়ালের গায়ে টাঙ্গিয়ে দিলেন।

একদিন পাদ্রি সাহেব গুটেন্‌বার্গকে পার্চমেণ্ট (parchment) কাগজে, সরের কলমে লেখা একখানি সুন্দর বই দিলেন। বইখানির নাম ছিল 'সাধুজনের জীবনী'। এ বইখানি প্রায় ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী ছিল। সম্পূর্ণ বইখানি লিখিয়ে নিতে অনেকদিন লেগেছিল।

বাড়ী এসে গুটেন্‌বার্গ তাঁর স্ত্রীকে বললেন—"দেখ এই বইয়ের সমস্ত পাতাগুলি আমি যেমন করে কাষ্ঠফলকের ওপর ছবি খোদাই করে ছেপে নিয়েছি ঠিক তেমনি করে ছেপে নেব।"

এ কথা শুনে তাঁর স্ত্রী বললেন "বাঃ চমৎকার বুদ্ধি ত তোমার মাথায় এসেছে। সে বড় এক আশ্চর্য্য জিনিষ হবে। তা' করলে তুমি ত পাদ্রিদের মত বই বিক্রী করতেও পারবে। একবার কাঠের ওপর সব খোদাই করে নিতে পারলে তা' থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এক একখানা বই ছাপা হ'য়ে যাবে। দেখ আর দেরী ক'রো না, শীঘ্র সে কাজে হাত দাও। এবার বোধ করি আমাদের ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন।"

এখন থেকে গুটেন্‌বার্গ একান্তচিত্তে এই কাজে লেগে গেলেন। তাঁর প্রতিদিনকার কাজ শেষ হ'য়ে গেলে তিনি রাতের পর রাত বসে এই

বই ছাপানোর কাজে নিযুক্ত থাকতেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী ছাড়া এই নূতন কাজের বিষয় তাঁর বাড়ীর কি দোকানের কেউ কিছু জানত না। কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন তিনি এইকাজে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় তাঁর দুজন কর্ম্মচারী হঠাৎ তাঁকে দেখতে পায়। তারা অনেক অনুনয়-বিনয় করে তাঁকে বল্লে—"দেখুন আমাদের দয়া করে বলুন আপনি কোন্ নূতন কাজ আরম্ভ করেছেন। আমরা যথাসাধ্য আপনাকে এইকার্য্যে সাহায্য করব। দরকার হয় টাকা-পয়সা দিয়েও আপনাকে সাহায্য করতে রাজি আছি।"

তিনি তা'দের সাধাসাধি ও অনুনয়-বিনয় অগ্রাহ্য করতে না পেরে দুজনকে একাজে যোগ দিতে অনুমতি দিলেন।

এখন থেকে তাঁরা চারজনে মিলে এই খোদাই কার্য্যে লেগে গেলেন। দেখতে দেখতে এক একখানা কাষ্ঠফলকে এক একটি পৃষ্ঠার সমস্ত অক্ষর-গুলো খোদিত হয়ে গেল। যখন সমস্ত বইখানির খোদাই কাজ শেষ হয়ে গেল তখন গুটেন্‌বার্গের স্ত্রী বল্‌লেন—"এখন আমার কথা শোন, আমি যেমনটি বলছি এখন ঠিক সেইভাবে ছেপে নাও।" এনার কথামত তাঁরা প্রত্যেক পাতার একপিঠ ছাপলেন এবং দুটো পাতার খালি দুপিঠ আঠা দিয়ে জুড়ে দিলেন। এইভাবে সাধুর জীবনী ছাপা হয়ে গিয়ে তা' বিক্রীর জন্য প্রস্তুত হ'ল।

প্রথম সপ্তাহে গুটেন্‌বার্গ মাত্র দুইখানি বই বিক্রী করলেন। তখন সাধারণ লোকে লেখাপড়া জানত না বলে' বই বিক্রী তেমন কিছুই হ'ল না। যাঁরা খুব অর্থশালী ছিলেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করে' বই বিক্রীর চেষ্টা করাটাও তখনকার দিনে খুব কঠিন কাজ ছিল। পাদ্রিরা গুটেন্‌বার্গের বই কিনতে রাজী হলেন না। তাঁরা বল্‌লেন তাঁদের দরকারী বই তাঁরা নিজেরাই লিখে নেবেন।

ইহার পরে গুটেন্‌বার্গ পঞ্চাশ পৃষ্ঠার একখানি ব্যাকরণ ছাপলেন। এই বইখানি ছাপা হওয়া মাত্রই তার সব "কপি" বিক্রী হয়ে গেল। কারণ ব্যাকরণখানি গির্জ্জার স্কুলের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক ছিল। আর হাতেলেখা ব্যাকরণ যা' ছেলেদের তখন কিনতে হ'ত তার চাইতে এর দামও ঢের কম ছিল। গুটেন্‌বার্গ এবার খুবই উৎসাহিত হ'য়ে আরও তুইখানি ধর্ম্মপুস্তক ছেপে নিলেন। এ ত্ব'খানি বই তখনকার দিনের পাদ্রিদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। পাদ্রিরা এত অল্পসময়ের মধ্যে এ তু'খানি বই-লেখার কাজ শেষ হ'তে দেখে একেবারে বিস্মিত হ'য়ে গেলেন। তাঁরা গুটেন্‌বার্গকে বল্‌লেন— "আপনি তু'তিন সপ্তাহ পরে পরে চারখানি ক'রে বই নিয়ে আসেন, নিশ্চয় আপনি কোন ভেল্কিবাজি জানেন। আমাদের লেখকদের বই লিখতে যে সময় লাগে আপনি তার অর্দ্ধেক সময়ের মধ্যে বই লিখে আনেন এ বড়ই আশ্চর্য্য! বলুন দেখি, আপনি কি ক'রে এ কাজ সম্ভব করে তোলেন?" গুটেন্‌বার্গ একটুখানি হেসে নীরব হয়ে রইলেন।

সেই মঠের প্রধান ধর্ম্মযাজক যিনি গুটেন্‌বার্গের সবগুলো ছবি কিনে নিয়েছিলেন তিনি অতিশীঘ্রই এর ভিতরকার ব্যাপারটা অনুমান করে নিলেন। তিনি গুটেন্‌বার্গকে বললেন "দেখুন আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি সেই ছবিগুলো যে উপায়ে ছেপেছিলেন, এই বইগুলিও নিশ্চয়ই সেই কৌশলেই ছেপেছেন। আচ্ছা, এবার আপনি আমাকে একখানি বাইবেল ছেপে দিন।"

গুটেন্‌বার্গ প্রধান পাদ্রিকে বল্‌লেন সে কাজের জন্য তাঁকে যদি পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তবে তিনি সে কাজ হাতে নিতে পারেন। পাদ্রিসাহেব তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে তিনি সেই কাজ গ্রহণ

করলেন। বাড়ীতে ফিরে এসে তিনি তাঁর স্ত্রীর সহিত এবিষয়ে অনেকক্ষণ পরামর্শ করলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন "দেখ এই বইখানি হ'ল সাতশ পৃষ্ঠাব্যাপী। যদি আমি আমার অবসর সময়ে বসে এ কাজ করি, তবে মাসে দু'পৃষ্ঠামাত্র খোদাই করতে পারব। আর সমগ্র বাইবেলখানির কাজ শেষ করতে আমার লাগবে পুরোপুরি তিরিশ বছর!"

এনা একটু চিন্তা করে বললেন—"হাঁ, তুমি যদি এ কাজ একা করতে যাও তবে ত তুমি বইখানি শেষ করবার আগেই বুড়ো হয়ে যাবে। আচ্ছা, এক কাজ কর না কেন, তোমার আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে একাজটি শীঘ্র শেষ করে ফেল না।"

এনার কথা শুনে এবার গুটেন্‌বার্গ তাঁ'র কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে একাজে নিযুক্ত হ'লেন। যখন প্রথম পৃষ্ঠার ব্লকখানি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ তাঁর হাত থেকে ছুড়িখানি ব্লকটির ওপর পড়ে গিয়ে তাকে দু'খানা করে দিলে। হায়! হায়! গুটেন্‌বার্গের এত পরিশ্রমের কাজ নিমেষে নষ্ট হ'য়ে গেল। গুটেন্‌বার্গ একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন, ও মাথায় হাত দিয়ে তাঁর এই দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগলেন। অনেক সময় দেখা যায় যা' মঙ্গল তা' আমাদের কাছে উপস্থিত হয় বিপদের রূপ ধরে; গুটেনবার্গের জীবনেও হ'ল তাই। এই আকস্মিক বিপদের কথা চিন্তা করতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা চমৎকার বুদ্ধির উদয় হ'ল। তিনি ভাবলেন যে ভাঙ্গা ব্লকটিতে খোদাই-করা প্রত্যেক অক্ষরটি যদি কেটে কেটে আলাদা করে নেওয়া হয় এবং সেই অক্ষরগুলো পৃথক ভাবে ব্যবহার করা হয় তবে ত মুদ্রাঙ্কণকার্য্য খুব সহজে এবং সুন্দরভাবে হ'তে পারে।

কোরিয়াতে এর দুশ বছর আগে কাঠের ও মাটির অক্ষর

পর পর সাজিয়ে নিয়ে বই ছাপান হ'ত। গুটেন্‌বার্গ কিন্তু এই খবর মোটেই জানতেন না। এই অভিনব আবিষ্কারটি তাঁর মধ্যে খুব একটি নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃজন করে তুললো; এবার গুটেন্‌বার্গ ও তাঁ'র বন্ধুরা মিলে এক একটি অক্ষর আলাদা আলাদা খোদাই করে স্তূপাকার ক'রে ফেললেন। এরকম অক্ষরগুলোকে বলা হয় "টাইপ"। গুটেন্‌বার্গ প্রথম এইরূপ কতকগুলো "টাইপ" পর পর সাজিয়ে তা' বেশ শক্ত করে একগাছা দড়ি দিয়ে বেঁধে নিলেন। এই অক্ষরগুলো দিয়ে প্রথম ছেপে নিলেন দুটি শব্দ—"ভাল লোক"। তিনি এবার এক একটি বিশেষ অক্ষরের জন্য পৃথক করে এক একটি বাক্স তৈরি করলেন; এবং পরে এইরূপ টাইপ থেকে সহজে ছাপ নেওয়ার জন্য একখানি ছোট্ট কাঠের মুদ্রাযন্ত্র (press) নির্ম্মাণ করে নিলেন।

এই সময়ে গুটেন্‌বার্গের একজন অংশীদার-বন্ধুর মৃত্যু হয়। সেই বন্ধুর মৃত্যুর পরে তাঁর উত্তরাধিকারীরা এই নূতন ছাপাখানার অংশ দাবী করে বসেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় গুটেন্‌বার্গের ছাপাখানাটা তাঁর যে বন্ধু মারা যান, তাঁরই বাড়ীর একাংশে স্থাপিত ছিল।

"হায়! হায়! এরা আমার নূতন উদ্ভাবিত মুদ্রাযন্ত্রের সমস্ত গোপন কৌশলটি জেনে নিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করবে"—এই বলে গুটেন্‌বার্গ একটা হাতুড়ী দিয়ে তাঁর সযত্নে তৈরি টাইপগুলো ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেললেন। গুটেন্‌বার্গ এবার এসব কাজ ছেড়ে দিয়ে আবার তাঁর পুরাণো ব্যবসায়ে মন দিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী বার বার তাঁকে বল্‌লেন যে মুদ্রাযন্ত্রের কাজটি যেন তিনি আবার নূতন করে আরম্ভ করেন।

এবার গুটেন্‌বার্গ তাঁর জন্মভূমি মেন্‌য্‌ সহরে ফিরে এলেন। তিনি ভাবলেন এখানে তাঁর নবোদ্ভাবিত মুদ্রাযন্ত্রের কৌশলাদির

কোন কথাই কেউ জানে না। এখানে থেকেই তিনি তাঁর সেকাজ আবার সুরু করলেন। এই সময়ে মেন্‌ঝ সহরে ফাষ্ট নামে এক ধনীর সঙ্গে ঘটনাক্রমে তাঁর পরিচয় হয়। গুটেন্‌বার্গ তাঁর কাছে এই মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় সব কথাই খুলে বলেন। ফাষ্টও সমস্ত কথা শুনে খুবই উৎসাহিত হ'লেন এবং গুটেন্‌বার্গকে বললেন—"দেখুন আমি আপনাকে তিন হাজার ফ্লোরিন্ (প্রায় তিন হাজার টাকা) এ কাজের জন্য ধার দিচ্ছি, আপনি আমাকে আপনার এই ব্যবসায়ের অংশীদার করে নিন্।" গুটেন্‌বার্গ তাঁর এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হ'লেন। তিনি এবার একটি বড় বাড়ী নিয়ে তাঁর মুদ্রাঙ্কণকার্য্য আবার আরম্ভ করে দিলেন। পিটার শোফার নামে আর একজন লোক তাঁদের সঙ্গে এবার যোগ দেন এবং পরে এই ব্যবসায়ের একজন অংশীদার হন। পিটার শোফার এই মুদ্রাযন্ত্রের আরম্ভকালে গুটেন্‌বার্গকে খুবই সাহায্য করেন। শোফারের বুদ্ধি-কৌশলে এই মুদ্রাযন্ত্রের আরও নানাদিক দিয়ে বিবিধ উন্নতি সাধিত হয়।

এই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করবার কিছুদিন পরে তাঁরা দেখলেন যে কাঠের "টাইপ"-গুলোতে বার বার কালি লাগলে তা' নরম হয়ে যায় এবং তা'তে পরে আর পরিষ্কার ছাপ পড়ে না। পিটার ও গুটেন্‌বার্গ অনেক ভেবেচিন্তে এই প্রধান অসুবিধাটি দূর করবার জন্য দস্তা ও য়্যান্টিমনি এই দুই ধাতুতে মিলিয়ে এক নূতন মিশ্রধাতু তৈরি করে তা' দিয়ে টাইপ করতে সুরু কর্‌লেন। এই নূতন টাইপগুলো চমৎকার হল। টাইপগুলো খুব টেক্‌সইও হ'ল এবং তা'তে মুদ্রাঙ্কণকার্য্যও খুব সুন্দর ও নিখুঁত হ'তে লাগল।

১৪৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁরা প্রথম প্রসিদ্ধ মেঝেরিন্ (mazarin) বাইবেল মুদ্রণের কাজ আরম্ভ করলেন। এই বাইবেলখানির মুদ্রণ-

কার্য্য শেষ করতে তাঁদের পুরোপুরি পাঁচ বছর লাগে। কিন্তু এ কাজে তাঁদের যেরূপ লাভ হবে আশা করেছিলেন তার কিছুই হ'ল না। ফাষ্ট গুটেন্‌বার্গের ব্যবসায়-বুদ্ধি দেখে বড়ই নিরাশ হয়ে পড়লেন। তিনি গুটেন্‌বার্গের ওপর বিরক্ত হ'য়ে শোফারকে হাত করবার জন্য তাঁর খুব তোষামোদ আরম্ভ করলেন। তিনি শোফারকে বললেন—"দেখ গুটেন্‌বার্গ এই ছাপাখানার জন্যে আর এমন কি-ই বা করেছে, তুমিই ত নূতন কালি ও টাইপ প্রভৃতি তৈরি করে মুদ্রাযন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করেছ। চল, আমরা গুটেন্‌বার্গকে তাড়িয়ে দিয়ে এ ব্যবসাটা আমাদের দুজনকার করে নিই। গুটেন্‌বার্গ অনেক বাজেকাজে অনর্থক ঢের টাকা নষ্ট করছে। ও যদি এভাবে টাকা খরচ করে তবে ত সে কিছুতেই আমার ঋণশোধ করতে পারবে না।"

শোফার ভাবলেন যদি তিনি ফাষ্টের কথামত কাজ করেন, তবে গুটেন্‌বার্গের প্রতি ভয়ানক অন্যায় ও অকৃতজ্ঞ ব্যবহার করা হয়। আবার ফাষ্টের নাত্‌নীকে শোফার খুব ভালবাসতেন বলে' ও ফাষ্টের নাত্‌নীর সঙ্গে শোফারের এই সময়ে বিয়ের কথাবার্ত্তা চলছিল বলে' তিনি ফাষ্টকেও অসন্তুষ্ট করতে চাইলেন না।

ফাষ্ট গুটেন্‌বাগকে বললেন—"গুটেন্‌বার্গ, আমার টাকা যা ধার করেছ তা' এখন পরিশোধ করে দিতে হ'বে, আমি আর কোন ওজর-আপত্তি শুনতে চাই না বলে রাখছি।"

গুটেন্‌বার্গ বড়ই অধীর হ'য়ে বিনীতভাবে তাঁকে বললেন—"আপনি কি আমার সর্ব্বনাশ করতে চা'ন, আপনি ত জানেন এখন আমার হাতে টাকাপয়সা মোটেই নেই।"

রাগে অন্ধ হয়ে ফাষ্ট বলে উঠলেন—"তোমাকে এক মাসের মধ্যে সব টাকা পরিশোধ করতেই হবে, আমি আর কোন কথা শুনব না।"

গুটেন্‌বার্গ অনেক কাকুতি-মিনতি করে' ফাষ্টকে বল্‌লেন যেন ফাষ্ট তাঁর সর্ব্বনাশ না করেন। কিন্তু ফাষ্ট তাঁর কোন কথায় কর্ণপাত করলেন না। শীঘ্রই ফাষ্ট সুদ ও আসল সব টাকার জন্য নালিশ করে ছাপাখানা ও তাঁর সমস্ত সাজসরঞ্জাম এবং যত সব বই এ পর্য্যন্ত ছাপাখানা হতে মুদ্রিত হয়েছিল, তা' সমস্তই নিজে দখল করে নিলেন।

গুটেন্‌বার্গ এবার একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়্‌লেন। যিনি এই মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবন করলেন ও তার উন্নতির জন্য এতদিন ধরে প্রাণান্ত চেষ্টা করলেন, হায়! তাঁকে আজ একেবারে রিক্তহস্তে পথে এসে দাঁড়াতে হ'ল। এই হ'ল অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস! গুটেন্‌বার্গ মর্ম্মবেদনায় একান্ত কাতর হ'য়ে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকে বল্‌লেন—"এরা আমার নূতন উদ্ভাবনটি কেড়ে নিল। হায়! আমার আর কিছুই রইল না।" কিছুদিন পরে শোফার ফাষ্টের নাত্‌নীকে বিয়ে করলেন এবং তিনি ও ফাষ্ট দুজনে ছাপাখানার কাজ চালাতে লাগলেন।

কিছুকাল পরে ফাষ্ট এই ছাপাখানার কাজ প্রচার করবার জন্য ফ্রান্সে গেলেন। তিনি ফ্রান্সে গিয়ে প্রথম ফ্রান্সের রাজার কাছে একখানি মুদ্রিত বাইবেল ৭৫০ ক্রাউন মূল্যে বিক্রী করলেন। কি করে এমন বই মুদ্রিত হ'ল এ নিয়ে ফ্রান্সে বেজায় জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল। চারদিকে সকলে বলে বেড়াতে লাগল যে ফাষ্ট নিশ্চয়ই কোন ভেল্কী জানে ও কোন ভূতপ্রেতের সাহায্যে খুব সম্ভব এমন অসাধ্য সাধন করেছে। তখনকার দিনে ইউরোপের লোকেরা ভূতপ্রেত-উপদেবতার ওপর খুবই বিশ্বাসবান্ ছিল। একটি-কিছু আশ্চর্য্য

জিনিষ দেখলেই মনে করত নিশ্চয় তা' কোন উপদেবতার কাজ। এইত ছিল তখনকার দিনে ইউরোপের বুদ্ধির দৌড়!

ফাষ্টকে এবার ফ্রান্সের রাজদরবারে ধরে নিয়ে আসা হ'ল এবং রাজা তাঁকে আদেশ করলেন যে, এরূপ বই কিরূপে ছাপা হ'ল তা যেন তিনি খুলে বলেন। কোন্ মন্ত্রবলে উপদেবতাকে বশীভূত করে এমন অদ্ভুত কার্য্য সাধন করেছেন একথাও বোধ করি রাজদরবারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। ফাষ্টকে অগত্যা সব কথাই খুলে বলতে হ'ল। কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে কি উপায়ে বই ছাপান হয় সবকথাই তিনি বললেন, কিন্তু বল্লেন না শুধু একটি কথা—সেটি হচ্ছে গুটেন্‌বার্গের কথা। গুটেন্‌বার্গই যে এই মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম উদ্ভাবন করেন একথাটি গোপন করে তিনি সেখানে বল্লেন তিনিই সেই যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছেন। সকলেই মুদ্রাযন্ত্রের কাহিনী শুনে ফাষ্টকে অত্যন্ত প্রশংসা করতে লাগল। যে সম্মান গুটেন্‌বার্গের প্রাপ্য ছিল, সে সম্মান ও শ্রদ্ধা নিজে লাভ করে ফাষ্ট মেন্‌ৎস সহরে ফিরে এলেন।

অনেকদিন পরে ফাষ্টের কি-জানি-কেন হঠাৎ একদিন ধর্ম্মজ্ঞানের উদয় হ'ল। তাঁর ধর্ম্মবুদ্ধি জেগে উঠবার পরে তিনি বুঝতে পারলেন গুটেন্‌বার্গের প্রতি তিনি কি ভয়ানক অন্যায় ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই অপরাধের জন্য গুটেন্‌বার্গের নিকট তিনি পরে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তাঁকে বিশেষ করে অনুরোধ করলেন যে, তিনি মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবসায়ে পূর্ব্বে যে আসন অধিকার করেছিলেন এখন আবার যেন তাঁর পূর্ব্বতন আসন গ্রহণ করেন। কিন্তু গুটেন্‌বার্গ তাঁর সেই অনুরোধ রক্ষা করলেন না। আট বছর ধরে গুটেন্‌বার্গ তাঁর নিজের আর একখানা ছাপাখানা চালাচ্ছিলেন ও তা'তে তাঁর বেশ লাভও হচ্ছিল। এই সময় হঠাৎ তাঁর একান্ত অনুরক্ত স্ত্রী এনার মৃত্যু হয়।

এনার মৃত্যুতে গুটেন্‌বার্গ একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়লেন—কোন কার্য্যে তাঁর আর উৎসাহ রইল না। তিনি তাঁর সমস্ত কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করে শোকাহত চিত্ত নিয়ে দেশভ্রমণে বেরুলেন। ইউরোপের সকলেই এই সময় জানতে পারল যে গুটেন্‌বার্গই মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবনকর্ত্তা। এই অমূল্য উদ্ভাবনের জন্য সমগ্র ইউরোপবাসীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্বর্ণমুকুট এবার তিনিই লাভ করলেন। জার্ম্মানীর রাজা গুটেন্‌বার্গের জন্য একটি জীবনবৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। গুটেন্‌বার্গ এই বৃত্তি লাভ করে তাঁর জীবনের অবশিষ্ট কাল আরামে ও শান্তিতে অতিবাহিত করেন। এই সময়ে জার্ম্মানীর প্রায় প্রত্যেক সহরে, ও ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও ইটালির নানা জায়গায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে বহুবিধ পুস্তক মুদ্রিত হতে আরম্ভ হয়।

আগে মুদ্রাযন্ত্রগুলো কাঠ দিয়ে তৈরি হ'ত। এরূপ কাঠের তৈরি মুদ্রাযন্ত্র প্রায় ৩৫০ বছর কাল প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ষ্টেন্‌হোপ্‌ লোহার মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম উদ্ভাবন করেন। পরে এই লোহার মুদ্রাযন্ত্রের নানাদিক দিয়ে নানারকমের উন্নতি সাধিত হয়ে তা' বর্ত্তমান কালের মুদ্রাযন্ত্রের আকার ধারণ করেছে।

এখনকার দিনে মুদ্রাযন্ত্র এমন সুন্দর হ'য়ে উঠেছে যে, টাইপগুলিও এখন যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি হ'চ্ছে, তা সাজিয়ে বসানও হ'চ্ছে যন্ত্রের সাহায্যে, সেই টাইপে আবার কালিও লাগান হয় যন্ত্রের দ্বারা এবং তা' কাগজে ছাপা হয়ে সেই মুদ্রিত কাগজখানিও যন্ত্রের কৌশলেই ঠিকমত ভাঁজ হয়ে আপনা হ'তে মুদ্রাযন্ত্র হ'তে সুন্দর ও সহজভাবে বেরিয়ে আসে।

এখনকার দিনের রোটেরী যন্ত্র, লাইনো-টাইপ যন্ত্র ও মনো-টাইপ যন্ত্র প্রভৃতি মুদ্রাঙ্কণকার্য্যকে খুব সহজ ও সুলভ করে তুলে মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছে।

ঘড়ির জন্মকথা

এমন একদিন ছিল যখন মানুষ পর্ব্বতগুহায় বাস করত, বন্যজন্তু প্রভৃতি শিকার করে বেড়াত এবং তা'র মাংসাদি ও বনের ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করত। তখনকার দিনের কাজকারবারের জন্য ঘড়ির কোন প্রয়োজন তা'রা কখনও অনুভব করত না।

তা'রা সূর্য্য উদয় হ'লে বুঝত দিনের আরম্ভ হ'ল, আর সূর্য্যাস্ত হ'লে বুঝত রাতের সুরু হ'ল। তখন সূর্য্যই ছিল তাদের একমাত্র ঘড়ি; আর সময়ের ছিল মোটামুটি দুটি ভাগ। তার একভাগ হ'ল দিনমান আর একভাগ হ'ল রাত। সূর্য্যের ওঠানামা দেখে তা'রা মাত্র দিনমানটাকে সকালবেলা, দুপুরবেলা, বিকালবেলা ও সন্ধ্যাবেলা এইভাবে মোটামুটি ভাগ করে নিতে পারত।

পরে যখন মানুষের আরএকটু জ্ঞানবুদ্ধি বাড়ল, তখন তারা লক্ষ্য করল যে, সূর্য্যের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে গাছপালার ছায়া, পাহাড়পর্ব্বতের ছায়া সবই যেন চলাফেরা করতে থাকে,—বাড়ে ও কমে। তা'রা দেখতে পেল যে, সকালবেলা সব কিছুর ছায়াই খুব লম্বামতন হয়ে পশ্চিমদিকে পড়ে ও সূর্য্য যেমন ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠতে থাকে, প্রত্যেক জিনিষের ছায়াও তার সঙ্গে সঙ্গে ছোট হতে আরম্ভ হয়। ঠিক আকাশের মাঝখানে সূর্য্য যখন গিয়ে উপস্থিত হয়, তখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়াগুলোও হ'য়ে ওঠে খুবই ছোট। আবার সূর্য্য যখন পশ্চিমদিকে নাম্‌তে সুরু করে, ছায়াগুলোও তা'র সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। কিন্তু এবার ছায়াগুলো পড়ে ঠিক

উল্‌টোদিকে। তা'রা আরও দেখল সূর্য্যাস্তের সময় আবার ছায়াগুলো খুব লম্বামতন হয়ে পড়ে, কিন্তু সূর্য্যোদয়ের সময় তা' ঠিক যেদিকে পড়ে সন্ধ্যের সময় পড়ে তার ঠিক উল্টোদিক হয়ে। এসব লক্ষ্য করে তখন তারা ভেবেচিন্তে সময়নির্ণয় করবার জন্য মোটামুটি একটি উপায় বার করল।

একটি সোজাকাঠি মাটিতে পুঁতে সূর্য্যোদয়ের সময় কাঠিটির ছায়া যেদিকে পড়ল, তা' লক্ষ্য করে' ঠিক তার শেষসীমানায় একটি দাগ দিয়ে দিল; পরে সূর্য্যাস্তের সময় কাঠিটির ছায়াটি গিয়ে যখন ঠিক উল্টোদিক হয়ে পড়ল সেই ছায়াটির শেষপ্রান্তে আর একটি দাগ দিয়ে নিল। এই কাঠিটির ছায়াটির কমাবাড়া নিয়ে তা'রা তা'দের দিনমানের সময়ের ভাগ নিজ নিজ বুদ্ধিমত ঠিক করে নিত। কিন্তু বৃষ্টিবাদলার দিনে তাদের এরূপ ঘড়িতে কোন কাজই হ'ত না।

তা'রা কি আর করবে, এরকম করেই তা'দের কাজকারবার চালাতে হ'ত। এই ছিল তা'দের ঘড়ি।

বহুশতাব্দী পরে যখন মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি খুব বেড়ে গেল, তখন তা'রা সময় নির্দ্ধারণের জন্য নূতন এক উপায় বার করল। এই যে নূতন সময়নির্ণায়ক জিনিষটি উদ্ভাবিত হ'ল তার নাম হ'ল "সূর্য্যঘড়ি" (Sun Dial)। এই রকমের ঘড়ি ইটের বা পাথরের গাঁথনি দিয়ে তৈরি হ'ত। এই ঘড়ি নানা আকারে তৈরি হ'ত। সাধারণত সূর্য্যঘড়ির ওপরে একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা থাকত, এই বৃত্তের চারদিকে ১, ২, ৩, এই রকম সংখ্যা সমান্তরালে আঁকা থাকত—যেমন এখনকার দিনের ঘড়ির ফলক চিহ্নিত করা থাকে অনেকটা সেরকম। এই বৃত্তের মাঝখানে উঁচু ও সরুমুখ করে, ক্ষুদ্র থামের মতন একটি সময়নির্ণায়ক তৈরি করে দেওয়া হ'ত, যা'তে সূর্য্যের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে সেই

ক্ষুদ্র থামের সরু মাথাটির ছায়াটি এসে পরপর বৃত্তের ওপরকার সংখ্যা-গুলোকে ছুঁয়ে যায়। এই হ'ল মানুষের প্রথম ঘড়ি।

এখনকার দিনেও এই সূর্য্যঘড়ি কোন কোন জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ঘড়ি কেবল দিনেরবেলায়ই চলত আর সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এই ঘড়িও বন্ধ হয়ে যেত। আবার যেদিন আকাশ পরিষ্কার থাকত সেদিন সূর্য্যঘড়িতে সময় বোঝা যেত, কিন্তু বাদলার দিনে হ'ত মহা মুস্কিল,—তখন সময় ঠিক করার আর উপায় থাকত না।

কিন্তু মানুষ যখন উন্নতির পথে আরও অগ্রসর হ'তে লাগল, তখন দিনরাত সব সময়ই যা'র সাহায্যে সময়নিরূপণ করা যেতে পারে এমন কোন যন্ত্র উদ্ভাবন করবার জন্য সে বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়ল। অনেক চিন্তার পরে এবার উদ্ভাবিত হল "জলের ঘড়ি"। এই ঘড়ির ইংরেজী নাম হ'ল clepsydra. একটি জলপাত্রের ঠিক নীচে খুব ক্ষুদ্র একটি ফুটো করা থাকত। পাত্রটি জল পূর্ণ করে দিলে সেই ফুটো দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে থাকত। পাত্রে ফুটোটি এমনভাবে করা হ'ত যেন সেই ফুটোর ভিতর দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঠিক পরপর সমান অন্তরালে পড়তে থাকে। এই জলভরা পাত্র হ'তে প্রথম ফোঁটা হতে শেষ ফোঁটা পড়া পর্য্যন্ত কতক্ষণ সময় লাগে তা' প্রথম দেখা হ'ত। আর সেই জলপাত্রের ভিতরদিককার গায়ে ১, ২, ৩, এরূপ সংখ্যা এঁকে দেওয়া হ'ত। জলের "লেভেল" (Level) যখন এই সব চিহ্নিত সংখ্যাগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে নীচে নেমে পড়ত তখন এইসব চিহ্নগুলির দ্বারা সময় নিরূপিত হ'ত। ইহার পরে আবার জলঘড়ি হ'ল একটু অন্যরকমের। এই জলঘড়িতে একটি বড় জলপাত্রের ওপরে আর একটি ছোট জল-পাত্র বসিয়ে দেওয়া হ'ত। এই ছোট জলপাত্রটির তলায় একটি ছোট ফুটো করে দেওয়া হ'ত। বড়পাত্রটি হ'তে ছোটপাত্রটির ভিতরে জল

ধীরে ধীরে প্রবেশ করত। ছোটপাত্রটির ভিতরে একটি ক্ষুদ্র শোলা কি টিনের পাত সময় নির্ণায়করূপে ব্যবহৃত হ'ত। যখন ছোটপাত্রটির নীচেকার ফুটো অবলম্বন করে জলটা তার ভিতরে উঠতে থাকত, তখন সেই সময় নির্ণায়কটিও জলের সঙ্গে সঙ্গে উপরদিকে ভেসে উঠত। এই সময়নির্ণায়কটি উঠবার সময় পাত্রের ভিতরকার গায়ে অঙ্কিত ১, ২, ৩ এইরূপ সংখ্যাগুলিকে পর পর পার হয়ে যেত ও সময় কত তাও তার সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়ে যেত।

কিন্তু এই নবোদ্ভাবিত "জলের ঘড়ি" সবদিক থেকে ভাল কাজ দিলেও সব জায়গায় সবসময় তা' দিয়ে কাজ চল্‌ল না। খুব শীতের দেশে শীতের সময় যখন ঠাণ্ডায় জল জমে বরফ হয়ে যেত, তখন এই জলের ঘড়িও একেবারে বন্ধ হয়ে যেত ও সেখানকার লোকদের মহা-বিপদেই ফেলে দিত। এই অসুবিধা দূর হ'ল যখন এই জলের ঘড়ির পরিবর্ত্তে উদ্ভাবিত হ'ল "বালির ঘড়ি" (sand glass)। এঘড়িও এখনকার দিনে কোন কোন জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের এখনকার দিনের কলের ঘড়ি যে ঠিক প্রথম কখন ও কোথায় উদ্ভাবিত হয়েছিল সেকথা ঠিক কেউ বলতে পারে না। অনেকে অনুমান করেন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই ঘড়ি প্রথম উদ্ভাবিত হয়। এই ঘড়ির উদ্ভাবনের পর হ'তে অনেকে এই ঘড়ির নানা রকম উন্নতি বিধানের জন্য এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেন যে, অতি অল্প কালের মধ্যেই তাঁদের একান্ত চেষ্টার ফলে ইহার সমধিক উন্নতি সাধিত হয়।

ইংলণ্ডে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টারের সমুচ্চ গম্বুজের উপর ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম একটি কলের ঘড়ি স্থাপিত হয়। ১২৯২ খৃষ্টাব্দে ক্যাণ্টারবারির গির্জ্জায়ও একটি বড়ঘড়ি স্থাপিত হয়। ইহার পরেই দোলকযুক্ত (Pendulum) ঘড়ির উদ্ভাবন হয়।

"জল ঘড়ি"

দোলক বা 'পেণ্ডুলাম'-যুক্ত ঘড়ির নক্সা
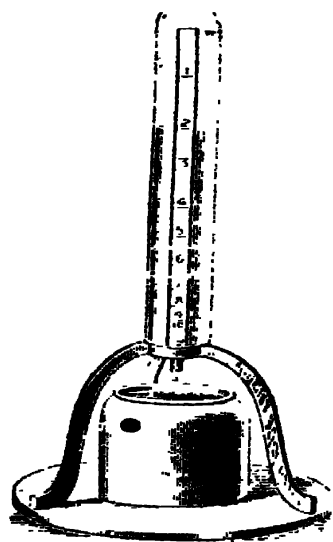
গ্যালেলিও গ্যালেলি নামক ইটালীর সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ ও উদ্ভাবক এই দোলকযন্ত্রটির উদ্ভাবন করেন। একদিন গ্যালেলিও পিসার গির্জ্জায় একটি পিতলের লণ্ঠনের দোলন লক্ষ্য ক'রে একটি বড় তথ্যের আবিষ্কার করেন। তিনি তাঁর নিজের নাড়ীর স্পন্দনের সঙ্গে সেই দোলায়মান লণ্ঠনের প্রত্যেক দোলনক্রিয়াটি তুলনা করে দেখতে পান যে, পর পর প্রত্যেক দোলান-ক্রিয়াটিই একই সময়ে সম্পন্ন হয়। এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করে' তিনি ঘড়িকে দোলকের সাহায্যে চালাবার কৌশল বার করেন। দোলকটি প্রত্যেক বারই নির্দ্দিষ্ট সময়ে দুলে আসে বলে' ঘড়ির কলটিকে তা' ঠিক নিয়মিতভাবে চালাতে পারে। আর এই ঘড়ির কলটি যখন ঠিকমত কাজ করে, তখন ঘড়ির কাঁটাদুটিও ফলকের ওপর ঘুরে বেড়িয়ে সময় নির্ণয় করে দেয়। এই দোলকযন্ত্রটি একবার দুলিয়ে দিলে তা কিন্তু বরাবর চলে না। হাওয়ার বাধা পেয়ে তার গতি ধীরে ধীরে কমে এসে শেষে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এই কারণে এই দোলকটিকে সর্ব্বদা দোলায়মান রাখবার জন্য তাকে স্প্রিংএর সাহায্যে চালাবার বন্দোবস্ত করা হয়। এই দোলকযুক্ত ঘড়ি যদি ধীরে (slow) বা দ্রুত (fast) চলে, তবে এই দোলকটিকে প্রয়োজনমত খাট কি লম্বা করে দিলেই তা ঠিক সময় দেয়। এখন অনেক বড় বড় ঘড়িতে এইরূপ দোলকযন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়।

এখনকার দিনের কলের ঘড়ির ভিতরকার রহস্যটি অর্থাৎ তা' কি করে চলে ও কি উপায়ে সময় নির্দ্দেশ করে এবার তোমাদের তা' বল্‌ছি।

প্রত্যেক ঘড়ির ওপরে একটি ফলক থাকে, তাকে ঠিক বারটা ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। আর ১ হ'তে ১২ সংখ্যা পর্য্যন্ত এই ফলকের উপর অঙ্কিত থাকে। এই যে সমান করে ১২টা ভাগ করা হয়, তা'র

প্রত্যেক ভাগকে আবার পাঁচটা সমান অংশে ভাগ করে নেওয়া হয়। এই বড় বারটি ও ছোট ৬০টি ভাগ প্রত্যেক ঘড়ির ফলকের ওপর অঙ্কিত থাকে। এই অঙ্কিত ফলকের ওপর দুইটি কাঁটা নিয়মিতরূপে ঘুরে বেড়ায়। এ দুটি কাঁটার মধ্যে ছোট কাঁটাটি হ'ল ঘণ্টার কাঁটা অর্থাৎ তা' ঘণ্টার কথা আমাদের বলে দেয়, আর বড় কাঁটাটি হ'ল মিনিটের কাঁটা অর্থাৎ তা' মিনিটের কথা আমাদের বলে দেয়। এদুটি কাঁটা ঠিক কোন্ কোন্ চিহ্নিত দাগের ওপর থাকে তা' দেখে আমরা বুঝতে পারি সময় কত। কিন্তু এই যে দুটি কাঁটা চলে, এই চলার মধ্যে বেশ একটি নিয়ম আছে। ঘড়ির ভিতরকার যন্ত্রটি এমন সুন্দর কৌশলে নির্ম্মিত হয় যে, সেই যন্ত্রের সাহায্যে এই কাঁটা দুটি একটি বিশেষ বিধান মেনে চলে! বড় কাঁটাটি কতটা গেলে ছোট কাঁটাটি কতটা যাবে তার একটি নিয়ম আছে। বড় কাঁটাটি যখন ষাটটি মিনিটের ভাগ ঘুরে আসে, তখন ছোট কাঁটাটি একটি ঘণ্টার ভাগ মাত্র অতিক্রম করে যেতে পারে। ছোট কাঁটাটি বারটি চিহ্নিত অঙ্কের কোন্ স্থানে আছে তা' দেখে জানা যায় কটা বেজেছে, আর বড় কাঁটাটি বারর অঙ্কটি ছাড়িয়ে ডানদিকে ৬০টি মিনিটের ভাগের ক'টা ভাগ ছাড়িয়ে এসেছে তা' দেখে জানা যায় কয় মিনিট হয়েছে। যেমন ছোট কাঁটাটি তিনের অঙ্ক পার হয়ে খানিকটা যদি আসে, আর বড় কাঁটাটি তখন যদি থাকে চারের অঙ্কে অর্থাৎ ছোট ভাগগুলির ২০টা ভাগ অতিক্রম করে', তবে বুঝতে হবে তিনটা বেজে ২০ মিনিট হয়েছে। এইভাবে ঘড়ি দেখে আমরা সময়ের ঠিক করি।

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার যে, এই দুটি কাঁটা কি করে' চলে। এই কাঁটাদুটি চলে ঘড়ির ভিতরকার যন্ত্রের সাহায্যে। এই যন্ত্রের মধ্যে ছোট বড় অনেকগুলি দাঁত বসান চাকা থাকে এবং

এগুলি এমনভাবে দাঁতে দাঁতে সংযুক্ত থাকে যে, একটা চাকা ঘুরলে তার সঙ্গে অন্য চাকাগুলিও ঘুরতে থাকে। আর এইরকম দুটি চাকার সঙ্গে সংলগ্ন থাকে ঘড়ির কাঁটাদু'টি। এই চাকাগুলো এমন কৌশলে এবং এমন নির্দ্দিষ্টমাপে তৈরি হয় যে, তাদের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দুটি কাঁটাও ঠিক নিয়মে চলতে থাকে। মিনিটের কাঁটাটি চলে বেশ তাড়াতাড়ি আর ঘণ্টার কাঁটাটি চলে খুব ধীরে ধীরে। আর এই ঘড়ির ভিতরকার যন্ত্রের চাকাগুলো চলে একটা স্প্রিংএর জোরে। প্রত্যেক ঘড়ির ভিতর ফিতের মত জড়ান একটি স্প্রিং থাকে। এই স্প্রিংটিকে বলা যেতে পারে—ঘড়ির প্রাণ। রোজ, কি সপ্তাহে একবার ক'রে' ঘড়ির চাবি দিয়ে, এই স্প্রিংটিকে গুটিয়ে নিতে হয়। আর স্প্রিংকে জোর করে গুটিয়ে রাখলে তা' আপনার জোরে খুলে আসে। এই গুটানস্প্রিং ধীরে ধীরে খুলে আসবার সময় সেই ঘড়ির যন্ত্রের ভিতরকার চাকাগুলিকে ঘুরাতে থাকে। আর চাকাগুলি ঘুরতে আরম্ভ করলেই তার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির কাঁটাদুটিও চলতে থাকে ও ঠিকমত সময় নির্দ্দেশ করতে সমর্থ হয়।

এখনকার দিনে এই ঘড়ির কতদিক দিয়ে কতরকম উন্নতি সাধিত হয়েছে তা' তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। ছোট ছোট কত বিচিত্ররকমের পকেটঘড়ি, হাতঘড়ি ও আরও কত অসংখ্যরকমের ঘড়ি তোমরা ঘড়ির দোকানে সাজান দেখতে পাও। এমন একদিন ছিল যখন এসব কিছুই ছিল না। এসব দেখে চিন্তার রাজ্যে মানুষ এখন কতটা উন্নতিলাভ করেছে ও তা'র বুদ্ধিবৃত্তি কি পরিমাণ বিকশিত হ'য়ে উঠেছে, তা' আমরা দেখতে পাই।

রেলগাড়ীর জন্মকথা

"রেলগাড়ী চড়ে' তোমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই কোন-না-কোন জায়গায় গিয়েছ। এই রেলগাড়ী হ'বার পর থেকে দেশ-দেশান্তরে যাওয়া আসার কত সুবিধা হয়েছে তা আর কি বলব। বহু দূরবর্ত্তী জায়গায়ও খুব অল্প সময়ের মধ্যে ও খুব কম খরচে যাওয়া এখনকার দিনে এই রেলগাড়ীর প্রসাদে সম্ভব হয়েছে। পূর্ব্বে যেসব দূরবর্ত্তী জায়গায় যেতে বহুদিনের প্রয়োজন হ'ত এই ট্রেন হবার পর হ'তে অতি অল্প সময়েই সে সব জায়গায় যাওয়া যায়।"

একশ' বছর পূর্ব্বে এই রেলগাড়ী ছিল না—এখানেও ছিল না, ইউরোপেও ছিল না। তখনকার দিনে খুব দূরদেশে যেতে হ'লে সাধারণতঃ হেঁটে কিম্বা গরুর গাড়ীতে করে যেতে হ'ত। পথে পথে বিশ্রাম ক'রে গেলেও, দূরের পথ এমনি করে যেতে কি রকম পরিশ্রম হ'ত এবং তা'তে কতটা সময়ের দরকার হ'ত তা' তোমরা সহজেই অনুমান করতে পার। আর এই ভাবে যেতে হ'ত বলে, পথে কত রকম বিপদের সম্ভাবনা ছিল তাও বুঝতে পার। অসুখ বিসুখ হ'য়ে হয়ত পথেই অনেকের মৃত্যু হ'ত। তা' ছাড়া চোর-ডাকাত ও বনের হিংস্র-জন্তু হতেও ভয়ের কারণ ছিল খুবই। যখন থেকে এই রেলগাড়ীর চলাচল সুরু হ'ল তখন থেকে দেশদেশান্তরে যাতায়াতের এরকম আর কোন ভয়ের কারণ রইল না।

"এই রেলগাড়ী উদ্ভাবনের দ্বারা জগতের লোকের যে কতদিকে কত ভাবে, কত মঙ্গল সাধিত হয়েছে তা' বলে' শেষ করা যায় না।"

এখন তোমাদের এই রেলগাড়ী উদ্ভাবনের কথা বলছি। " যে মনস্বী এই রেলগাড়ী উদ্ভাবন করে' জগতের সমূহ কল্যাণ-সাধন করে গেছেন, তাঁর নাম হ'ল জর্জ্জ ষ্টীফেন্‌সন্ (George Stephenson) ।"

তোমাদের ষ্টীম ইঞ্জিনের কথা বল্‌বার সময় বলেছি যে, খুব গভীর কয়লাখনি হ'তে কি করে সহজে কয়লা তুলতে পারা যায়, সে বিষয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে কি উপায়ে ষ্টীম ইঞ্জিন উদ্ভাবিত হ'ল। এইরূপ ষ্টীম ইঞ্জিনকে এক জায়গায় বেশ দৃঢ়ভাবে বসান হ'ত ও স্থিরভাবে এক জায়গায় আবদ্ধ থেকেই তা' কাজ করত। তখন এমন কোন ইঞ্জিনের কথা কেউ কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি, যে ইঞ্জিনকে ইচ্ছানুযায়ী যেখানে খুসী চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে ও যা'কে দিয়ে কোন ভারি জিনিষ এক জায়গা হ'তে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব ক'রে তোলা যায়। কিন্তু জেম্‌স্ ওয়াটের উদ্ভাবিত ষ্টীম ইঞ্জিন যখন সব কয়লা-খনিতে ব্যবহার হ'তে আরম্ভ হ'ল ও তদ্দ্বারা বহু নিম্নবর্ত্তী কয়লাখনি হ'তেও যখন অতি সহজে কয়লা তুলে নেওয়া সম্ভবপর হ'ল, তার কিছুকাল পরেই আবার সকলে ভাবতে সুরু করল এই ষ্টীম ইঞ্জিন দিয়ে কয়লা ওপরে তোলা তো খুবই সহজ হ'ল, কিন্তু এমন কোন উপায় উদ্ভাবন করা যেতে পারে কিনা যা'তে, কয়লা বোঝাই করা গাড়ীগুলো টেনে বাজারে নেওয়া যেতে পারে।

এই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা প্রথম এইরূপ অচল স্থানে আবদ্ধ কত-গুলো ইঞ্জিনকে রাস্তার উপর কতকটা দূরে দূরে পর পর বসিয়ে দিলেন। পরে কয়লার গাড়ীগুলিতে শক্ত একগাছা দড়ি বেঁধে দিয়ে সেই দড়িগাছা রাস্তায় বসান প্রথম ইঞ্জিনটির সহিত সংযুক্ত করে দিলেন। যখন সেই ইঞ্জিনটি টেনে গাড়ীগুলিকে তার কাছে নিয়ে এল তখন তা'হতে দড়িগাছা খুলে নিয়ে তার পরের ইঞ্জিনের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হ'ল। সেই দ্বিতীয়

ইঞ্জিন আবার গাড়ীগুলোকে তার কাছে টেনে নিয়ে এলে আবার সেই দড়িগাছা খুলে তৃতীয় ইঞ্জিনের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হ'ল। এমনি করে তা'রা কয়লাবোঝাই গাড়ীগুলো বাজারে নিয়ে যেতে সক্ষম হ'ল। এরকম ভাবে কয়লা নিয়ে যাওয়ার কথা শুনে বোধ করি তোমরা হাসছ, কিন্তু তখনকার দিনে বেচারীরা আর কি-ই বা করবে? এই ছিল তা'দের মালগাড়ী নিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায়, কারণ তখনও রেলগাড়ীর ইঞ্জিন উদ্ভাবিত হয়নি।

"১৮০২ খৃষ্টাব্দে রিচার্ড ট্র্যাভেথিক (Richard Travathick) নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার প্রথম এক বাষ্পীয় শকট তৈরি করেন।" ট্র্যাভেথিক এক টিনের খনিতে কাজ করতেন। তিনি যে বাষ্পীয় শকটের উদ্ভাবন করলেন তা দেখতে হ'ল একটি চা'রচাকার ডাকগাড়ীর মতন (Stage coach)। এই গাড়ীটির ঠিক পেছন দিককার অক্ষদণ্ডের (axle) সহিত একটি একসিলিণ্ডারের ইঞ্জিনকে বাষ্পকটাহ (Boiler) ও অগ্নিকুণ্ডসহ (Furnace box) সংযুক্ত করে দেওয়া হ'ল। তোমরা সহজেই কল্পনা করতে পার যে, এই প্রথম বাষ্পীয় শকটখানা যা' হ'ল তা' নেহাত আনাড়ীর হাতের কাজের মতন। কিন্তু যখন প্রথম এই জিনিষটা নির্ম্মিত হয় তা' নেহাত কাঁচাধরণের হ'লেও তা'তে চা'রদিকে একটি মহা উত্তেজনার সাড়া পড়ে গেল। রাস্তার উপর দিয়ে যখন এই গাড়ীখানি চলত, তখন ভয়ে ও বিস্ময়ে সকলে এই চলন্ত জিনিষটার প্রতি চেয়ে থাকত। তা'রা এই গাড়ীখানির নাম দিলে "রাক্ষুসে গাড়ী" (Dragon)। যখন রাস্তার উপর দিয়ে ইহা ভীষণ শব্দে ও বেজায় ধোঁয়া উদ্গিরণ করতে করতে চলত, তখন প্রথম প্রথম তা'কে ঠিক একটি দানবের মতনই দেখাত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যিনি প্রথম এই বাষ্পীয় শকটের উদ্ভাবন করলেন তিনি অবিলম্বে

অতি প্রাচীনকালের বাষ্পীয় শকট

ডাক্তার হ্যানিম্যান্
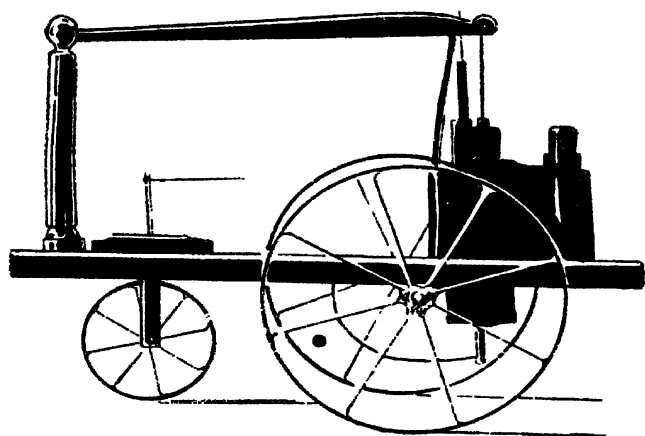
গাড়ীখানিকে জাহাজে ক'রে লণ্ডনে নিয়ে এসে সেখানে প্রদর্শন করলেন। লণ্ডনেও এই নূতন ধরণের যন্ত্রচালিত গাড়ী দেখে সকলেই অবাক্ হয়ে গেল। এই অদ্ভুত রকমের গাড়ী দেখতে চারদিক থেকে অসংখ্য লোকের সমাগম হ'ল।

কিছুদিন পরে রিচার্ড ট্র্যাভেথিককে তাঁর এই কলের গাড়ী চালান বন্ধ করতে হ'ল; কারণ তখনকার দিনে যেরকম বিশ্রী পথঘাট ছিল, তা'তে যন্ত্রচালিত কোন গাড়ী চালান একান্ত অসুবিধাজনক ছিল। সেই উঁচু-নীচু ভাঙ্গা রাস্তার উপর দিয়ে এই গাড়ীচালান সুবিধা হবে না বলে ট্র্যাভেথিক তাঁর এই চেষ্টা হতে বিরত হ'লেন। কলেরগাড়ী চালাবার উপযোগী করে পথঘাট তৈরি করা যেতে পারে এই বুদ্ধি তখন কা'রো মাথায় উদয় হ'ল না।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, যিনি বর্ত্তমানকালের ইঞ্জিনগাড়ীর উদ্ভাবন ক'রে জগতে অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন ক'রে গেছেন, তাঁর নাম জর্জ্জ ষ্টীফেনসন্। রিচার্ড ট্র্যাভেথিক তাঁর বাষ্পীয় শকট তৈরি ক'রে যখন ইংলণ্ডে প্রদর্শন করেন, তখন ষ্টীফেনসন্ নিউক্যাসল্ সহরের নিকট ওয়াইলাম (Wilam) নামক একটি স্থানের একটি কয়লাখনিতে কাজ করতেন। ঠিক এই সময়ে তিনিও একখানি নূতন ধরণের ইঞ্জিনগাড়ী তৈরি করবার জন্য নানারকম পরীক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

জর্জ্জ ষ্টীফেনসন্ ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে রাখালের কাজ করতেন। তিনি তাঁরই এক প্রতিবেশীর গরুগুলো রোজ সকালে মাঠে চরাতে নিয়ে যেতেন ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার তা'দের নিয়ে বাড়ী ফিরে আসতেন। এই ছিল তাঁর সমস্ত দিনের কাজ। তাঁর পিতা নিউক্যাসলের নিকটবর্ত্তী একটি কয়লার খনিতে ষ্টীম ইঞ্জিনের অগ্নিরক্ষকের (Fireman) কাজ করতেন। কয়েক

বৎসর পরে ষ্টীফেনসন্‌ও সেই কয়লার খনিতে প্রথম কয়লাবাছাই কার্য্যে নিযুক্ত হ'লেন। তখন তাঁর কাজ হ'ল কয়লা হতে পাথরের টুকরাগুলি সব বেছে বেছে পৃথক্ করে নেওয়া। তাঁর বয়স যখন ২৪ বৎসর তখন তিনি তাঁর পিতার সহকারীরূপে নিযুক্ত হ'ন। এই সময়ে জর্জ্জ লেখাপড়া মোটেই জানতেন না। কিন্তু জেম্‌স্ ওয়াটের উদ্ভাবিত যন্ত্রকৌশলাদির জ্ঞান লাভ করবার জন্য তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ হওয়াতে তিনি ১৮ বৎসর বয়সে এক নৈশ বিদ্যালয়ে প্রথম ভর্ত্তি হ'ন। সেই নৈশ বিদ্যালয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লেখাপড়ায় তিনি অসাধারণ উন্নতি লাভ করলেন।

তাঁর অপরিসীম উৎসাহ ও অধ্যাবসায়ের ফলে তিনি সেই সামান্য অগ্নিরক্ষকের কার্য্য হ'তে ধীরে ধীরে কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারের পদে উন্নীত হন।

ষ্টীফেনসন্ ইহার পরে টাইন নদীর তীরবর্ত্তী একটি নূতন বাড়ীতে এসে বসবাস করতে লাগলেন। এই জায়গা হ'তেই তখন লণ্ডনে কয়লা প্রেরণ করা হ'ত। কিছুকাল পরে ষ্টীফেনসন্ বিবাহ ক'রে, সেখানে স্থায়িভাবে বসতবাটী স্থাপন করেন। এই সময় ষ্টীফেনসন্ তাঁর গতিশীল ইঞ্জিন তৈরি করবার মতলবটি কি করে কার্য্যে পরিণত করা যায়, সেই চেষ্টায় অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত থাকতেন। তিনি ট্র্যাভেথিকের নির্ম্মিত বাষ্পীয় গাড়ীখানি পূর্ব্বেই দেখেছিলেন। সে গাড়ীখানি হ'তে বহুগুণে উৎকৃষ্টতর একখানি গাড়ী নির্ম্মাণ করবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হ'লেন। এখনকার দিনের ইঞ্জিন সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তকাদি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করে এবং সবরকমের ইঞ্জিনাদি খুব নিপুণতার সহিত পরীক্ষা ক'রে তিনি ইঞ্জিনের সমস্ত দোষগুণ বেশ ভাল করে অধিগত করে নিলেন।

১৮০৪ সালে তিনি কিলিংওয়ার্থে আসেন এবং এইখানে কয়লাখনিতে ব্যবহারের জন্য তারজড়ান নিরাপদ কয়লাখনির লণ্ঠন উদ্ভাবন করেন। ১৮১৩ সালে তিনি গতিশীল ইঞ্জিন উদ্ভাবন করবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা আরম্ভ করলেন। যখন তিনি এইরূপ ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করতে পারবেন বুঝলেন, তখন তিনি কিলিংওয়ার্থ-কয়লাখনির কর্ত্তাদের নিকট তাঁর ইঞ্জিন নির্ম্মাণের প্রস্তাবটি প্রথম উত্থাপন করলেন। খনির মালিকরা তাঁর এই নূতন ইঞ্জিন উদ্ভাবনের কথা শুনে পরম প্রীত হ'লেন ও তাঁকে বল্‌লেন যে এই ইঞ্জিন তৈরি করতে যত টাকার প্রয়োজন হয় তা' তাঁরা দেবেন।

"(ষ্টীফেনসন্ এবার তাঁর নূতন ইঞ্জিন নির্ম্মাণ কার্য্যে একান্তমনে নিবিষ্ট হলেন এবং দশমাসের মধ্যেই তাঁর ইঞ্জিনের কাজ সমাপ্ত করলেন। তার তৈরি প্রথম ইঞ্জিনের নাম দিলেন "মাই লর্ড" (My Lord)। এই "মাই লর্ড" ইঞ্জিন ১৮১৪ সালের ২৫শে জুলাই পরীক্ষিত হয়ে খুব কার্য্যকরী, সুন্দর ও সন্তোষজনক ব'লে বিবেচিত হ'ল। তাঁর এই নূতন ইঞ্জিন খানি ৮৪০ মণ ভারি ৮ খানা ভর্ত্তি মালগাড়ীকে ঘণ্টায় ৪ মাইল বেগে টেনে নিতে সক্ষম হ'ল।)'

এই ইঞ্জিনটি কিছুদিন ব্যবহৃত হ'ল, কিন্তু তখনকার দিনের অন্যসমস্ত ইঞ্জিন হ'তে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হলেও এই ইঞ্জিনেরও দোষ রয়ে গেল অনেক।

এই ইঞ্জিনে কোন স্প্রিং না থাকায় তার হেঁচকাটান ও ঝাঁকুনিতে যে লাইনের উপর দিয়ে তা'কে চালান হ'ত সে লাইনেরও অনিষ্ট হ'ত, আর ইঞ্জিনের পরস্পরসংলগ্ন অংশগুলিও ঢিলে হয়ে গিয়ে শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ত। ইঞ্জিনের এই সমস্ত অসুবিধা লক্ষ্য ক'রে ষ্টীফেনসন্ এবার ইহার চাইতে উৎকৃষ্টতর আর একটি ইঞ্জিন তৈরি করবার জন্য প্রাণপণ

চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর তৈরি প্রথম ইঞ্জিনটির আরও একটি বড় দোষ ছিল এই যে, সে ইঞ্জিন হ'তে যখন বাষ্প বেরিয়ে আসত, তখন এমন একটি বিকট ও বিশ্রী শব্দ হ'ত যে, গরু ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুরা সেই শব্দে ভীত হয়ে চা'রদিকে ছুটে পালাত ও চা'রদিককার লোকজনেরও সেই শব্দে বেজায় বিরক্তি ধরে যেত।

ষ্টীফেনসন্ এবার ভাবলেন যে ব্যবহৃত বাষ্পকে তিনি একটি নলের সাহায্যে যদি ধূমনালীর (chimney) ভিতর নিয়ে আসতে পারেন, তবে নিষ্ক্রমণের পথে সেই বাষ্প ধূমনালীস্থ বায়ুকে সবলে ঠেলে বাইরে নিয়ে আসবে এবং তাতে একটি বায়ুপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়ে কলের আগুনকে আরও সতেজ করে তুলবে। তিনি তাঁর এই নূতন মতলবটি কার্য্যে পরিণত ক'রে দেখলেন যে, এইরূপ নূতন ব্যবস্থার ফলে তাঁর কলের আগুন জ্বলেও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল ও তা'তে বাষ্পের সঞ্চারও হয় অতি শীঘ্র। আর এই উপায়ে তাঁর ইঞ্জিনের বিকট বিশ্রী শব্দটাও দূর হ'ল। তাঁর এই নূতন চেষ্টার সফলতায় তিনি অতিমাত্র পুলকিত হয়ে উঠলেন।

ষ্টীম ইঞ্জিনে এই বাষ্পপ্রবাহের উদ্ভাবনটি গতিশীল বাষ্পীয়যন্ত্রের ইতিহাসের একটি বিশেষ স্মরণীয় বিষয়। তাঁ'র এই আদর্শে বহুবৎসর পর্য্যন্ত সমস্ত রেলওয়ে ইঞ্জিন নির্ম্মিত হয়।

ষ্টীফেনসন্ এই সময়ে "ষ্টক্টন্ এণ্ড ডারলিংটন্" রেলওয়ে কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হ'ন। যখন এই কোম্পানী ঘোড়ার সাহায্যে মালগাড়ী টানাবার বন্দোবস্ত করেন, তখন ষ্টীফেনসন্ কোম্পানীকে বল্লেন যে ঘোড়ার পরিবর্ত্তে তিনি এই মালগাড়ী টানবার জন্য এমন একটি ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করে দিতে পারেন যা' সমস্ত মালগাড়ীকে অতি সহজে ও শীঘ্র টেনে নিয়ে যেতে পারবে। কোম্পানীর কর্ত্তারা তাঁর এই

প্রস্তাব শুনে তাঁকে অবিলম্বে এইরূপ একটি ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করবার জন্য অনুরোধ করলেন। কোম্পানীর কর্ত্তাদের অনুমতি পেয়ে তিনি এবার তাঁর ইঞ্জিন নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করলেন। তিনি তাঁর এই ইঞ্জিনটিকে সব দিক দিয়ে দোষহীন করে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। তিনি তাঁর নূতন উদ্ভাবিত প্রণালীমতে ব্যবহৃত বাষ্পের একটি প্রবাহ ধূমনালীর ভিতর দিয়ে সঞ্চালিত করবার ব্যবস্থা ক'রে তাঁর এই নূতন ইঞ্জিনটিকে সমধিক শক্তিসম্পন্ন করে তুললেন।

তাঁর এই গতিশীল ইঞ্জিন নির্ম্মাণের কার্য্য শেষ করে এবার ষ্টীফেনসন্ রেললাইন ও রেলপথ সংস্কারের দিকে মন দিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই রেলগাড়ী যাতায়াত বিষয়ে রেললাইন ও রেলপথ ইঞ্জিন হ'তে কোন অংশে কম প্রয়োজনীয় নয়। তিনি এই রেলপথের সংস্কারসাধন ক'রে ও রেললাইনগুলিকে একটু পরিবর্ত্তিত ক'রে বসিয়ে দেখলেন যে, এবার তাঁর ইঞ্জিন সেই লাইনের ওপর দিয়ে বেশ দিব্যি সহজ ও সুন্দর গতিতে চলছে। তাঁর ইঞ্জিনের ঝাঁকুনি বন্ধ করবার জন্য এবার তিনি তাঁর ইঞ্জিনটিকে কয়েকটি স্প্রিংএর ওপর বসাবার বন্দোবস্ত করলেন।

এই নূতন ইঞ্জিনটির নাম হ'ল "পাফিং ইঞ্জিন্"। এই ইঞ্জিন্‌টি এমন সুন্দর ও কার্য্যকরী হ'ল যে, ষ্টীফেনসনের বন্ধুরা তাঁকে বিশেষ করে অনুরোধ করলেন যে, সাধারণ রাস্তার উপর দিয়ে চলতে পারে এমন কোন ইঞ্জিন যেন এবার তিনি তৈরি করতে চেষ্টা করেন।

ইহার পরে দেখতে দেখতে অন্য সব কয়লার খনির কর্ত্তারাও রেলপথ তৈরি করতে লাগলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এক রেল-কোম্পানী আটমাইল দীর্ঘ এক রেলপথ তৈরি ক'রে ষ্টীফেন্‌সনের তৈরি ৫ খানি ইঞ্জিন ক্রয় করে নিয়ে তা'র দ্বারা মালগাড়ী চালাতে আরম্ভ ক'রে

দিলেন। ষ্টীফেনের এই ইঞ্জিনগুলি ১৬৮০ মণ ভারি ১৭ খানা বোঝাই মালগাড়ীকে ঘণ্টায় চার মাইল বেগে অনায়াসে টেনে নিতে সক্ষম হ'ল।

যখন "লিভারপুল ও ম্যানচেষ্টার" রেলপথ নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়, তখন সেই রেলওয়েকোম্পানীর কর্ত্তারা এই ঘোষণা ক'রে দেন যে, তাঁদের কোম্পানী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রেলওয়ে ইঞ্জিন যিনি তৈরি করতে পারবেন তাঁকে ৫০০ পাউণ্ড (৭৫০০৲ টাকা) পুরস্কার দেবেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে "রেণহিল" প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে ষ্টীফেনসন্ নির্ম্মিত "দি রকেট্" (The Rocket) ইঞ্জিন প্রথম হয় এবং ষ্টীফেনসন্ এই পুরস্কার লাভ করেন।

এই সব রেলপথ প্রতিষ্ঠা করবার পথেও তখন বিঘ্ন ছিল অনেক। তখন অনেকেই এই ট্রেনচলাচলের বিরোধী হ'য়ে দাঁড়াল। নূতন কোন জিনিষ প্রথম উদ্ভাবিত হ'লে তা'র বিরুদ্ধে অনেককে দাঁড়াতে দেখা যায়। বিলাতের পার্লিমেণ্ট মহাসভার অনেক সদস্যও এই রেলপথের বিরোধী ছিলেন। ষ্টীফেন্সনকে এই রেলগাড়ী-চলাচল নিয়ে অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও গালাগালি সহ্য করতে হয়।

এই রেলপথের বিরুদ্ধে কয়েকটি অদ্ভুত যুক্তির কথা শুনে তোমরা ভাববে যে, তখনকার দিনের লোকেরা কি বোকাই ছিল!

একদিন ষ্টীফেনসন্কে এই রকম একজন আপত্তিকারী বল্লে—"মশায়, আপনার রেলপথ নির্ম্মাণের আমি ভয়ানক বিরোধী। এতে কি লাভ হবে বলুন? অনিষ্ট ছাড়া এতে ইষ্ট হতেই পারে না। মনে করুন যদি আপনার রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৮ কি ৯ মাইল বেগে ছুটতে থাকে আর এমন সময় একটা গরু এসে আপনার ইঞ্জিনের সামনে পড়ে, তবে কি বীভৎস কাণ্ডটা হবে মনে করে দেখুন দেখি।"

ষ্টীফেনসন্ একটু হেসে উত্তর করলেন—"হাঁ, গরুর পক্ষে সেটা খুব বিশ্রী ব্যাপার হবে তাতে সন্দেহ নেই।"
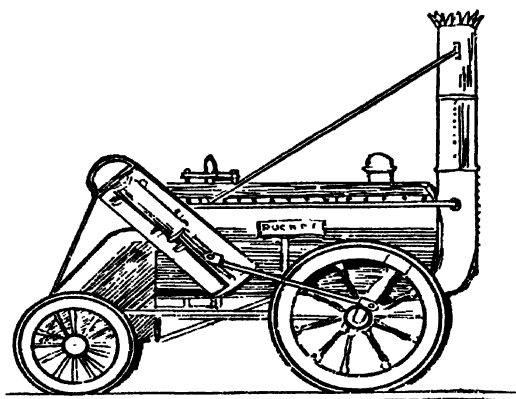
প্রাচীন ষ্টীম ইঞ্জিন ("রকেট্‌")
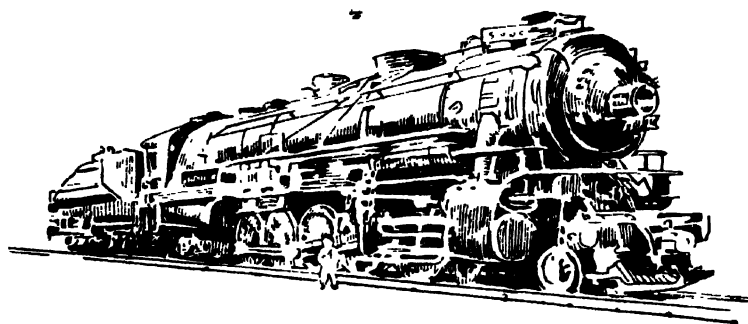
আধুনিক উন্নত প্রণালীর ষ্টীম ইঞ্জিন

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার — ৩৩ পৃঃ

আর একজন ইংলণ্ডের মহাসভার অভিজাতসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ষ্টিফেনসন্‌কে একদিন বল্‌লেন—"আমি আপনার এই রেলপথের বিরোধী। দেখুন আপনার গাড়ী চলবার সময় ইঞ্জিনের বিশ্রী শব্দ চা'রদিককার পাহাড়-পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠবে ও তা' শুনে আমাদের সব শিকার ভয়ে ইতস্ততঃ পালিয়ে যাবে। আমাদের মৃগয়ার আনন্দটুকু আর থাকবে না।"

আর একদিন আর একজন ভদ্রলোক বল্‌লেন—"দেখুন একজন দস্যুর বাড়ীতে গিয়ে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে ভয় পাই না। কিন্তু আপনাদের মতন ইঞ্জিনিয়ারদের দেখলে আমার বেজায় ভয় হয়। কি অনর্থ সৃষ্টিই করতে পারেন আপনারা।"

আর একবার একজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার এবিষয়ে আপত্তি করতে গিয়ে বল্‌লেন—"দেখুন আপনাদের রেলগাড়ীতে ক'রে যখন পর্ব্বতের সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে লোকজন যাওয়া আসা করবে তখন নিশ্চিত এই সমস্ত আরোহীরা নেহাৎ পীড়িত হয়ে পড়বে।" এই রকমের হাস্যকর নানাবিধ আপত্তি নানা লোকে করতে লাগ্‌ল।

এই রকমের বহুবিধ আপত্তি সত্ত্বেও সাধারণের যাতায়াতের জন্য ষ্টিফেন্‌সন্ এক সুদীর্ঘ রেলপথ নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করলেন। যখন নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হ'ল, তখন এই প্রথম সাধারণ রেলপথ খোলা উপলক্ষে একটি বড় রকমের উৎসবের আয়োজন হ'ল। ৩৪ খানি গাড়ী পর পর যোজনা ক'রে তা'তে ইঞ্জিন সংযুক্ত করা হ'ল। ষ্টিফেন্‌সন্ স্বয়ং সেই রেলগাড়ীর ইঞ্জিন চালকের কাজ করলেন। কয়লা ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যাদি এবং ৪৫০ জন আরোহী নিয়ে, সেই উৎসবের দিনে এই সর্ব্বপ্রথম যাত্রীবাহী রেলগাড়ীখানি যাত্রা করল। ট্রেনখানি প্রথম ৯ মাইল একঘণ্টা পাঁচ মিনিটে অতিক্রম করে গেল। পরে

তা' লাইনের শেষ সীমায় এসে যখন পেঁছিল তখন সমস্ত যাত্রী ও সমবেত অসংখ্য জনতার আনন্দধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল। ষ্টিফেন্‌সনের জীবনের স্বপ্ন সফল হল।

ইহার পরে যা'দের টিকিট কেনবার সঙ্গতি ছিল তা'রা প্রায় সকলেই রেলগাড়ীতে যাতায়াত করতে আরম্ভ করল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় উচ্চবংশের ভদ্রলোকেরা রেলগাড়ীতে সাধারণের সঙ্গে যাওয়া-আসা অপমানজনক মনে করলেন! কোথাও যেতে হ'লে তাঁরা তাঁদের জিনিষপত্র ও ভৃত্যদের রেলগাড়ী করে' পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা বাড়ীর ঘোড়ার গাড়ী করে যেতেন। কিন্তু ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রথম এই রেলগাড়ী করে' লণ্ডন হ'তে উইণ্ডসর গমন করেন। যখন স্বয়ং মহারাণী এই রেলগাড়ী করে যেতে কোন অপমান বোধ করলেন না, তখন সমস্ত অভিজাতসম্প্রদায়ের লোকেরা গড্ডলিকা প্রবাহের মতন রেলগাড়ীতে করে' যেতে-আসতে সুরু করলেন। তখন আর তাঁদের আগেকার সেই অপমানজ্ঞান রইল না।

ষ্টিফেন্‌সন্ আরও অনেক বছর এই রেলপথ-নির্ম্মাণ কার্য্যে ও তাঁর ইঞ্জিনের আরও নানাদিক দিয়ে উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত রইলেন। এই সময় তাঁর নিকট নানাদেশের লোক এই রেলপথ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে তাঁর মতামত গ্রহণ করতে আস্‌তে লাগল। তাঁর খ্যাতি দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হয়ে পড়ল।

ষ্টিফেন্‌সনের শেষ জীবনে তিনি অনেক কয়লাখনির মালিক হয়ে খুব সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেন। ১৮৭৭ সালে তিনি বিলাতে ইঞ্জিনিয়ারদের সভার সভাপতি পদে বৃত হ'ন। তাঁর উদ্ভাবিত ইঞ্জিনগাড়ী তাঁকে জগতে চিরদিন অমর করে' রাখবে।

মোটরগাড়ীর কথা

হেঁটে চলার ওপর মানুষ কোন কালে সন্তুষ্ট ছিল না। তাই বহুকাল পূর্ব্ব হ'তে মানুষ চেষ্টা করে আস্‌ছিল এমন কোন উপায় উদ্ভাবনা করা যেতে পারে কিনা যাতে তার পক্ষে আরামে ও শীঘ্রগতিতে যাতায়াত করা সম্ভবপর হয়। পূর্ব্বকালে যখন মানুষকে হেঁটে চলাফেরা করতে হ'ত তখন তার শারীরিক কষ্ট হত খুবই। তা' ছাড়া তার পক্ষে ক্ষিপ্রগতিতে যাতায়াত করা তখন এক রকম অসম্ভব ছিল। শীঘ্র তাকে কোথায় যেতে আসতে হলে অবশ্য তাকে দৌড়ে যেতে আস্‌তে হ'ত। আর দৌড়ে চলাটা কি রকম কষ্টসাধ্য তা তোমাদের বলা নিষ্প্রয়োজন। আরামে যাতায়াত করবার উপায় সহজে ও শীঘ্র বেরোল। মানুষ গাধার পিঠেও গরুর গাড়ী প্রভৃতি করে আরামে চলাফেরা করতে লাগল। এতে হেঁটে চলার কষ্ট দূর হ'ল তা ঠিক, কিন্তু শীঘ্র যাতায়াত করার কোনও সুবিধা হয়ে উঠল না। যখন মানুষ তারপরে ঘোড়ায় চড়তে শিখল ও ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহার করতে আরম্ভ করল তখন তার পক্ষে আরামে ও শীঘ্রগতিতে যাতায়াত করা বেশ সহজ হয়ে উঠল। এই ঘোড়ার গাড়ীতে যাতায়াত করার ব্যবস্থাটা বহুকাল থেকে আছে। কিন্তু এতেও মানুষের তৃপ্তি হল না। সে চেষ্টা করতে লাগল আরও বেশি আরামে ও শীঘ্র যাতায়াত করা যায় এমন কোন উপায় বের করার জন্য। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সে এই বিষয়ে আর বেশি কিছু করতে পারল না। তাকে গাড়ী ঘোড়া নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল।

সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার আইজাক্ নিউটন প্রথম চেষ্টা করেন ষ্টীম-চালিত কলের একটী গাড়ী তৈরি করতে। তিনি কলের যে গাড়ীটি তৈরি করলেন তা হ'ল অনেকটা একটি খেলনার মত। তাঁর সেই গাড়ী দেখে অনেকে খুবই আমোদলাভ করল তা ঠিক, কিন্তু কোন কাজে লাগাবার মত তার কোন উন্নতি আর হ'ল না।

এ বিষয়ে মানুষের চেষ্টায় বিরাম কিন্তু হ'ল না। নানা বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারের বিরামহীন বহুবর্ষব্যাপী চেষ্টার ফলে মানুষের স্বপ্ন বহুদিন পরে বাস্তবে পরিণত হল এই মটরগাড়ীরূপে।

জার্ম্মানী ও ফ্রান্সেই প্রথম পেট্রোল-চালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ করবার চেষ্টা করা হয়। সেখানে যে সব মোটরগাড়ী প্রথম নির্ম্মিত হয় তা নেহাৎ আনাড়ীর হাতের কাজের মত হলেও, আমাদের একথা মনে রাখা উচিৎ যে সে সব গাড়ীরই নানা দিক দিয়ে উন্নতি সাধন করবার অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে বর্ত্তমানের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও আরামজনক মোটরগাড়ীর উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্ভব হয়ে উঠেছে। এই পেট্রোল-চালিত মোটর গাড়ীর পূর্ব্বে যে সব কলের গাড়ী তৈরি হয়েছিল তা' ষ্টীমের সাহায্যেই চালান হ'ত ও তা' সবই একান্ত ভারি ও দেখতে বড়ই কদাকার ছিল।

ইংলণ্ড মোটরগাড়ী সম্বন্ধে প্রথমে বড়ই পশ্চাৎপদ ছিল। কলের গাড়ীর প্রতি সে দেশের লোকের ব্যবহারের কথা শুনলে তোমাদের হাসি পাবে। ইংলণ্ডের লোকেরা কলের গাড়ী দেখলেই ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ত। এই সব কলের গাড়ী দেখে সেখানকার লোক যেমন ভীত হ'ত তেমন বিরক্তও হয়ে উঠ্‌ত খুবই। ইংলণ্ডের সরকার বাহাদুর এই যন্ত্রচালিত গাড়ী চলাচল নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য প্রথমে একটি আইন করেন। এই আইনের দ্বারা এসব গাড়ী ঘণ্টায় ৪ মাইলের

বেশি বেগে যেন চালাতে না পারে তার ব্যবস্থা করেন, এবং তা চলবার সময় একজন লোক যেন প্রত্যেক গাড়ীর আগে আগে লাল নিশান হাতে নিয়ে ছুটতে থাকে এইরূপ এক অদ্ভুত বিধিরও প্রবর্ত্তন করেন। এমন আইন আর কোন দেশে কখনো প্রচলিত হয়নি। আর এইরূপ আইনের ফলে সেই সময় ইংলণ্ডে যন্ত্রচালিত গাড়ীর বিশেষ কোন উন্নতি হওয়াও অসম্ভব হয়ে উঠে। সৌভাগ্যের বিষয় এই অদ্ভুত আইন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে রদ করে দেওয়া হয়।

যখন এই মোটরগাড়ীর প্রথম উদ্ভাবন হ'ল তখন তার উদ্ভাবন কর্ত্তারা ছাড়া প্রায় সকলেই সেগুলোকে এক রকম ভয়াবহ খেলনার সামিল বলে মনে করল। এই ছোট ছোট যন্ত্রচালিত গাড়ীগুলি যে এখনকার দিনের এমন মনোহর ও আরামজনক মোটরগাড়ীতে পরিণত হ'য়ে উঠত পারবে তা' তাদের স্বপ্নাতীত ছিল।

প্রথম যে মোটরগাড়ীগুলো নির্ম্মিত হয় তা'তে কোনটায় বা দুজন কোনটায় বা একজন, আবার কোনটায় বা তিনজন লোক বস্‌তে পারত কিন্তু তা' দেখতে বড়ই কদাকার ও কুশ্রী ছিল ও তা' চলবার সময় একটা বিশ্রী রকমের আওয়াজ দিত। ১২৮৮ সালে কার্ল বেন্‌জ (Carl Benz) নামক একজন জার্ম্মান পেট্রোল-চালিত তিন চাকার একখানি মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ করেন। এই গাড়ীখানি দেখ্‌তে মন্দ হ'ল না আর তা' চলবার সময় কোনরূপ বিশ্রী শব্দ ও হল না। এই সময় ডেমলার (Damler) নামে আর একজন জার্ম্মান বেনজের গাড়ী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্টতর একখানি মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ করতে সমর্থ হলেন। এই ডেমলারের নাম এখনো কোন কোন মোটর গাড়ীর মাথায় লেখা আছে দেখ্‌তে পাবে। এই দুজন জার্ম্মানের চেষ্টায় পেট্রোল-চালিত গাড়ী উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হতে সমর্থ হল।

আগেকার দিনে জার্ম্মান মোটরগাড়ীগুলি খুব নিম্ন শক্তির ছিল ও তার গতিবেগ ছিল মাত্র ঘণ্টায় আট মাইল কি বড় জোর দশ মাইল।

মোটর গাড়ীর এই সব নানারকমের পরিবর্ত্তন ফ্রান্সে খুবই আগ্রহের সহিত গৃহীত হল। বেনজের নূতন ইঞ্জিন উদ্ভাবিত হবার ছয় বছর পরে দুজন ফরাসী আলবের দঁ দিয়োঁ (Abert de Deon) এবং শার্ল বুতোঁ (charles Boulton) সেই বেনজ ইঞ্জিনের আদর্শে একখানি মোটর সাইকেল নির্ম্মাণ করেন। পানার (Panhard) নামে আর একজন ফরাসী এই আদর্শে ফ্রান্সে মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ করবার জন্য যত্নপর হ'লেন। এই পানার মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ শিল্পের একজন অগ্রদূত বলে সুপ্রসিদ্ধ। "পানার" মোটরগাড়ী এখনও পথে ঘাটে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

মোটর গাড়ী সম্বন্ধে ফ্রান্সের সংবাদপত্র সমূহ এখন হ'তে বেশ আগ্রাহান্বিত হয়ে উঠ্‌ল। লপ্‌টিজর্ণাল্‌ নামে একখানি সংবাদপত্র ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে একটি মোটরগাড়ী প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করেন। এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হল পারি (Paris) হ'তে রুয়াঁ (Rouen) পর্য্যন্ত। এই প্রতিযোগিতায় দ দিয়োঁ নির্ম্মিত একখানা মোটর গাড়ী প্রথম হয়। এই গাড়ী ঘণ্টায় ১২ মাইল বেগে চল্‌তে সমর্থ হয়েছিল। এখনকার দিনে মোটরগাড়ী ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগেও ছুট্‌তে পারে, কিন্তু তখনকারদিনে ঘণ্টায় মাত্র ১২ মাইল বেগে গিয়েও প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করা সম্ভব ছিল। মোটরের গতিবেগ এখন কি রকম বেড়ে গেছে বুঝতে পার। ১৯০২ সালে পারি হতে বার্লিন পর্য্যন্ত আন্তর্জাতিক মোটর প্রতিযোগিতায় ৫০ অশ্বশক্তির একখানি ন্যাপিয়ার মোটরগাড়ীর সাহায্যে এস্‌, এফ, এজ্‌ নামে একজন ইংরাজ প্রতিদ্বন্দ্বী গর্ডন বেনেট কাপ লাভ করেন।

মোটরগাড়ীর একটি খুব অত্যাবশ্যকীয় উন্নতি সাধিত হয় যখন মোটরের চাকাতে রবার টায়্‌র বসাবার প্রচলন হল। এই মোটর টায়্‌রগুলি প্রথম প্রথম নিরেট রবার দিয়ে তৈরি হ'ত। এখনও এ রকম নিরেট "রবার টায়্‌র" মোটরলরি এবং অন্যান্য খুব ভারি গাড়ীতে ব্যবহৃত হয়। পরে বায়ুপূর্ণ রবার টায়্‌র উদ্ভাবিত হয়ে মোটরে যাতায়াত করা শতগুনে সহজ ও আরামজনক হ'য়ে উঠ্‌ল। মোটরগাড়ী যাতে স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে যাতায়াত করতে পারে এজন্য এখনকার দিনে পথঘাটেরও যথাসাধ্য উন্নতি সাধন করা হয়েছে।

মোটরগাড়ী চলবার সময় ইঞ্জিনের যে সব অংশ অতিমাত্র উত্তপ্ত হ'য়ে উঠে সে সব অংশকে সুন্দর ভাবে তৈলাক্ত করে ঠাণ্ডা করে রাখবার একটি সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করে নিতে হ'ল এই ইঞ্জিনের মধ্যেই। এইরূপ চলমান ইঞ্জিনের অংশগুলি অবিরত তৈলাক্ত করে না রাখতে পারলে উচ্চশক্তির মোটর ইঞ্জিন চালান অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, কারণ এরকম ইঞ্জিনগুলো চলবার সময় এমন আগুনের মত গরম হয়ে উঠে যে তাকে কোন উপায়ে ঠাণ্ডা করে না রাখলে ইঞ্জিনের ভিতরকার সিলিণ্ডার প্রভৃতি ফেটে যেতে পারে, এবং ইঞ্জিনে আগুন লেগে, তা' বিনষ্ট হয়ে যাবার বেজায় আশঙ্কা থাকে। ইঞ্জিনের অংশগুলি তৈলাক্ত করে রাখবার উপায় উদ্ভাবিত হওয়াতে এখন অতিমাত্র শক্তিমান ইঞ্জিনের সাহায্যেও মোটরগাড়ী চালান সহজসাধ্য হ'য়ে উঠেছে।

আগেকার দিনে মোটরগাড়ীতে ইঞ্জিন হতে গাড়ীর পশ্চাতের দুটি চাকাতে শক্তি সঞ্চালিত করবার জন্য এক রকম শক্ত শিকলের ব্যবহার হত। কিন্তু এখনকার দিনে এই শিকলের পরিবর্ত্তে একটি পরিচালক লৌহদণ্ড ব্যবহৃত হয়। এই লৌহদণ্ডটি ইঞ্জিনের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে

পিছনের চক্রদ্বয়ের অক্ষদণ্ডের (Axle) মধ্যবর্ত্তী আর একটি দন্তযুক্ত চক্রের সহিত খুব নিপুণভাবে সংলগ্ন থাকে। পিছনকার এই অক্ষদণ্ডের মধ্যস্থিত দন্তযুক্ত পরস্পর সংযুক্ত চক্রসমূহের সাহায্যে মোটরের ইঞ্জিন, গাড়ীকে ঘোরাবার ফেরাবার সময় পশ্চাতের চাকা দুটির ওপরে পরিমাণমত শক্তি প্রয়োগ করতে পারে।

অসংলগ্ন চক্রবেড় (Detachable Rims) উদ্ভাবিত হওয়ার পর হতে পথিমধ্যে টায়্‌র মেরামতের সমস্ত অসুবিধা ও কষ্ট দূরীভূত হল। ইহার পরে মোটর টায়্‌রের আরও বিস্তর উন্নতি সাধিত হয়েছে। "নন্‌ স্কিড" টায়্‌র প্রচলিত হওয়ার পরে কর্দ্দমাক্ত জায়গার উপর দিয়ে গাড়ী চলবার সময় পিছ্‌লে যাওয়ার আর কোন ভয় রইল না। ইংলণ্ডে তৈরি ল্যান্‌চেষ্টার (Lanchester) নামক একখানি মোটর গাড়ীতে প্রথম চৌম্বক-প্রজ্জ্বলনের (Magneto ignition) প্রবর্ত্তন করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে একটি মাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গই ইঞ্জিনটিকে চালিয়ে দিতে সমর্থ হল, এবং গাড়ী "ষ্টার্ট" করা বাষ্পসঞ্চার নিরপেক্ষ হয়ে উঠ্‌ল।

এখনকার দিনে বানিজ্যদ্রব্যাদি পল্লীগ্রামের অনেক জায়গায় এই মোটরগাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়া সহজ হয়ে উঠেছে। যেসব জায়গায় পূর্ব্বে বসবাস করা বড়ই অসুবিধাজনক ছিল সেই সব জায়গায় বসবাস করা, এখন মোটরগাড়ী ও মোটরলরি প্রভৃতির চলাচল হওয়াতে, খুব সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে। যে সমস্ত জায়গার নিকট দিয়ে ট্রেন চলাচল করেনা, সে সব জায়গায় এখন মোটরগাড়ী ও মোটর লরির সাহায্যে নানা রকম খাদ্যদ্রব্যের ও নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ করা একান্ত সহজ হয়ে উঠেছে।

এখনকার দিনে ইউরোপের অনেক রেলকোম্পানি মোটর লরির

সাহায্যে যে সব জায়গার নিকট দিয়ে ট্রেন চলে না, সে সব জায়গার খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিষ পত্রাদি পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছে। ইহার ফলে যে সব জায়গা পূর্ব্বে জনহীন ও ম্রিয়মাণ অবস্থায় পড়ে ছিল তা এখন জনাকীর্ণ ও সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

মোটরগাড়ী ও মোটরলরি চলাচলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখন অনেক সহরবাসী সমৃদ্ধ লোকও সহরের দূরবর্ত্তী নিরালা, নির্জ্জন ও শান্তিময় জায়গায় গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করেছেন। শান্তির সময় মোটরগাড়ী ও মোটরলরি প্রভৃতি যেমন একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে, যুদ্ধের সময়ও তা যুদ্ধসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের জন্য একান্ত অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত যুদ্ধের সময় এই মোটরগাড়ী ও লরির সহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট সৈন্যদলকে প্রয়োজনমত একস্থান হতে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া ও রসদ প্রভৃতি চারদিকে সহজে ও ক্ষিপ্রতার সহিত সরবরাহ করা খুবই সুহজসাধ্য হয়ে উঠেছিল। এসব কাজ এত সহজে ও এমন ক্ষিপ্রতার সহিত সাধিত হতে পারে তা পূর্ব্বে কেউ কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

১৯১৪ সালে যখন জার্ম্মানী পারি সহর আক্রমণ করে, তখন ফরাসীরা প্রায় ৬০ হাজার সৈন্যকে এক রাত্রেই মোটর যোগে ৪০ মাইল দূর হতে নিয়ে এসে জার্ম্মান সেনাব্যূহকে এমন অতর্কিত ভাবে ও দুর্দ্ধর্ষ তেজের সহিত আক্রমণ করে যে জার্ম্মানদের বাধ্য হয়ে পশ্চাদপদ হতে হয় এবং পারি সহরও রক্ষা পায়।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় এক রকম "মোটর ট্যাঙ্ক" ব্যবহৃত হয়। এই ট্যাঙ্ক গুলো অনেক সময় এমন বিষমবেগে শত্রুব্যূহের মধ্যে এসে পড়ত যে তাতে শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়ে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হত।

কি শান্তির সময় কি যুদ্ধ বিগ্রহের সময় মোটরগাড়ী এখানকার দিনে মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে।

বহু অর্থশালী লোকের বড় বড় কারখানা হতে প্রতিদিন হাজার হাজার মোটরগাড়ী প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠেছে বলে আজ তার দামও দিন দিন এমন কমে আসছে। এই গাড়ীর ব্যবহার যেরূপ দিন দিন বেড়ে চলেছে তাতে অন্য কোন রকম যান বাহনের আর বেশি দিন প্রচলন থাকবে বলে মনে হয় না।

বহু লোকের নিরলস চেষ্টার ফলে আজ মোটরগাড়ীর এমন অপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে ও তা' জগতে একটি নবযুগ আবাহন করে আনতে সমর্থ হয়েছে।

ষ্টীম ইঞ্জিনের কথা

একটি পাত্র করে জল নিয়ে তা কিছুক্ষণ আগুনের ওপর রাখলে দেখা যায় যে সে জলটা গরম হয়ে ধীরে ধীরে ফুটতে আরম্ভ করে। তোমরা দেখতে পাও যে জলটা যখন বেশ ফুটতে থাকে তখন তা' হতে শাদা ধোঁয়ার মতন একটি জিনিষ বেরিয়ে আসে। এই জিনিষটি দেখতে ধোঁয়ার মত হলেও, ইহা ধোঁয়া নয়। ইহা হচ্ছে ঘনীভূত জলীয় বাষ্প বা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা। বাষ্প জিনিষটি চোখে দেখা যায় না। পাত্রের জলটা প্রথম বাষ্পাকারে রূপান্তরিত হ'য়ে বেরিয়ে আসবার পথে বাইরের ঠাণ্ডায় দ্রবীভূত হয়ে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণায় পরিণত হয়ে শাদা ধোঁয়ার আকার গ্রহণ করে। এই শাদা ধোঁয়ার ওপর যদি একখানি ঠাণ্ডা রেকাবি ধরা যায় তবে দেখবে সেই রেকাবির গা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে ভরে গেছে। কারণ শীতল রেকাবির স্পর্শে সেই অতি সূক্ষ্ম জলকণা গুলো তাদের উত্তাপ হারিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে পরিণত হয়ে পড়ে। এখন বুঝতে পারছ যে জল খুব গরম করলে তা' বাষ্পাকারে পরিণত হয়ে যায়, আবার সেই বাষ্পকে ঠাণ্ডা করলে তা' জলে রূপান্তরিত হয়ে উঠে। জলপাত্রটি যদি অনেকক্ষণ আগুনের ওপর রেখে দাও তবে দেখবে সমস্ত জলটাই বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। পাত্রে আর এক ফোঁটা জলও থাকবে না।

জল যখন এইরূপ উত্তাপের সাহায্যে বাষ্পাকারে পরিণত হয়ে উঠে তখন তার প্রকৃতি ও একেবারে বদলে যায়। তখন তার অণুগুলির যোগাকর্ষণশক্তি আর থাকে না। তার অনুগুলি পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন

হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে যেতে চায়। এইরূপ জলীয় বাষ্পের একটি ভয়ানক শক্তি আছে। সেই শক্তিটি বাষ্পের চারদিকে ছড়িয়ে যাবার, ছুটে যাবার ব্যগ্রতা হতে জন্মে। এই বাষ্পকে যদি কোন একটি পাত্রে বন্ধ করে রাখতে যাও তা' উহা সেই বদ্ধ জায়গা হ'তে বেরিয়ে এসে অসীম আকাশে ছুটে যাবার জন্য বেজায় জোর জবরদস্তি করতে থাকবে। তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ যে যখন কোন কেটলিতে জল ফোটান হয় তখন তার ভিতরকার জলীয় বাষ্প ঢাক্‌নি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে। বাষ্পের জোরে ঢাকনিখানা ওঠানামা করতে থাকে। যদি কোনপাত্রে এইভাবে ক্রমাগত বাষ্প সঞ্চিত করতে থাক, আর সেই পাত্র হ'তে বাষ্প বেরিয়ে যাবার কোন পথই না রাখ, তবে সেই রুদ্ধ সঞ্চিত বাষ্প এমন এক ভয়ানক শক্তি লাভ করবে, যে সেই শক্তিতে খুব কঠিন ধাতু নির্ম্মিত পাত্র হলেও তা' ফেটে চূর্ণিত হয়ে যাবে।

এই যে বাষ্পের ভীষণ আসুরিক শক্তি এই শক্তিকে মানুষ নিজের নানারকম কাজে লাগাবার জন্য যে যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছে তারই নাম হল ষ্টীম ইঞ্জিন। এই ষ্টীম ইঞ্জিনের সাহায্যে এখন বড় বড় কলকারখানা, ষ্টীমার, রেলগাড়ি প্রভৃতি সবই চলছে।

বহুকাল পূর্ব্বে যখন কোন রকমের কল কারখানা ছিল না বল্লেই হয়, তখন ইউরোপের লোকদের কয়লাখনি হ'তে কয়লা বের করে নিতে অত্যন্ত কষ্ট করতে হত। প্রথম প্রথম তারা ছোট ছোট কয়লাখনির উপরিভাগ হতে কেটে কয়লা বের করত। কিন্তু পরে যখন তাদের বড় বড় গভীর খনির নীচ হতে কয়লা কেটে ওপরে তুলতে হল তখন তাদের বড়ই অসুবিধা হতে লাগল। পুরুষ ও মেয়েদের, ঝুড়িতে করে অতটা নীচ হতে কয়লা ওপরে বয়ে নিয়ে আসতে কি পরিমাণ কষ্ট হত তা সহজেই অনুমান করা যায়। এরকম

করে কয়লা তুলে আনতে খরচও পড়ত বেশি আর সময়েরও অপব্যয় হত ঢের। "উইণ্ডলাস" (windlass) নামক এক রকম যন্ত্রে কয়লা পুরে, ঘোড়া দিয়ে টেনে অনেক সময় গভীর খনি হতে কয়লা বের করে নিয়ে আসা হত।

এইরূপ গভীর খনি হতে খুব সহজে ও অল্পব্যয়ে কয়লা তোলা যেতে পারে এমন একটি যন্ত্রের অভাব তখনকার দিনে সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করে। কোন জিনিষের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করলে সেই অভাব দূরীকরণের জন্য সকলেরই খুব চেষ্টা হয়। আর সমগ্র ইউরোপে হলও ঠিক তাই। সকলেই ভাবতে লাগল কি উপায়ে এমন কোন যন্ত্র উদ্ভাবন করা যায় যাতে সহজে গভীর খনি হতে কয়লা তোলা যেতে পারে।

প্যাপিন্ (Papin) নামে একজন ফরাসী প্রথম একটি খুব সাধারণ রকমের ষ্টীম ইঞ্জিন তৈরি করেন। কিন্তু এই ষ্টীম ইঞ্জিনে কোন কাজই তেমন সুন্দর ভাবে নির্ব্বাহ হল না। প্যাপিন প্রথমে একটা লোহার সিলিণ্ডার বা চোঙ্গা নির্ম্মাণ করলেন এবং তার সঙ্গে ঠিক মিল করে একটি পিষ্টন (piston) তৈরি করলেন। পরে সেই লোহার সিলিণ্ডারটিতে কিছু জল পূরে নিয়ে, তা' আগুনের উপর বসিয়ে দিয়ে পিষ্টনটিকে সিলিণ্ডারের ওপর ঠিক ভাবে লাগিয়ে দিলেন। যখন জল বেশ ফুট্‌তে লাগল তখন সিলিণ্ডারের ভিতরও বাষ্প সঞ্চিত হতে লাগল। আর এই সিলিণ্ডারের ভিতরকার অবরুদ্ধ বাষ্পের শক্তিতে পিষ্টনটি অচিরে ওপরদিকে উঠে গেল। পিষ্টনটি ওপরে উঠামাত্রই সিলিণ্ডারের নীচ হতে আগুন সরিয়ে নেওয়া হল। ধীরে ধীরে সিলিণ্ডারটি যখন আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল তখন তার ভিতরকার বাষ্পও ঠাণ্ডায় ধীরে ধীরে জমে গেল, এবং পিষ্টনটিও বায়ুর চাপে নীচে নেমে এল। এই

ভাবে এই ইঞ্জিনের পিষ্টনটি এক একবার উঠ্‌তে নামতে অনেক সময়ের দরকার হত। প্যাপিনের এই ইঞ্জিনটি নেহাৎ কাঁচা ধরণের হলেও আমাদের এই কথা মনে রাখা উচিত যে এই রকমের ইঞ্জিনের সাহায্যেই সর্ব্বপ্রথম বাষ্পকে মানুষের কাজে লাগান হয়।

ইহার পরে তোমাস্ নিউকোমেন (Thomas Newcomen) নামক একজন কর্ম্মকার প্যাপিনের তৈরি ষ্টীম ইঞ্জিনের কোন কোন দিকে পরিবর্ত্তন সাধন করে' ও দু'একটি নূতন অংশ তা'তে সংযোজিত করে দিয়ে সেই ষ্টীম ইঞ্জিন হতে আরও সুন্দর ও উৎকৃষ্টতর এক ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করে তুললেন। 'নিউকোমেন' যে ইঞ্জিনটি তৈরি করলেন তা'তে পিষ্টনের এক এক ঘায়ে প্রায় ৪০ মন জল ৫০ গজ উচেচ তুলতে পারা গেল ও মিনিটে একটি পিষ্টন বারোবার উঠানামা করতে পারল। তাঁর এই ইঞ্জিনের দ্বারা খনি হতে জল তুলে ফেলে দেওয়ার কাজ খুব ভালই চলল এবং কয়লাও ইহার দ্বারা সহজে ওপরে তোলা গেল।

প্রথম প্রথম 'নিউকোমেন' সিলিণ্ডারের বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে জলে পরিণত করতে গিয়ে বাহির থেকে সিলিণ্ডারের গায়ে জল ছিটিয়ে তা' ঠাণ্ডা করতেন। একদিন নিউকোমেনের ইঞ্জিনটি কাজ করছিল এমন সময় তিনি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখ্‌লেন তাঁর ইঞ্জিনটি খুব দ্রুত কাজ করছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে সিলিণ্ডারটি ক্ষয়ে যাওয়াতে তার গায়ে একটি ক্ষুদ্র ফুটো হয়ে গেছে, ও সিলিণ্ডারের ভিতর বায়ু প্রবেশের পথ বন্ধ করতে গিয়ে তিনি পিষ্টনের উপরিভাগে যে জল দিয়ে রেখেছিলেন, সেই জল ঐ ছোট ফুটোটি অবলম্বন করে সিলিণ্ডারের ভিতরে প্রবেশ করে তা'র ভিতরকার বাষ্পকে অতিশীঘ্র ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে বলেই ইঞ্জিনের কাজটিও খুব দ্রুত চলছে।

তিনি এই ঘটনাটি লক্ষ্য করবার পরে আর একটি নূতন ধরণের ইঞ্জিন নির্ম্মাণ কার্য্যে হাত দিলেন এবং অতি শীঘ্রই তা' নির্ম্মাণ করে তুললেন।

তাঁর এই নূতন ইঞ্জিনে তিনি এমন একটি কৌশল করলেন যাতে একটি ক্ষুদ্র জলধারা এসে সিলিণ্ডারের ভিতরকার বাষ্পকে শীতল করে দিতে পারে। এইরূপ নূতন ব্যবস্থার ফলে সময়ও বেঁচে গেল ঢের ও ইঞ্জিনটিও কাজ করতে লাগ্‌ল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্টতররূপে।

নিউকোমেনের এই নূতন ইঞ্জিন উদ্ভাবিত হওয়ার পর হতে কয়লা-খনির কাজের অনেক সুবিধা হয়ে গেল। খনির কাজ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সহজে সম্পন্ন হতে লাগ্‌ল। কিন্তু এত সুবিধা সত্ত্বেও এই ইঞ্জিনের একটি মস্ত বড় দোষ ছিল। এই ইঞ্জিনটি চালাতে গিয়ে এত কয়লা খরচ হত যে তাতে খনি হতে কয়লা তুলতে বিস্তর খরচ পড়ত। এরকমের বড় ধরণের একটি কল চালাতে অনেক কয়লার প্রয়োজন হত।

এই সময়ে ষ্টীম ইঞ্জিনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘট্‌ল। এই আকস্মিক ঘটনায় ষ্টীম ইঞ্জিনের ইতিহাসে এক যুগান্তরের সূচনা হল। ১৭৫৪ সালে নিউকোমেনের তৈরি একটি ইঞ্জিনের মেরামত প্রয়োজন হওয়াতে তা' ইতিহাস বিখ্যাত জেমস্ ওয়াটের (James Wat) নিকট প্রেরিত হয়। এই ইঞ্জিনটি ভাল রকম করে পরীক্ষা করে দেখে ওয়াট্ ষ্টীম ইঞ্জিন সম্বন্ধে এমন একটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করলেন যার ফলে বর্ত্তমানের ষ্টীম ইঞ্জিনের মত সুন্দর ষ্টীম ইঞ্জিন তাঁর পক্ষে নির্ম্মাণ করে তোলা সম্ভবপর হল।

জেমস ওয়াট্ ১৭৩৬ সালের ১৯এ জানুয়ারী স্কট লণ্ডের গ্রিনক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে ওয়াট খুব হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু তার সভাবটি ছিল খুবই শান্ত।

তিনি বসে বসে ছবি আঁকতে খুব ভালবাসতেন। লেখাপড়ার দিকে তাঁর মোটেই মন ছিল না।

জেমস ওয়াট্ সম্বন্ধে একটি এই রকমের গল্প প্রচলিত আছে যে একদিন তিনি একটি কেট্‌লি জলপূর্ণ করে তা' উনানের উপর তুলে দিয়ে তার কাছে বস্‌লেন। কিছুক্ষণ পরে সে কেট্‌লি হতে যখন বাষ্প নির্গত হতে আরম্ভ হল তখন তিনি একাগ্র চিত্তে তা লক্ষ্য করতে লাগলেন। তিনি কেট্‌লির ঢাক্‌নিটি এক একবার তুলে নিয়ে তা' আবার লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। আর কেট্‌লি হতে যখন বাষ্প বেরচ্ছিল সেই বাষ্পের উপর এক একবার একটি ঠাণ্ডা পেয়ালা ধরে সেই পেয়ালার গায়ে যে জলবিন্দুর সঞ্চার হচ্ছিল তা খুব মনোযোগের সহিত দেখ্‌ছিলেন। প্রায় একঘণ্টা কাল তিনি এইভাবে কাটালেন তাঁর কোন অভিভাবিকা তাঁকে বসে বসে এই কাণ্ড করতে দেখে খুব তিরস্কার করলেন। তিনি বল্‌লেন "দেখ ওয়াট্ তোমার মত অলস ছেলে আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। এই এক ঘণ্টা ধরে তুমি কেবল ঐকাজই করছ। একটুখানি পড়াশুনা করবার নাম নেই। ছি! ছি! লজ্জা করে না এমন ভাবে সময় নষ্ট করতে?" ওয়াট্ কিন্তু তাঁর নিজের চিন্তায় বিভোর। তাঁর কানে সেই তীব্র তিরস্কার পৌঁছলনা। তিনি একাগ্র মনে দেখ্‌ছিলেন সেই বাষ্পের বিচিত্র খেলা। এই সামান্য ব্যাপার হতে ওয়াট্ যে অমূল্য শিক্ষাটি লাভ করেছিলেন তা' কোন লেখা বই কিম্বা কোন স্কুল কলেজ হতে লাভ করা অসম্ভব ছিল।

এই সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের ফল স্বরূপ তিনি যে অমূল্য জ্ঞান সম্পদ লাভ করলেন, তা' তাঁর জীবনকে এক অপরূপ সার্থকতায় মণ্ডিত করে দিল। তাঁর অতুল ও অমূল্য উদ্ভাবনের জন্য সমস্ত জগৎ আজ পরম শ্রদ্ধার সহিত তাঁর কাছে মাথা নীচু করছে।

ওয়াটের বয়স যখন মাত্র ১৯ বৎসর তখন তিনি যন্ত্র নির্ম্মাণ কার্য্য শিক্ষা করবার জন্য লণ্ডনে যান। তিনি এক বৎসরকাল মাত্র জন্ মর্গান নামক যন্ত্রশিল্পীর নিকট শিক্ষানবিশের কাজ করেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে তাঁকে বাধ্য হয়ে একবৎসর পরে দেশে ফিরে আস্‌তে হয়। পরে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্ল্যাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যন্ত্রনির্ম্মাতার কাজে নিযুক্ত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রনির্ম্মাণ বিভাগে প্রবেশ করবার কিছুকাল পরে জেমস ওয়াটের নিকট একদিন নিউকোমেনের একখানি ইঞ্জিন মেরামতের জন্য নীত হল। ওয়াট্ খুব সাবধানতার সহিত সেই ইঞ্জিনখানির প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা করে দেখ্‌লেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে এই ইঞ্জিনের ভিতর যে শীতল জলধারাটি বাষ্পকে জলে পরিণত করবার জন্য প্রবেশ করে উহা সিলিণ্ডারের প্রয়োজনীয় উত্তাপটি বহু পরিমাণে নষ্ট করে দেয়। ইঞ্জিনের উত্তাপ এই ভাবে কমে গেলে ইঞ্জিনের শক্তিরও তাতে ঢের হ্রাস হয়। এই ভাবে ইঞ্জিন চালাতে হলে তা'তে অতিরিক্ত ব্যয় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ওয়াট্ বুঝতে পারলেন সিলিণ্ডারটিকে এ রকম ঠাণ্ডা হ'তে দেওয়া ঠিক নয়। ষ্টীমের যতটা উত্তাপ সিলিণ্ডারেরও ঠিক ততটা উত্তাপ থাকা একান্ত প্রয়োজন। কি উপায়ে এই সিলিণ্ডারের উত্তাপটি রক্ষা করে ইঞ্জিনটিকে চালান যায়, ওয়াট্ একান্ত চিত্তে শুধু তাই ভাব্‌তে লাগলেন।

ওয়াট্ কি করে এ বিষয়ে সফলতা লাভ করলেন এবার শোন। সেদিন রবিবার। তিনি বিকালে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। অপরাহ্ণের রৌদ্রে তখন চারদিক ঝলমল করছিল। তিনি বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে একটি সুন্দর বাগানে প্রবেশ করলেন। এই বাগানটি ছিল সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য। বাগানে প্রবেশ করে কিছুদুর যেতে না যেতেই হঠাৎ

তাঁর মনে এই সত্যটুকু উদিত হল যে বাষ্প যখন স্থিতিস্থাপক (Elastic) বস্তু তখন কোন বায়ুশূন্য (Vacuum) স্থান পেলেই তা' তাতে প্রবেশ করবে, ও যদি একটি নলেরদ্বারা এই সিলিণ্ডারটিকে একটি বায়ুশূন্য পাত্রের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয় তবে সিলিণ্ডারের বাষ্প বায়ুশূন্য পাত্রে প্রবেশ করবে। তখন সেই বায়ুশূন্য পাত্রে এই বাষ্পকে জলে পরিণত করে নিয়ে কৌশলে একটি পাম্পের সাহায্যে সেই জল ও হাওয়া সেই পাত্র হতে বের করে নেওয়া সহজ হবে। এইভাবে বায়ুশূন্য পাত্রে বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে জলে পরিণত করে নিলে সিলিণ্ডারের উত্তাপকে ঠিকমত রক্ষা করা যাবে।

এই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ওয়াটের মনের মধ্যে তাঁর এই চিন্তাটি একটি পরিস্ফুট আকার পেয়ে উঠ্‌ল। ওয়াট অবিলম্বে সেই বাগান হতে বেরিয়ে এলেন ও এ বিষয় চিন্তা করতে করতে বাড়ী ফিরলেন।

ওয়াটের এই অভিনব আবিষ্কারই বর্ত্তমান ষ্টীম ইঞ্জিনের গোড়াকার কথা। ওয়াট সিলিণ্ডার হতে বাষ্পকে অন্য একটি বায়ুশূন্য পাত্রে কৌশল করে প্রেরণ করে সিলিণ্ডারটির উত্তাপ পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করতে সমর্থ হন। আর সিলিণ্ডারের মাথাটি খুব ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে, যাতে সিলিণ্ডারের মধ্যবর্ত্তী বাষ্পের কোন রকম অপচয় না হয় সেই বন্দোবস্তও করেন। এই রকমের নানাবিধ উন্নতি বিধান করে তিনি এখনকার ষ্টীম ইঞ্জিনের জন্মদান করেন। ওয়াট প্রথম ছোটখাট একটি ইঞ্জিনের আদর্শ (model) তৈরি করে, তা'র দ্বারা প্রথম সকলের মনে এই ধারণাটি জাগ্রত করে দেন যে তাঁর এই নূতন মডেলের ইঞ্জিনটি জগতে একটি অপূর্ব্ব জিনিষ হবে, এবং তা' মানবের কর্ম্মজগতে একটি অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের সূচনা করবে।

এবার তিনি তাঁর এই নূতন ধরণের ইঞ্জিনটি তৈরি করবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। তিনি দেখলেন তা'র এই ইঞ্জিনটি তৈরি করতে ঢের অর্থের প্রয়োজন হবে। কিন্তু তিনি আর অপেক্ষা না করে অবিলম্বে এই কার্য্য আরম্ভ করলেন। তাঁর যা কিছু অর্থসম্বল ছিল তা সবই এই কাজের জন্য ঢেলে দিলেন। তাঁর সমস্ত অর্থ দেখতে দেখতে নিঃশেষিত হয়ে গেল। তিনি অচিরে ঋণজালে জড়িত হয়ে পড়লেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ঠিক এই সময়ে তিনি এমন একজন ব্যক্তিকে তাঁর সহায় ও অংশীদাররূপে পেলেন যাঁর যথেষ্ট অর্থ সম্বল ছিল।

তাঁর এই ইঞ্জিন নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হওয়ার পরে ১৭৭৪ সালে তিনি তাঁর ইঞ্জিনের কার্য্য প্রদর্শনের জন্য তা' বারমিজ্ঘামে পাঠিয়ে দেন এবং তিনি নিজে গিয়ে সেই ইঞ্জিন সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর নূতন ইঞ্জিনের কাজ দেখে সেখানে সকলেই বিস্মিত হয়ে গেল। ইহার কিছুদিন পরে তিনি তাঁর ইঞ্জিন প্রতিষ্ঠাকল্পে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ও অনেক জায়গায় তা প্রতিষ্ঠিত করলেন।

যে সব কয়লাখনির কাজ ভাল রকম ইঞ্জিনের অভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছিল, সে সব জায়গায় ওয়াটের ইঞ্জিন প্রেরিত হল। সে সমস্ত খনির মালিক ও ইঞ্জিনিয়ারগণ ওয়াটের ইঞ্জিনের কার্য্যকারিতা দেখে বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে ওয়াট্‌কে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। ইহার পরে "নিউকোমেন" ইঞ্জিন্ পরিত্যাগ করে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের সমস্ত কয়লাখনি ওয়াটের এই নূতন ইঞ্জিন গ্রহণ করল। ওয়াটের আর্থিক অবস্থা এখন ফিরে গেল। যে ওয়াট কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঋণজালে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন তিনি এবার দেখতে দেখতেই খুব সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠলেন।

ওয়াটের এই সমৃদ্ধির দিনেও তিনি অলসভাবে দিনযাপন করলেন না। তাঁর ইঞ্জিনের কিসে আরও উন্নতি সাধন করতে পারে নিয়ত সেই চেষ্টা করতে লাগলেন। নানাবিধ পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধনের দ্বারা তিনি তাঁর ইঞ্জিনকে যে কোন কাজে নিয়োজিত করা সহজ করে তুললেন, ও তাকে যে কোন ভাবে যে কোন জায়গায় স্থাপন করা সম্ভবপর করে তুললেন।

ওয়াটের ইঞ্জিনের একটি বিশেষত্ব হ'ল এই যে সেই ইঞ্জিনের সাহায্যে বাষ্পের আসুরিক শক্তিকে উচ্চ হতে উচ্চতর মাত্রায় নানা কার্য্যে ব্যবহার করা সম্ভব হল। এই ষ্টীম ইঞ্জিন মানুষকে উন্নতি ও সভ্যতার পথে অগ্রসর হতে অশেষরূপে সহায়তা করেছে। আগে মানুষকে যে সব কাজ হাতে করতে হত, ও যে সব শক্তির কাজ সম্পন্ন করা মানুষের পক্ষে একান্ত কষ্টকর ও অসুবিধাজনক ছিল, আজ সেই সব কাজই এই ইঞ্জিনের সাহায্যে অতি সহজে ও স্বল্প সময়ে সাধিত হচ্ছে। এই ষ্টীম ইঞ্জিন উদ্ভাবনের জন্য আজ সমগ্র মানব সমাজ জেমস্ ওয়াটের নিকটে বিশেষভাবে ঋণী।

বেলুন ও উড়ো জাহাজের কথা

মানুষের পাখীর মতন আকাশে উড়ে বেড়াবার সখ অনেককাল থেকে আছে। জলস্থলের ওপর দিয়ে মানুষ বেশ দিব্য আরামে চলাফেরা করতে পারে কিন্তু আকাশের ওপর দিয়ে তার চলবার অক্ষমতা তাকে সব সময়েই পীড়া দিয়েছে। তোমরা যখন দেখ সুনীল আকাশে পাখীরা বেশ মনের আনন্দে উড়ে বেড়ায়, তোমাদের মধ্যে নিশ্চয় পাখীর মত উড়ে বেড়াবার ইচ্ছাটা তখন খুবই হয়। এই উড়ে বেড়াবার আনন্দটুকু পাবার জন্য তোমাদের যেমন খুব ইচ্ছে করে তেমনি তোমাদের বহুশতাব্দীপূর্ব্বে যাঁরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদেরও এই আকাঙ্ক্ষাটি ছিল খুবই প্রবল।

এই আকাশে উড়ে চলবার চিরপোষিত বাসনাটা মানুষকে যখন বড়ই ব্যাকুল করে তুলল তখন কি উপায়ে এই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করা যায় সেই চিন্তা ও চেষ্টায় অনেকেই আত্মনিয়োগ করল। তোমরা এখন সকলেই জান মানুষের এই একান্ত ব্যাকুলতা, ভগবানের কৃপায় আজ সার্থক হয়েছে। আজ তার পক্ষে আকাশপথে যাতায়াত করা সহজ হয়ে উঠেছে।

যদিও সাধারণের পক্ষে বিমান পথে যাতায়াত করাটা এখনও বিপদসঙ্কুল ও একান্ত ব্যয়সাধ্য, আশা করা যায় এই ব্যোমযানের আরও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সকলের পক্ষেই বিমান পথে আসা যাওয়া খুবই সুবিধাজনক হয়ে উঠবে।

প্রথম কি করে মানুষ এই বিমানপথে যাতায়াত করবার জন্য বেলুন ও জেপ্লিনের (Zepplin) উদ্ভাবন করে তার গল্প এখন তোমাদের বলছি।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিমানপথে উড়ে বেড়াবার মানুষের আকাঙ্খাটি প্রথম কার্য্যে পরিণত হয়, যদিও ইহার পূর্ব্বে বেলুনের সাহায্যে মাটি হ'তে মানুষ বহু উর্দ্ধে উঠতে সমর্থ হয়েছিল।

এই বেলুন প্রথম উদ্ভাবিত হয় চীনদেশে। চীন দেশেই দিগ্‌-দর্শন যন্ত্র ও কাঠের ওপর অক্ষর খোদাইয়ের কাজ, ইউরোপের বহু পূর্ব্বে উদ্ভাবিত হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপে যে ভাবে এই সব নব উদ্ভাবিত যন্ত্রাদি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে, চীনদেশে প্রথম উদ্ভাবিত হলেও তা সেখানে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। সপ্তদশ শতাব্দীতে চীনদেশে প্রথম বেলুন উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু ঠিক কি রকমের বেলুন প্রথম চীনদেশে প্রস্তুত হয়েছিল ও ঠিক কোন সময়ে তা পেকিন সহরের নর-নারীকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে আকাশপথে প্রথম উড্ডীন হয়েছিল তার প্রকৃত খবর আমাদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু ইউরোপে প্রথম বেলুন কে তৈরি করেন ও কি উপায়ে তা তৈরি হল এবং পরে কি করেই বা এই বেলুন ধীরে ধীরে এখনকার দিনের জেপ্‌লিনে পরিণত হয়ে উঠল তা ইতিহাসের কথা।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ক্যাভেণ্ডিস্ নামে ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত রসায়নতত্ত্ববিৎ তাঁর পরীক্ষাগারে নানা রকমের পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে হাইড্রোজেন গ্যাস ওজনে বায়ু অপেক্ষা অনেক হাল্‌কা। হাল্‌কা জিনিষের ধর্ম্মই হল এই যে তা অপেক্ষাকৃত ভারি কোন তরল কি বায়বীয় পদার্থের ওপরে ভেসে ওঠে। তোমরা সবাই জান যে শোলা বা অন্য কোন রকমের হাল্‌কা জিনিষ যদি জলে ডুবিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তা আপনা হতে জলের ওপর ভেসে ওঠে। ক্যাভেণ্ডিস যখন প্রমাণ করলেন যে হাইড্রোজেন্ গ্যাস বায়ু অপেক্ষা ওজনে হাল্‌কা, তখন তার সঙ্গে এও প্রমাণিত হল যে কতকটা

বেলুন, এরোপ্লেন ও জেপ্‌লীন

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার- ৫৪ পৃঃ
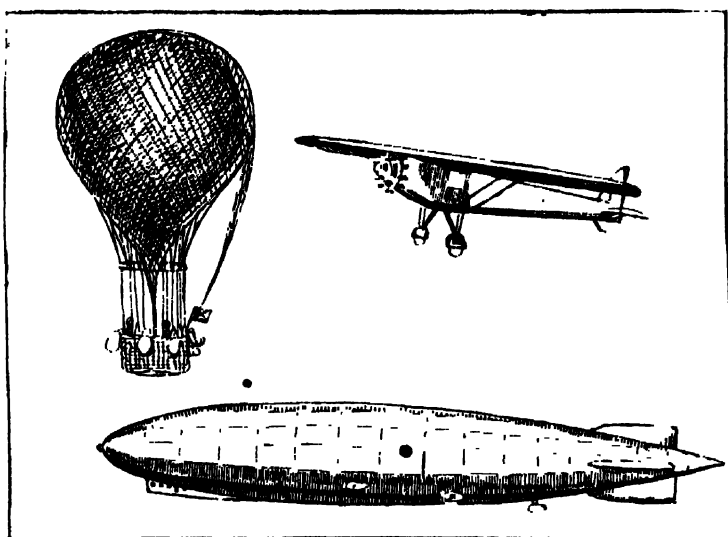
হাইড্রোজেন গ্যাস যদি এই বায়ু মণ্ডলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তা এই ঘন বায়ু বেষ্টনকে ছাড়িয়ে তার ওপরে ভেসে উঠবে। তার গতি স্বভাবতই হ'বে উর্দ্ধ নীল আকাশের দিকে।

এখন ভেবে দেখ যদি কোন উপায়ে একটি থলে এই হাইড্রোজেনে পূর্ণ করে নিয়ে সেই থলেটি শূন্যে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তা ওপর দিকে উঠতে থাকবে। কিন্তু ক্যাভেণ্ডিস্ বহুপূর্ব্বে হাইড্রোজেন গ্যাস সম্বন্ধে এই সত্য আবিষ্কার করলেও, হাইড্রোজেনে পূর্ণ থলে কি বেলুন ওড়াবার কোন চেষ্টাই অনেক বৎসর হয়নি। প্রথম যখন কয়েকটি থলে আকাশে ওড়াবার চেষ্টা হয় তখন সে সব থলে হাইড্রোজেনে পূর্ণ না করে তা গরম ধোঁয়াতে পূর্ণ করে নেওয়া হয়।

ফরাসীদেশে একজন কাগজ ব্যাবসায়ীর দুই পুত্র জোসেফ্ মিসেল্ মোঁগোলফিয়ে (Joseph Michel Montgolfier) ও জ্যাক্-এতিয়েন মোঁগোলফিয়ে (Jack-Etienne Montgolfier) কাগজের বড় বড় থলে প্রস্তুত করে তা গরম ধোঁয়াতে পূর্ণ করে সর্ব্বপ্রথম আকাশে ওড়াতে চেষ্টা করেন। এই ধোঁয়াপূর্ণ থলে ওড়াবার মতলব তাঁদের মনে উদয় হল আকাশে ভাসমান মেঘমালার চলাচল লক্ষ্য করে। তাঁরা ভাবলেন যদি মেঘ বায়ুর ওপর দিয়ে ভেসে চলতে পারে তবে মেঘের মত হাল্‌কা কোন বাষ্পের দ্বারা পূর্ণ বেশ বড় রকমের থলে নিশ্চয়ই হাওয়ার ওপর দিয়ে ভেসে যেতে পারবে।

পরে তাঁরা এ বিষয়ে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন যে গরম ধোঁয়াতে ভরা কাগজের থলে কিছুটা ওপরে উঠে আবার ধীরে ধীরে নেমে আসে। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে থলের ভিতরকার ধোঁয়াটা ঠাণ্ডা হলেই তা' নীচে নেমে আসে। সেই ধোঁয়াটাকে গরম রাখবার জন্য তাঁরা এবার সেই থলের

নীচে একটি আগুনের পাত্র বেঁধে দিয়ে তা উড়িয়ে দেখলেন যে থলেটি এই উপায়ে খুব উচুতে উঠে যায়। এই ধোঁয়াভরা থলে ওড়াবার সফলতা হতেই বেলুনের জন্ম হ'ল।

এ সম্বন্ধে একটি কথা তোমাদের মনে রাখতে হবে। সেই কথাটি হচ্ছে এই যে অধিকাংশ বস্তুকে গরম করলে তা আয়তনে বেড়ে যায়। আবার বায়বীয় পদার্থের এই গুণটি অন্য সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা ঢের বেশি। এই কারণে বায়ু জিনিষটি গরম হলে খুব প্রসারিত হয়ে পড়ে। আর এইরূপ উত্তপ্ত হাওয়া যখন প্রসারিত হয়, তখন তা চারদিককার ঠাণ্ডা হাওয়া হ'তে ওজনে অনেক হাল্কা হ'য়ে উঠে বলে আপনা হতেই ওপরেরে দিকে উঠ্তে থাকে। এই গরম হাওয়া ওপরে উঠ্তে গিয়ে যখন ঠাণ্ডা হয়ে যায় তখন তার গতি হয় আবার নীচের দিকে। এইজন্য থলেগুলিও যখন গরম হাওয়াতে ভর্ত্তি করে নেওয়া হয় তখন তা সমপরিমাণ বাহিরের হাওয়া হতে হাল্কা হ'য়ে যায় বলে উপরের দিকে উঠ্তে থাকে। তার ভিতরকার হাওয়া যতক্ষণ গরম থাকে ততক্ষণ তা বেশ উপর দিকে উঠে, আবার যখন সেই হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে যায় তখন তা নীচের দিকে নেমে আসে।

গরম ধোঁয়াতে ভরা বড় বড় থলে ওড়াবার কৃতকার্য্যতায় উৎসাহিত হ'য়ে মেঁাগোলফিয়ে ভ্রাতৃদ্বয় ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন প্রথম এক বৃহৎ বেলুন ওড়াবার বন্দোবস্ত করেন। তাঁরা খুব যত্নের সহিত এই বেলুনটি নির্ম্মাণ করেন। ঠিক হল সর্ব্বসমক্ষে এই বেলুনটি ওড়ান হবে। এই বেলুনটির পরিধি ছিল প্রায় একশ পঞ্চাশ ফিট্। যে দিন বেলুন উড়বে স্থির হল সেদিন এ ঘটনা দেখবার জন্য এক বৃহৎ জনতার সমাগম হয়। বেলুনটিকে গরম ধোঁয়াতে পূর্ণ করে যখন ছেড়ে দেওয়া হল তখন তা দেখতে দেখতে বহু উর্দ্ধে উঠে গেল। সেই বৃহৎ জনতা পরম বিস্ময়ের

সহিত তা দেখতে লাগল। বেলুনটির ভিতরকার হাওয়াকে গরম রাখবার জন্য তার নীচে কোন আগুনের পাত্র বেঁধে নেওয়া হল না বলে তার ভিতরকার হাওয়া খুব শীঘ্রই ঠাণ্ডা হয়ে যায় ও বেলুনটিও অতি শীঘ্র নেমে আসে। এই ঘটনায় চারদিকে বেলুন সম্বন্ধে একটি সাড়া পড়ে গেল।

এই সাফল্যে অতিমাত্র উৎসাহিত হয়ে মোঁগলফিয়ে ভ্রাতৃদ্বয় ইহার পরে এক রকম কাপড় দিয়ে আর একটি খুব বড় ও সুন্দর বেলুন নির্ম্মাণ করেন। এই বেলুনটিকে নানারঙে খুব সুন্দর করে চিত্রিত করা হয়। বেলুনটি দেখ্‌তে হল ভারি সুন্দর। যখন বেলুন তৈরি হয়ে গেল তখন চারদিকে প্রচার করে দেওয়া হল যে এবার বেলুন যাত্রী নিয়ে ওপরে উঠবে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ৯ই সেপ্টেম্বর এই বেলুনটি আকাশপথে উড়বে স্থির হল। সেদিন ফ্রান্সের চারদিক হ'তে অগণিত নরনারী ব্যগ্র ও উৎসুক চিত্তে মোঁগোলফিয়ে ভ্রাতৃদ্বয়ের বেলুনের বিমানযাত্রা দেখতে উপস্থিত হল। ফ্রান্সের বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোকও সেদিন সেখানে দর্শকরূপে উপস্থিত হ'লেন। এবার বেলুন তিনটি যাত্রী নিয়ে উপরে উঠবে স্থির হ'ল। এই প্রথম তিনটি বেলুনযাত্রীর নাম শু'নে তোমারা নিশ্চয় খুব হাসবে। মোঁগলফিয়ে ভ্রাতৃদ্বয় বেলুনের নীচে বেশ শক্ত করে একটি ঝুড়ি বেঁধে দিয়ে তাতে তুলে দিলেন সেই তিনটি যাত্রীকে। এই প্রথম বেলুনযাত্রীর একটি হল মেষ, একটি হল মোরগ, আর একটি হাঁস। তখন এই যাত্রীসহ বেলুনটিকে ছেড়ে দেওয়া হল। শত শত নরনারীর আনন্দধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বেলুনটি ওপরের দিকে উঠতে লাগল। আট মিনিট এই বেলুন আকাশে ভেসে বেড়িয়ে আবার ধীরে ধীরে ঐ তিনটি যাত্রীকে নিয়ে নিরাপদে নেমে এল। এই ব্যাপারে ফরাসী রাজ্যে একটি মহা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃজন হল।

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই একজন সাহসী পুরুষ বেলুনে আরোহণ করেন। যিনি প্রথম বেলুনে উঠলেন, বুঝতেই পার তিনি কি রকম সাহসী ছিলেন। তাঁর সাহস দেখে সকলে অবাক্ হয়ে গেল। তিনি ওপরে উঠলেন আবদ্ধ বেলুনে (Captive Baloon) আরোহণ করে। যে বেলুনে করে তিনি প্রথম উঠলেন, সেই বেলুনটিকে একেবারে শূন্যে ছেড়ে দেওয়া হ'ল না। যেমন তোমরা সুতোদিয়ে ঘুড়ি ওড়াও ও যতটা নাটাইয়ের সুতা তোমরা ছাড় ততটা উচ্চেই তোমাদের ঘুড়ি উঠতে পারে, তেমনি মানুষ নিয়ে যে বেলুনটি প্রথম আকাশ পানে উঠল তাতে একটি একশ ফিট লম্বা শক্ত দড়ি বেঁধে দিয়ে দড়ির অপর প্রান্তটি নীচে আবদ্ধ করে রাখা হ'ল। প্রথম যিনি এই আবদ্ধ বেলুনে আরোহণ করে একশ ফিট উর্দ্ধে উঠলেন তাঁর নাম হল "পিলাত্র্ দি রজিয়ে (Pelatre de Rozier) তিনি সুস্থ দেহে প্রাণ নিয়ে নেমে এসে তাঁর এই নব অভিজ্ঞতার কথা সানন্দে সকলের নিকট বিবৃত করতে সমর্থ হলেন।

কিছুদিন পরে এই বীর পুরুষই তাঁর এক বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে আবার বেলুনযোগে আকাশে উঠেন। কিন্তু এবার তিনি যে বেলুনে উঠলেন তা আবদ্ধ বেলুন নয়, তা ছিল মুক্ত বেলুন। এবার আর বেলুনকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হলনা। এই মুক্ত বেলুনটি তাঁদের নিয়ে বহু উর্দ্ধে উঠে গেল। প্রায় পাঁচশ ফিট উপরে উঠে কুড়ি মিনিট আন্দাজ হাওয়ার ওপর ইতস্ততঃ ভেসে বেড়িয়ে তা নিরাপদে আবার নীচে এসে পৌছল। উৎফুল্ল ও উৎসাহোন্মত্ত ফ্রান্স মোগোলফিয়ে ভ্রাতৃদ্বয়কে এই বেলুন উদ্ভাবনের জন্য যথেষ্ট পুরস্কৃত করেন, এবং তাঁদের এই বেলুন সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের বিশেষ পুরস্কারস্বরূপ তাঁদের পিতৃদেবকে তদানীন্তন অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত করে সম্মানিত করেন।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে বিখ্যাত লুনার্ডি' (Lunardi) সর্ব্ব প্রথম অক্সফোর্ড সহরে বেলুনে আরোহণ করেন। ইহার কিছুদিন পরে বেলুনে আরোহণ করা তখনকার দিনের একটি সখের খেয়ালে পরিণত হয়ে উঠে।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম আবদ্ধ বেলুন (Captive Baloon) যুদ্ধের সময় বায়বীয় পরিদর্শন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

কথিত আছে যখন ১৮১১ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ানের পুত্র জন্মগ্রহণ করেন তখন "মাদাম ব্লাসার" (Madam Blachard) নামে এক মহিলা বেলুনে আরোহণ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘোষনা-পত্র দ্বারা এই সুখবর চারদিকে প্রচার করেন। এই রকমের অনেক কাজই তখন বেলুনের সাহায্যে হতে লাগ্‌ল। কিন্তু কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যে তখনও ইহার তেমন প্রচলন হয়নি।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার অন্তর্বিপ্লবের সময় আবদ্ধ বেলুনকে বায়বীয় পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে দেখে জার্ম্মানীর সামরিক বিভাগের জেপ্‌লিন নামক এক উচ্চ কর্ম্মচারী বড়ই মুগ্ধ হন। তিনি জার্ম্মানীতে ফিরে গিয়ে সেখানকার সামরিক বিভাগের কর্ত্তাদের নিকট আমেরিকার অন্তর্বিপ্লবের সময় আবদ্ধ বেলুনের কার্য্যকরিতা ও সাফল্যের কথা বিবৃত করে, ভবিষ্যতে যুদ্ধ বিপ্লবের সময় এইরূপ বেলুন ব্যবহার করবার জন্য তাঁদের বিশেষ অনুরোধ করেন। এই জেপ্‌লিনই উড়ো জাহাজের উদ্ভাবন কর্ত্তা। উড়ো জাহাজ সম্বন্ধে অন্য সবকথা তোমাদের পরে বলছি।

তোমাদের বলেছি যে প্রথম প্রথম বেলুন উত্তপ্ত ধোঁয়াতে পূর্ণ করে নেওয়া হ'ত। এ উত্তপ্ত ধোঁয়া প্রসারিত হয়ে চারিদিকটার শীতল বায়ু হতে হাল্‌কা হয়ে যেত বলে সেই শীতল বায়ু-বেষ্টন বেলুনকে ওপরদিকে ঠেলে তুলত। আবার বেলুনের ভিতরকার হাওয়া ঠাণ্ডা হলেই তা নীচে নেমে আস্‌ত বলে এই হাওয়াকে গরম রাখবার

জন্য বেলুনের নীচে একটি আগুনের পাত্র বেঁধে দেওয়া হ'ত। এইটি ছিল ধোঁয়াভরা বেলুনের একটি প্রধান অসুবিধা। আর এই ধোঁয়াভরা বেলুন খুব ওপরেও উঠ্‌তে পারত না। এই সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সত্বরই গরম হাওয়ার পরিবর্ত্তে বেলুনে হাইড্রোজেন ব্যবহৃত হতে সুরু হল। হাইড্রোজেন্ সকল রকম বায়বীয় পদার্থ হতে হাল্‌কা বলে তা খুব শীঘ্রই বেলুনকে উপরে তুলে নিতে সমর্থ হল। এই হাইড্রোজেন পূর্ণ বেলুনের আর একটি প্রধান সুবিধা হল এই যে তারা সহজে নীচে নেমে আসবার আর কোন ভয় রইল না।

প্রফেসার জে, এ, সি সার্বসের (J. A. C. Charbs) তত্ত্বাবধানে রবার্ট ভ্রাতৃদ্বয় ফ্রান্সে একটি ছোট বেলুন নির্ম্মাণ করেন ও তা হাইড্রোজেন গ্যাসে পূর্ণ করে প্রথম আকাশে ওড়ান। বেলুনটি অতি শীঘ্রই প্রায় তিন হাজার ফিট্ উচ্চে উঠে উড়্‌তে লাগ্‌ল। এই বেলুনে লোকজন কেউ প্রথম উঠ্‌ল না। ইহা প্রায় ৪৫ মিনিট আকাশে উড়ে বহু দূরবর্ত্তী একটি শস্যক্ষেত্রে গিয়ে পড়ে। সেখানকার লোকজন এই অদ্ভুত বস্তুটিকে দেখে প্রথম ভয়ে চারদিকে পালিয়ে যায়, কিন্তু পরে সাহস সঞ্চয় করে সদলবলে এসে এই বেলুনটির দফারফা করে। বন্দুক, লাঠি, বর্শা, যার যা হাতিয়ার ছিল, তা নিয়ে এসে এই বেলুনটিকে একেবারে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছাড়ে।

হাইড্রোজেন ওজনে বায়ুর এক চতুর্দ্দশাংশ মাত্র ভারি; কাজেই গরম ধোঁয়া হতে এই গ্যাস ঢের বেশি জোরে বেলুনকে ওপর দিকে তুলে নিতে পারল। এই হাইড্রোজেন ব্যবহারে সুবিধা যেমন খুব হল তাতে একটা নূতন ভয়ের কারণও সৃষ্টি হল। ভয়ের বিষয় হ'ল এই যে হাইড্রোজেন গ্যাসটি একটি দাহ্য বস্তু। হঠাৎ তা যদি কোন কারণে জ্বলে ওঠে তবে সমূহ বিপদ।

হাইড্রোজেন পূর্ণ বেলুন কি কারণে খুব ক্ষিপ্রগতিতে ওপরদিকে উঠে তা তোমাদের বলছি। সমপরিমাণ বায়ু হ'তে হাইড্রোজেন বেশ হাল্‌কা এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এই হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে যখন বেলুন ভর্ত্তি করে নেওয়া হয় তখন চারিদিককার বায়ু ছুটে এসে বেলুনের নীচে সঞ্চিত হ'য়ে বেলুনকে খুব জোরে উপরের দিকে ঠেলে তুলে দেয়। যতই বেলুনটি উপরের দিকে উঠতে থাকে ততই ক্রমশঃ ওপরকার বায়ুস্তরের ঘনত্ব নীচেকারের বায়ুস্তরের ঘনত্ব হ'তে কম হতে থাকে। যতক্ষণ না সেই গ্যাসপূর্ণ বেলুনটি তার সমস্ত সাজসরঞ্জাম ও লোকজন নিয়ে সম পরিমাণ বায়ুর ওজনের সমান হবে ততক্ষণ তা ক্রমাগত উপরদিকে উঠতে থাকবে। আর বায়ুর সেই উচ্চস্তরে গিয়ে বেলুনের উর্দ্ধগতি রুদ্ধ হ'বে যেই স্তরের সমপরিমাণ হাওয়ায় ওজনের সঙ্গে বেলুনের ওজন ঠিক সমান হবে। সূর্য্য যখন মেঘমুক্ত থাকে তখন সূর্য্যের খররশ্মি বেলুনের গ্যাসের থলের ওপর পরে তার ভিতরকার গ্যাসকে উত্তপ্ত করে তোলে। আর গ্যাস উত্তপ্ত হলে আরও প্রসারিত হয় এবং অধিকতর হাল্‌কা হয়ে উঠে। গ্যাস যতই হাল্‌কা হয় বেলুন ততই উর্দ্ধে উঠতে থাকে। গ্যাস অতিমাত্র প্রসরণশীল বলে থলের ভিতরে যদি তার প্রবৃদ্ধির যথেষ্ঠ জায়গা না থাকে তবে গ্যাসের চাপে সে থলে ফেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এই ভয়ের কারণ দূর করবার জন্য বেলুনের ঠিক নীচে এই উত্তপ্ত প্রসারিত গ্যাস বেরিয়ে যাবার জন্য একটি পথ রাখা হয়। মেঘলা ও বৃষ্টিরদিনে গ্যাসের থলে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও ভারি থাকে বলে বেলুন তখন খুব উচুতে উঠ্‌তে পারে না।

হাইড্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে বেলুন খুব উর্দ্ধে উঠতে পারল তা ঠিক, কিন্তু ইহার একটি ভয়ানক অসুবিধা হল এই যে এইরূপ বেলুনের গতি-পথ ইচ্ছানুরূপ নিয়মিত করা সম্ভব হল না। বেলুনের গতি তখন

সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করত বায়ুপ্রবাহের উপর। হাওয়ার খেয়ালমত তাকে চলতে হত। মানুষের ইচ্ছামত তাকে চালান যেত না। বেলুনের গতি যে একেবারে নিয়মিত করা যেতনা তা নয়, কিছুটা অবশ্য নিয়মিত করা সম্ভব হত। কিন্তু এই সামান্য রকম গতিনিয়মন করাও একান্ত কষ্টসাধ্য ছিল। বেলুনের ওপর হতে কিছু "ব্যালাষ্ট" (Ballast) বা বোঝা ফেলে দিয়ে তাকে ওপরে উঠান যেত ও বেলুনের মাথারদিকে যে একটি আঁটা ঢাক্‌নি (Valve) থাকত তাকে একখানা তারের সাহায্যে কতকটা খুলে, কিছুটা গ্যাস বার করে দিয়ে, বেলুনকে নীচের দিকে নামান হত। এইভাবে বেলুনকে উঠিয়ে নামিয়ে, ওপরকার বায়ুমণ্ডলের মধ্যে এমন একটি বায়ুপ্রবাহ খুঁজে বের করে নিতে হত, যেই অনুকুল বায়ুস্রোতের সাহায্যে কতকটা তাঁকে ইচ্ছানুযায়ী নিয়মন করা সম্ভব হত। কিন্তু এভাবে গতি নিয়মন করা বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল। তাই তখন যুদ্ধের সময় যে সব বেলুন ব্যবহৃত হত তা সব আবদ্ধ বেলুন। মুক্ত বেলুন কখনও যুদ্ধে ব্যবহৃত হত না, কারণ তাকে প্রয়োজনানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব ছিল না।

ইচ্ছামত গতি নিয়মিত করা যায় এরূপ কোন বেলুন উদ্ভাবন করা যেতে পারে কিনা সে বিষয়ে জার্ম্মানীর কাউণ্ট জেপলিন্ চিন্তা করতে লাগলেন। এইরূপ নিয়মনক্ষম বেলুন (Dirigible) উদ্ভাবন করবার জন্য কাউণ্ট জেপ্‌লিন বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ করলেন। তিনি এমন একটি উড়োজাহাজ নির্ম্মাণ করতে চাইলেন, বায়ুপ্রবাহকে উপেক্ষা করে যাকে যেদিকে খুসী চালনা করা যেতে পারে।

কাউণ্ট জেপ্‌লিন প্রথম খুব বড় ধরণের ও অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য একটি উড়ো জাহাজ নির্ম্মাণ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর প্রথম তৈরি উড়ো জাহাজটি ভাল চলল না। পরে একটির পর একটি অনেক উড়ো

জাহাজ, তাঁর তৈরি নষ্ট হল। এক একবার এক একখানা জাহাজ নষ্ট হয় আবার দ্বিগুণিত উৎসাহের সহিত আর একটি নির্ম্মাণ করেন। এইরূপে তিনি অনতিবিলম্বে বিশেষ ভাবে ঋণজালে জড়িত হয়ে পড়েন। তখন সকলেই বলতে লাগল কাউণ্টের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু জেপ্‌লিন তাঁর সম্বন্ধে কোন সমালোচনা ও মন্তব্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে অনন্যচিত্তে তাঁর সাধনায় নিমগ্ন রইলেন। বহুদিনের নিরলস চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এবার তিনি একটি খুব সুন্দর উড়োজাহাজ নির্ম্মাণ করতে সমর্থ হলেন। তাঁর এই জাহাজটি আকাশপথে ২৭০ মাইল যেতে সমর্থ হল। তাঁকে যারা নানারূপ বিদ্রূপ করছিল এবার তারা সকলেই নির্ব্বাক হয়ে গেল। জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট তাঁর নির্ম্মিত এই উড়ো জাহাজটি দেখে তাঁকে এই কার্য্যে বিশেষরূপে উৎসাহিত করবার জন্য এখন থেকে অজস্র অর্থ সাহায্য করতে আরম্ভ করেন।

কাউণ্ট জেপ্‌লিন যে সব বড় বড় উড়ো জাহাজ তৈরি করলেন সে সব জাহাজের নাম হল তাঁর নামে "জেপ্‌লিন।" তিনি অনেক উড়ো জাহাজ তৈরি করলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর প্রত্যেকটি উড়োজাহাজ কোন না কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা হেতু একটির পর একটি ধ্বংস হতে লাগল। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এইভাবে তার নির্ম্মিত ১৩ খানি জেপ্‌লিন্ জাহাজ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জার্ম্মান সরকার তাঁকে বিস্তর অর্থ সাহায্য করে তাঁর সমস্ত লোকসানের ক্ষতিপূরণ করে দিলেন। কাউণ্টও অধিকতর উৎসাহের সহিত তাঁর প্রত্যেক নবনির্ম্মিত জাহাজকে তাঁর আগেকার তৈরি জাহাজ হতে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্টতর করে তুলতে যত্নপর হলেন।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ড কিন্তু বড় রকমের জেপ্‌লিন্ জাহাজ নির্ম্মাণ করতে ততটা চেষ্টা করল না। তারা জেপলিনের পরিবর্ত্তে হালকা ও দ্রুতগামী

এরোপ্লেন নির্ম্মাণ কার্য্যে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করে। এই এরোপ্লেন সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা পরে অন্য জায়গায় তোমাদের বলব।

প্রয়োজন মত সব রকম ঝড় ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে চালাতে হবে বলে কাউন্ট তাঁর নির্ম্মিত উড়ো জাহাজগুলিকে খুব দৃঢ়করে তোলবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু শুধু শক্ত করলে ত চলবেনা, কারণ শক্ত করতে গিয়ে যদি তা একান্ত ভারি হয়ে যায় তবে তা হাওয়ার ওপর দিয়ে সহজে চলতে পারবেনা। এই কারণে তিনি য়্যালুমিনাম, তামা ও নিকেল দিয়ে এক নূতন মিশ্রধাতু তৈরি করে তা দিয়ে এই জেপলিন জাহাজের কাঠামটি তৈরি করলেন। এতে তা' শক্তও হ'ল আর খুব হাল্‌কাও হল। এই কাঠামটি তিনি ক্যান্‌ভাসের আবরণে আবৃত করে নিলেন, এবং যে গ্যাসের সাহায্যে তা ওপরে উঠবে ও চলবে সেই গ্যাস, একটি প্রকাণ্ড থলে করে না নিয়ে ছোট ছোট থলে করে নিলেন ও তা সব উড়োজাহাজের ভিতরে রাখলেন। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন থলেতে গ্যাস ভর্ত্তি করে রাখবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে যদি কোন কারণে একটি থলে ফুটো হয়ে যায় তবে অন্য সকল থলের সাহায্যে জাহাজ চলবে ও হঠাৎ তার চলা বন্ধ হয়ে নীচে নেমে আসবার ভয় থাকবে না। পরের সব জেপলিনই এই উপায়ে তৈরি হয়, এবং সাধারণত এই সব জেপলিনের দৈর্ঘ্য হল প্রায় আটশ ফিট ও ব্যাস হল প্রায় ৭৫ ফিট্। এই বিরাট জেপলিনগুলো তার ভিতরকার সব সাজ সরঞ্জাম নিয়ে ওজনে হল প্রায় ১৪০০ মন। কিন্তু তার ওজন অত বেশি হলেও তার ভিতরকার হাইড্রোজেন গ্যাস্ বায়ু হ'তে ঢের বেশি হাল্‌কা বলে সেই গ্যাসের সাহায্যে বৃহৎ জেপলিনগুলো আরও অতিরিক্ত প্রায় ২৮০ মন ওজন সহজে বহন করে নিতে সক্ষম হ'ল। এরকম এক একটি জাহাজ প্রায় কুড়িজন যাত্রী নিয়ে আকাশপথে চলতে পারল।

হাইড্রোজেন গ্যাস খুব সহজে জ্বলে উঠে বলে, গ্যাসের থলের নিকট জেপলিনের ইঞ্জিন স্থাপন করলে বিপদ হ'তে পারে এই ভয়ে, বেলুনের নীচে, কতকটা দূরে ঝোলান চারখানা গাড়ীতে ইঞ্জিনগুলো রাখবার ব্যবস্থা করা হয়।

এত সাবধানতার সহিত ও এত অর্থব্যয়ে তৈরি হ'য়েও এই বিরাট উড়ো জাহাজগুলো বিগত যুদ্ধের সময় মোটেই সুবিধা করতে পারে নি।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় যে সকল জেপলিন্ ব্যবহৃত হয়েছিল তাতে অন্য কোন রকম ব্যালাষ্ট বা বোঝার পরিবর্ত্তে জল নেওয়া হ'ত। যখনই খুব শীঘ্র ওপরে উঠবার দরকার হ'ত তখন জল কিছু ফেলে দিয়ে জেপলিনকে হালকা করে নিলেই তা ত্বরিতে ওপরে উঠে যেত; কিন্তু ওপরকার বায়ুস্তর অত্যন্ত ঠাণ্ডা বলে যাতে সেই ঠাণ্ডা বায়ুর স্পর্শে জল না জমে যায় এইজন্য জলের সহিত য়্যালকহল (Alchohol) মিশ্রিত করে দেওয়া হত। এই জেপলিন্ নির্ম্মাণ করবার গুপ্ত কৌশল শত্রুপক্ষের কোন দেশ যেন না জানতে পারে এজন্য জার্ম্মানরা খুবই সাবধানতা অবলম্বন করে এসেছিল। কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও ফ্রান্স দৈবক্রমে এর ভিতরকার নির্ম্মাণ কৌশলটি সব জেনে নিল। একবার যখন একখানি জেপলিন্ শত্রুপক্ষের কোন দেশের ওপর বোমা নিক্ষেপ করে ফিরে আসছিল তখন সেই জেপলিনের যে জলটা "ব্যালাষ্ট"রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল তা ঠাণ্ডাতে জমে যায়। জল হঠাৎ জমে যাওয়াতে জেপলিনকে বাধ্য হয়ে নীচে নেমে আসতে হয়। জেপলিনের নাবিকরা তা ধ্বংস করতে সক্ষম হবার পূর্ব্বেই ফরাসীরা এসে তা অধিকার করে এবং তার ভিতরকার সমস্ত নিগূঢ় নির্ম্মাণ কৌশলটি জেনে নেয়।

গত যুদ্ধের সময় ছোট ছোট এরোপ্লেনের সঙ্গে জেপলিন্ কিছুতেই

পেরে উঠেনি। এরোপ্লেন ছোট ও খুব হালকা হওয়াতে তার গতিবেগ জেপলিনের গতিবেগের অপেক্ষা দ্বিগুণ বেশি ছিল। এরোপ্লেনের ভিতর মেশিনবন্দুক রাখা হত, আর দূর হতে জেপলিন দেখতে পেলেই তার হাইড্রোজেনের থলেগুলি লক্ষ্য করে বন্দুক ছোঁড়া হত। হাইড্রোজেনের থলেতে গুলি লাগলেই সমস্ত হাইড্রোজেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত ও সেই আগুনে বিরাট জেপলিনটি পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যেত। জেপলিন্ হতে নিক্ষিপ্ত "সার্পনেলে"র (Sharpnel) আঘাত এড়াবার জন্য এরোপ্লেন জেপলিনের বহু উর্দ্ধে থাকিত। জেপলিনের ওপরে কামান বসানো থাকা সত্ত্বেও চারদিক থেকে যখন ক্ষিপ্র গতিতে এরোপ্লেনগুলো এসে তাকে আক্রমণ করত তখন জেপলিন্ একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়ত এবং অচিরে বিনষ্ট হয়ে যেত।

এরোপ্লেনের ভয়ে, পরে জেপলিন্ কেবল রাত্রিকালে শত্রুপক্ষের দেশ আক্রমণ করতে বেরুত। কিন্তু যুদ্ধের শেষের দিকে অবতরণস্থানের (Landing Station) সন্ধান-আলোকের (Search light) সাহায্যে এরোপ্লেনের পক্ষেও রাত্রে চলাফেরা করা সম্ভবপর হয়ে উঠে। রাত্রের গভীর অন্ধকারে এরোপ্লেনের পক্ষে জেপলিন্ কোথা আছে তা নির্ণয় করা বড় কঠিন ব্যাপার হ'ত। কারণ এরোপ্লেনের ভয়ানক গর্জ্জনে জেপলিনের ইঞ্জিনের শব্দ মোটেই শোনা যেত না।

যখন আমেরিকা জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন মিত্র-পক্ষের সকলে আমেরিকাকে জিজ্ঞাসা করে যে, এমন কোন গ্যাস আবিষ্কার করা যেতে পারে কিনা যা হাইড্রোজেনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যেতে পারে ও হাইড্রোজেনের মত বিদারণশীল না হয়। পরে মিত্রপক্ষের বৈজ্ঞানিকেরা আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদের বলেন যে যদি কোন উপায়ে প্রচুর পরিমাণে হীলিয়াম (Helium) গ্যাস পাওয়া যায় তবে

তা হাইড্রোজেনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যেতে পারে, ও উড়ো জাহাজে হাইড্রোজেনের পরিবর্ত্তে হীলিয়াম গ্যাস ব্যবহৃত হলে তাতে জাহাজের গতিবেগ ও ঢের বেড়ে যাবে। কিন্তু তখন বেশি পরিমাণ এই হীলিয়াম গ্যাস পাওয়া অসম্ভব ছিল, কারণ তখনও পৃথিবীতে খুব স্বল্প পরিমাণ মাত্রই এই গ্যাস ছিল।

এখন এই হীলিয়াম গ্যাসের কথা কিছু বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। এই হীলিয়াম গ্যাস ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে স্পেক্‌ট্রোস্কোপ্ (Spectroscope) যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যমণ্ডলস্থ প্রদীপ্ত বায়ুমণ্ডলে প্রথম দেখা যায়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় এই গ্যাস আছে প্রথম তাহা জানা যায়। এই পৃথিবীতে এই গ্যাস আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে, প্রায় ৯ ক্রোড় মাইল দূরস্থ সূর্য্যমণ্ডলে তা প্রথম আবিষ্কৃত হয় ইহা বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার। পৃথিবীতে প্রথম যখন এই গ্যাস পাওয়া গেল তখন দেখা গেল হাইড্রোজেন ছাড়া, বায়ু ও অন্য সব গ্যাসের চাইতে এই হীলিয়াম গ্যাস ঢের বেশি হাল্‌কা। কেবল হালকা তা নয় এই গ্যাসের আর একটি বিশেষ গুণ দেখা গেল এই যে ইহা জ্বলে না। এই গ্যাসের সহিত আবার অন্য কোন উপাদানের রাসায়নিক মিশ্রণও হয় না। পৃথিবীতে এই গ্যাসের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই মনে করে বেশি পরিমাণে এই গ্যাস উৎপাদনের কোন চেষ্টাও কোন বৈজ্ঞানিক ইতিপূর্ব্বে কখনও করেননি। কিন্তু যখন প্রথম উড়ো জাহাজের জন্য ইহার একান্ত উপযোগিতা সকলে বুঝতে পারলেন তখন সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণ হীলিয়াম গ্যাস্ পাওয়া গেল। তখন আমেরিকার কোন রাসায়নিক পরীক্ষাগারেই মাত্র পাঁচ কিউবিক ফিটের বেশি এই গ্যাস ছিল না, এবং ইহার প্রত্যেক কিউবিক ফুট্ পরিমাণের মূল্য ছিল প্রায় ১৫০০০৲ টাকা।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধিৎসার ফলে সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় হীলিয়াম্ গ্যাস পাওয়া গেল প্রাকৃতিক অন্যান্য গ্যাসের সহিত মিশ্রিত অবস্থায়। ওক্লাহোমা, টেক্সাস্ ও কান্‌সাস্ প্রভৃতি জায়গায় এই গ্যাসকে এই অবস্থায় পাওয়া যায়। এখন মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় কি করে এ গ্যাসকে অন্য প্রাকৃতিক গ্যাস হ'তে পৃথক্ করা যায়। প্রত্যেক গ্যাসকেই খুব বেশি রকম ঠাণ্ডা করে নিতে পারলে তা ঘনীভূত হ'য়ে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং আরও অতিরিক্ত ঠাণ্ডাতে তা জমে গিয়ে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল যে হীলিয়াম গ্যাসকে তরল অবস্থায় পরিণত করা একান্ত কঠিন। শূন্য বিন্দুরও (Zero point) ২৬৮° ডিগ্রীর নীচে নিতে পারলে এই গ্যাস দ্রবীভূত হয়। এই ঘটনা লক্ষ্য করে একজন রসায়নতত্ত্ববিৎ এই হীলিয়াম্ গ্যাসকে পৃথক করবার এক উপায় উদ্ভাবন করতে সমর্থ হলেন। তিনি যে সব গ্যাসের সঙ্গে হীলিয়াম গ্যাস মিশ্রিত থাকে সে সমস্ত মিশ্রিত গ্যাসকে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করে নিয়ে, তা' হতে হীলিয়াম গ্যাসকে পৃথক করে নেওয়ার উপায় করলেন। হীলিয়াম গ্যাসকে তরল করতে যে পরিমাণ শৈত্যের প্রয়োজন হয় অন্য সমস্ত গ্যাসকে তরল অবস্থায় আনতে অতটা শৈত্যের প্রয়োজন হয় না। কাজেই ধীরে ধীরে যখন অন্য সব গ্যাসের তাপ কমতে থাকে তখন একটির পর একটি সব গ্যাসই তরল অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। শুধু বাকী থাকে হীলিয়াম গ্যাস। এই উপায়ে অন্যান্য গ্যাস হতে হীলিয়াম্ গ্যাসকে পৃথক করে নেওয়া সম্ভবপর হল।

ইহার পরে সমস্যা হল কি উপায়ে অল্প ব্যয়ে অধিক পরিমাণ হীলিয়াম গ্যাস পাওয়া যায়। দেখা গেল প্রত্যেক কিউবিক ফুট হীলিয়াম গ্যাসের দাম কমিয়ে যত দিনে না ছয় পয়সা আন্দাজ করা

যায় ততদিন তা' উড়ো জাহাজে ব্যবহার করা সম্ভবপর হবে না, কারণ তাতে খরচা পড়বে ঢের। বড় বড় রসায়নবিৎদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে শেষে ইহাও সম্ভব হয়ে উঠল। বিগত মহাযুদ্ধের পরে এই হীলিয়াম গ্যাসের দাম হ'ল প্রত্যেক কিউবিক ফুট চার পয়সা! এখন সব উড়ো জাহাজেই হাইড্রোজেনের পরিবর্ত্তে এই হীলিয়াম গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

হীলিয়াম গ্যাস ব্যবহার করাতে, এখন উড়ো জাহাজের ইঞ্জিন বাহিরে না রেখে তার ভিতরে রাখা সম্ভবপর হয়েছে এবং এই ব্যবস্থার ফলে জাহাজের সঞ্চালক (Propellers), তার মধ্যবর্ত্তী লাইনের ওপর শক্তিপ্রয়োগ করতে পারে বলে, তার গতিবেগও সমধিক বর্দ্ধিত করা সম্ভব হয়েছে।

হাইড্রোজেনের পরিবর্ত্তে এই হীলিয়াম গ্যাসের প্রচলন হওয়াতে উড়ো জাহাজের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। ১৯২৬ সালে এই হীলিয়াম গ্যাসের সাহায্যে "নরজে" নামক একখানি ইটালীয় উড়ো জাহাজ উত্তরমেরু অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হয়েছে

এইরূপ বড় বড় উড়ো জাহাজের গতিবেগ এরোপ্লেন হতে একটু কম হ'লেও ইহার দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে মানুষের দেশ দেশান্তরে শীঘ্র যাতায়াতের যথেষ্ট সুবিধা হ'বে সকলেই আশা করছেন। উড়ো জাহাজের দ্বারা বাণিজ্য ব্যবসায় ও অন্যান্য বিষয়ের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হ'বে—ইহাতে সন্দেহ নেই।

এরোপ্লেনের কথা

তোমরা বেলুন ও উড়ো জাহাজের কথা পূর্ব্বেই শুনেছ। এবার তোমাদের এরোপ্লেনের কথা বলব। বেলুন ও উড়ো জাহাজ সম্ভবত তোমরা কেউ দেখনি, কিন্তু এরোপ্লেন তোমরা প্রায় সবাই দেখেছ। এরোপ্লেন মাথার ওপর দিয়ে যখন উড়ে যায়, তখন তার শব্দ শুনে তোমরা বুঝতে পার যে এরোপ্লেন যাচ্ছে ও তা দেখবার জন্য তোমরা চারদিক থেকে ছুটে আস। এই এরোপ্লেন "জেপ্‌লিন" হতে ঢের ছোট, কিন্তু ইহার গতিবেগ জেপ্‌লিনের চাইতে ঢের বেশি। ইহাকে ইচ্ছানুযায়ী ইতস্ততঃ চালনা করা খুব সহজ।

এরোপ্লেন দেখতে অনেকটা পাখীর মত। তার দুপাশে সাধারণতঃ লম্বা মতন দুখানা করে পাখা থাকে, যাকে বলা হয় "প্লেন-এণ্ডস" (plane ends)। এই পাখাগুলো আবার এমনভাবে তৈরি হয় যাতে বায়ুপ্রবাহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা আপনা হতে প্রয়োজনমত ওঠানামা করতে পারে। দুদিককার পাখাগুলির প্রত্যেক অংশ, শক্ত ধাতু-নির্ম্মিত কতকগুলি নিয়ামক তন্ত্রী (Control-cords) দ্বারা এমন সুন্দরভাবে পরস্পর সংযুক্ত থাকে যে, তার প্রত্যেক অংশের গতি ও অবস্থানের দ্বারা তার অপরাপর অংশের গতি ও অবস্থান স্বতঃই নিয়মিত হয়। হঠাৎ একটি প্রবল বায়ুপ্রবাহে যদি এরোপ্লেনের একদিককার পাখার প্রান্তভাগ বিশেষভাবে নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তার সেই দিককার তন্ত্রীটিতে সঙ্গে সঙ্গে এমন এক টান পড়ে যে তার ফলে অবিলম্বে পাখাটি পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরে আসে। এই নিয়ামক

তন্ত্রী দ্বারা সংযুক্ত পাখাগুলোর প্রত্যেক অংশ আপনা হ'তে নিয়ন্ত্রিত হয়ে তাদের সামঞ্জস্য ও সমতা রক্ষা করে।

এরোপ্লেনকে চালান হয় ইঞ্জিনের সাহায্যে। এই ইঞ্জিনের কথা ও তা এরোপ্লেনের কোন্‌দিকে বসান থাকে সে সব তোমাদের পরে বলব।

বেলুন ও জেপ্‌লিন ওপরে উঠে হাইড্রোজেন্‌ কি হীলিয়াম গ্যাসের সাহায্যে। বেলুন ও জেপ্‌লিন্‌কে করে তুল্‌তে হয়, এই গ্যাসের থলের সাহায্যে হাওয়া হতে অনেক হালকা, আর এরোপ্লেনকে করা হয় হাওয়া হতে অনেক বেশি ভারি। পাখী যেমন তার দুখানা ডানাকে সহজে ইচ্ছানুযায়ী সঞ্চালিত ক'রে আকাশপথে উড়ে বেড়ায়, যাঁরা এই এরোপ্লেন উদ্ভাবন করলেন তাঁরা স্থির করলেন এই এরোপ্লেনের ডানাগুলোকে যন্ত্রের সাহায্যে ইচ্ছামত সঞ্চালিত ক'রে, তাঁরাও তেমনি সহজে ও আরামে নীল আকাশে ঘুরে বেড়াবেন।

বর্ত্তমান সময় এরোপ্লেনের এমন উন্নতি হয়েছে যে, তোমরাও একটুখানি শিখে নিলে, মোটরগাড়ীর মত এই এরোপ্লেন সহজে ও সুন্দরভাবে চালাতে পারবে। এরোপ্লেন চালান শেখাবার স্কুলও এখন ভারতবর্ষের বড় বড় কয়েকটি সহরে স্থাপিত হয়েছে। এরোপ্লেন কি করে উদ্ভাবিত হল এখন সে গল্প তোমাদের বলছি।

আকাশে উড়ে বেড়াবার জন্য একটি যন্ত্র প্রস্তুত করবার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রথম সফলতা লাভ করেন "ডেটনের" রাইট (Wright) ভ্রাতৃদ্বয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম এই রাইট ভ্রাতৃদ্বয় একখানি খুব সাধারণ গোছের ওড়বার কল তৈরি করেন। সেই কলটি একজনমাত্র আরোহী নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টাকাল উড়ে বেড়াতে সমর্থ হয়।

এই রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতা ছিলেন একজন খুব বিদ্বান লোক।

তিনি স্কুলের শিক্ষকতা করতেন। আর তাঁদের মাতাও ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা। বাল্যকাল হতে এমন শিক্ষিত পরিবারে লালিত পালিত হয়ে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের বুদ্ধিটিও খুলে যায় একটু বেশি রকম। তাঁরা বাল্যকাল হতেই আকাশে ওড়বার কোন যন্ত্র নির্ম্মাণ করবার জন্য খুবই উৎসুক হয়ে উঠেন। এঁরা কি করে প্রথম এরোপ্লেন নির্ম্মাণ করতে সমর্থ হলেন সে বেশ সুন্দর গল্প।

তাঁরাই প্রথম গ্লাইডার (glider) যন্ত্রের নানারকম উন্নতি বিধান করে তাকে বর্ত্তমান এরোপ্লেনে পরিণত করে তোলেন। কি করে এই গ্লাইডার যন্ত্র তাঁদের হাতে এসে এরোপ্লেনে রূপান্তরিত হয়ে উঠল সে কথা পরে তোমাদের বলব। প্রথম এই গ্লাইডার যন্ত্রগুলি কি রকমের ছিল সে সম্বন্ধে তোমাদের কয়েকটি কথা বলি। এই যন্ত্রগুলি প্রথম তৈরি হয় মানুষের ওড়বার চেষ্টা হতে। এই গ্লাইডারে কোন রকম ইঞ্জিন্ ছিল না।

গ্লাইডার যন্ত্রগুলির দুপাশে দুখানি, তিনখানি এমন কি চারখানি করেও লম্বা মতন ডানা থাকত ও তার ঠিক মাঝখানে একজন লোক বসবার স্থান থাকত। এই ডানাগুলি তৈরি করা হত ঠিক পাখীর ডানার অনুকরণ করে। এই সব গ্লাইডার যন্ত্রে উঠে কোন উঁচু জায়গা হতে বায়ুপ্রবাহের গতি বুঝে লাফিয়ে পড়লে তাতে করে হাওয়ার মুখে অনেকটা উড়ে যাওয়া সম্ভব হত। অনেক সময় এই গ্লাইডার কলগুলোকে নিয়ে বায়ুপ্রবাহের বিপরীত দিকে কিছুটা খুব জোরে দৌড়ে গেলে তা' বায়ুপ্রবাহে ধৃত হয়ে ত্বরিতে ওপর দিকে উঠে যেত, যেমন ওপরে উঠে যায় ঘুড়ি। বায়ু প্রবাহ ঠিকমত থাকলে এইসব গ্লাইডার কলগুলো বেশ উড়্ত। এই সমস্ত কলকে অনেকটা বশে রাখা হত চালকের নিজের শরীরের গতি ও এই কলের

পুরানো ধরনের গ্লাইডার

--৭২ পৃ

আধুনিক গ্লাইডার

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—৭৩ পৃঃ
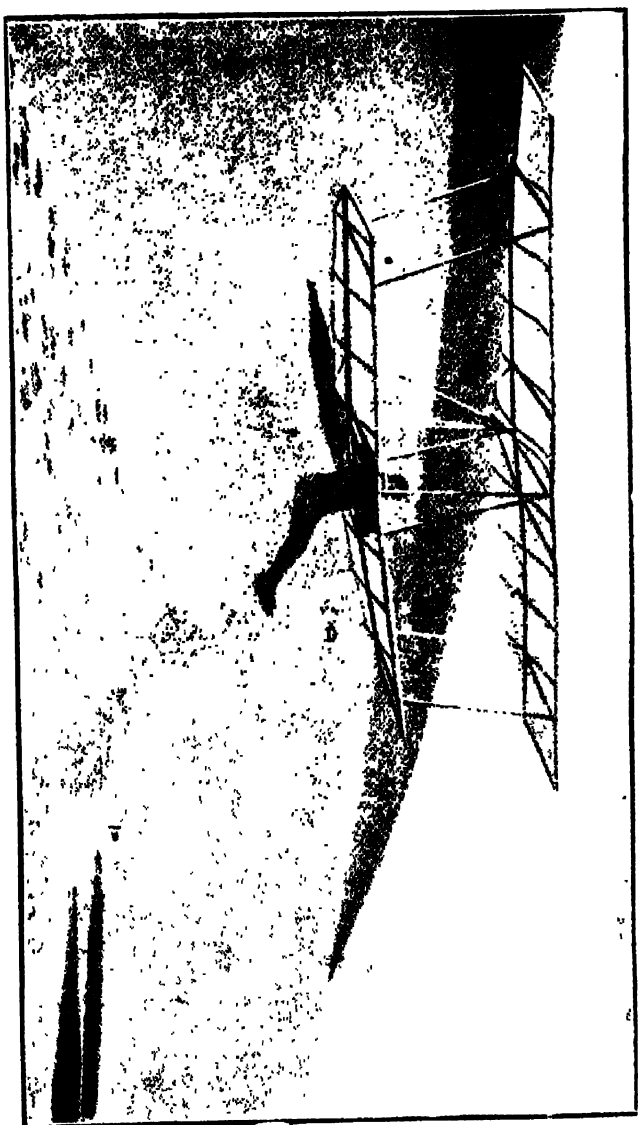
পাখাগুলির চালন-কৌশলের দ্বারা। কিন্তু হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া দিলেই এসব যন্ত্রের ভয়ানক বিপদ হত, তখন তাদের হঠাৎ উল্‌টে যাবার ভয় থাকত খুবই বেশি।

লিলিয়েনথ্যাল (Lilienthal) নামক একজন জার্ম্মান এই গ্লাইডারের অনেক উন্নতি সাধন করেন ও এই যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে ওড়া অনেকটা সহজ করে তোলেন। তিনি বহুবার এই কলে উঠে উড়তে সমর্থ হন, কিন্তু ১৮৯৬ সালে একবার ঝড়ের মুখে পড়ে তাঁর কল হঠাৎ উল্টে যায় ও তিনি পড়ে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। লিলিয়েনথ্যালের পরে ইংলণ্ডে পার্সি পিলচার ও আমেরিকার অক্টেভ সেণ্টে এ কলের আরও কিছু কিছু উন্নতি সাধন করেন।

১৯০৫ সালে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় প্রায় পঁয়তাল্লিশ বার এই গ্লাইডারে চড়ে আকাশপথে উড়তে সমর্থ হন। একবার তাঁরা প্রায় আধঘণ্টাকাল এই গ্লাইডারে করে আকাশে উড়ে বেড়ান। কিন্তু গ্লাইডারের নানারকম উন্নতি সাধন করতে গিয়ে' এই যন্ত্রে যে কোন রকম ইঞ্জিন্ জুড়ে দিয়ে তাকে ওড়ান যায় ও তার গতি নিয়মন করা সম্ভব হয় এই চিন্তা তাঁদের মনে প্রথম আসেনি।

আমেরিকার জ্যোতির্ব্বিদ্ ডাক্তার ল্যাঙ্গ্‌লে এই রকম একটি গ্লাইডারের সঙ্গে একটি ছোট ষ্টিমচালিত ইঞ্জিন জুড়ে দিয়ে তা ওড়াতে প্রথম চেষ্টা করেন। তাঁর নেহাৎ দুর্ভাগ্য যে, তিনি তাঁর জীবিতকালে সে কার্য্যে কিছুতেই কৃতকার্য্য হতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে যা চালাতে পারেননি' তাঁর সেই ইঞ্জিন সংযুক্ত গ্লাইডার যন্ত্রকেই আকাশপথে বেশ চালান যায়।

ইহার পরে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় এই ইঞ্জিনের সমধিক উৎকর্ষ সাধনে

যত্নপর হলেন। তাঁরা দু'ভাই করতেন সাইকেল-মেরামতের কাজ ও সেই কাজের অবসরকালে তাঁরা এই গ্লাইডার যন্ত্রে ইঞ্জিন জুড়ে দিয়ে নানাভাবে তার পরীক্ষা করতে লাগ্‌লেন। প্রথম প্রথম তাঁরা ইঞ্জিন-সংযুক্ত ছোট ছোট গ্লাইডার যন্ত্রের মডেল তৈরি ক'রে সেই মডেল-গুলোকে ওড়াতে সমর্থ হলেন। পরে তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন গ্লাইডার যন্ত্রগুলোকে এমন কি উপায়ে নির্ম্মাণ করা যায় যাতে কোন ঝড়ের মুখে পড়লেও তা উলটে না গিয়ে আপনা হতে বিপদ কাটিয়ে চলতে পারে। তাঁরা স্থির করিলেন যে প্রত্যেক গ্লাইডার যন্ত্রের দুপাশে খুব লম্বা ধরণের এমন দুখানি পাখা (wings) নির্ম্মাণ করে দেবেন যেন হাওয়াতে সে পাখা দুখানি বেশ সহজে ওঠানামা করতে পারে। তাঁদের বিশেষ চেষ্টার ফলে তাঁরা প্রথম যে যন্ত্রটি তৈরি করলেন তা' দেখতে হ'ল অনেকটা বর্ত্তমানের এরোপ্লেনের মত।

তাঁরা প্রথম এই নূতন ধরণের যন্ত্রটি নির্ম্মাণ করে তার সঙ্গে দড়ি বেঁধে দিয়ে, ঘুড়ির মতন, তাকে আকাশে উড়িয়ে দিলেন। প্রথম চেষ্টাতেই দেখতে দেখতে এই নূতন যন্ত্রটি ওপরে উঠে গেল। তাঁরা দড়িখানি শক্ত করে নীচে বেঁধে রাখলেন। পরে সেই উড্ডান যন্ত্রটির কর্ণধার এবার তা'র 'ব্যালেন্স' (balance) পরীক্ষা করতে লাগলেন। ব্যালেন্স পরীক্ষা করা হয়ে গেলে, আবার এই উড়ো কলটিকে নীচে নামিয়ে আনা হ'ল।

রাইট ভ্রাতৃদ্বয় এই নবোদ্ভাবিত উড়ো কলের নীচে এবার দুটি চাকা সংযুক্ত করে দিলেন। তাঁদের উড়ো কল ওপর থেকে নামবার সময় মাটিতে পড়ে হঠাৎ না থেমে গিয়ে এই চাকার ওপর দিয়ে কিছুদূর গড়িয়ে গিয়ে যেন আস্তে আস্তে থামতে পারে, এই চাকা সংলগ্ন করে দিয়ে তাঁরা তারই উপায় করে দিলেন। হঠাৎ থামতে গেলে ধাক্কা লেগে

কলটিও নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে ও কলের আরোহীদেরও বিপদ হতে পারে, এই কারণেই এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হ'ল। এখন রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের এই নূতন এরাপ্লেনকে যেখানে বায়ুপ্রবাহ খুব প্রবল এমন কোন জায়গায় নিয়ে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তাঁরা খুঁজতে আরম্ভ করলেন ঘণ্টায় কুড়ি মাইল বায়ুর গতি-বেগ পাওয়া যায় এমন কোন জায়গা। অবশেষে তাঁরা সমুদ্রতীরবর্ত্তী উত্তর ক্যারেলোনিয়ার "কিটিহক্" নামক তটভূমি তাদের পরীক্ষা কার্য্যের জন্য খুব উপযোগী হবে স্থির করে সেখানেই প্রায় দুই বৎসর তাদের এই নূতন উড়ো কলের নানারকম পরীক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। এখানে তাঁদের এই উড়ো কলের পাখাগুলোকে তাঁরা যথাসম্ভব দোষহীন করে তুললেন, এবং এই কল চালাবর উপযোগী খুব সুন্দর, হালকা ও কার্য্যকরী একটি ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

শীঘ্রই রাইট ভ্রাতৃদ্বয় মোটরগাড়ীর ইঞ্জিনের মত খুব হালকা একটি ইঞ্জিন্ তৈরি কর্‌লেন। তাঁরা চার সিলিণ্ডারের কুড়ি অশ্বশক্তির এমন এক ইঞ্জিন নির্ম্মাণ কর্‌লেন যার ওজন হ'ল মাত্র সাড়ে বারো সের। এই ইঞ্জিনের সাহায্যে তাঁরা যখন প্রথমবার তাঁদের নূতন এরোপ্লেনটি চালালেন তখন তা তাদের নিয়ে ওপরে মাত্র মিনিট খানেক রইল এবং সেই এক মিনিটের মধ্যেই তাঁরা সোজাসুজি অনেকটা পথ খুব দ্রুত-গতিতে যেতে সমর্থ হলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন যে এবার তাঁদের এই এরোপ্লেনটিকে বেশ নিজেদের বশে রেখে নির্ব্বিঘ্নে ইচ্ছানুযায়ী সোজাসুজি চালান ও থামান যায়। সোজাসুজি চালাতে পারলেন বেশ, কিন্তু যখন তাকে দমকা হাওয়ার মুখে ফেরাতে গেলেন তখন তা উল্টে গিয়ে নীচে পড়ে গেল। তখন তাঁরা নানাদিক দিয়ে তাঁদের

এই নূতন এরোপ্লেনটির আরও অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করে তাকে আরও সুন্দর করে তুললেন। ডেটনের নিকটবর্ত্তী এক জলাভূমির ওপরে বহুদিন ধরে তাঁরা তাঁদের এই উড়ো কলকে নানা দিকে ঘোরান ফেরান ও নানাভাবে চালানো অভ্যাস করতে লাগলেন। তাঁরা এত গোপনে এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন যে বাইরের কেউ এসব বিষয়ের কোন খবরই পেল না। তাঁরা পরে এই উড়ো কলটির জন্য একটি পরিচালকের (Propellor) উদ্ভাবন করলেন, ও দেখলেন যে পরিচালকটির সাহায্যে তাঁদের উড়ো কলটি খুব চমৎকার চলে। নিরলস চেষ্টা ও সাধনার ফলে তাঁরা অচিরে তাঁদের এই এরোপ্লেনকে এমন সুন্দর ও নির্দ্দোষ করে তুললেন যে, প্রবল ঝড়ের মুখেও ইচ্ছামত সহজে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার গতি পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হল।

১৯০৪ সালে তাঁরা তাঁদের এই এরোপ্লেনে দুবার আরোহণ করেন এবং প্রত্যেকবারই বৃত্তাকারে তিনমাইল করে ঘুরে আসেন।

১৯০৮ সালে তাঁরা আমেরিকার এরোক্লাবকে জানালেন যে তাঁরা যে এরোপ্লেন নির্ম্মাণ করেছেন তাতে করে তাঁরা ঘণ্টায় ৩৮ মাইল বেগে ২৪ মাইল উড়ে বেড়াতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁরা এ বিষয়ে অতটা সাফল্য লাভ করতে পেরেছেন শুনে সকলে অবাক্ হয়ে গেল। অনেকে তাঁদের কথা বিশ্বাসই করল না।

এবার রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের এই এরোপ্লেনের স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য তার প্রত্যেক অংশ পৃথক্ পৃথক্ করে খুলে নিয়ে রেখে দিলেন, ও তাঁদের এই "পেটেণ্টের" জন্য যুক্তরাজ্যের সরকার কত মূল্য দিতে স্বীকৃত আছেন তা জানতে চাইলেন।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের গভর্ণমেণ্ট তাঁদের উদ্ভাবিত এরোপ্লেনের কার্য্য প্রদর্শন করবার জন্য তাদের নিমন্ত্রণ

করেন। তাঁরা তাঁদের এই পেটেণ্ট ২৫ হাজার ডলারে (আমাদের দেশের প্রায় বিরানব্বই হাজার টাকা) বিক্রী করতে রাজি হয়ে সকলের সম্মুখে তা প্রথম প্রদর্শন করেন।

১৯০৮ সালে যখন প্রথম তাঁদের এই এরোপ্লেন সর্ব্ব সমক্ষে প্রদর্শিত হ'ল তখন উইলবার রাইট্ (Wilber Wright) সেই এরোপ্লেনে ৮ মাইল উড়ে এসে নির্ব্বিঘ্নে অবতরণ করেন। ১৯০৯ সালে তাঁদের এরোপ্লেনের শক্তি দ্বিতীয়বার পরীক্ষিত হয়। এবার অরভিল রাইট (Orville Wright) এরোপ্লেনে বসে নিয়মন চক্রে (Steering wheel) হাত দিলেন ও উইলবার রাইট পরিচালকটি ঘুরিয়ে মোটরটি চালিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে এরোপ্লেনটি বহু উর্দ্ধে উঠে গেল এবং বৃত্তাকারে চারদিকে ঘুরতে লাগল। নীচেকার সুবৃহৎ জনতা বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে আকাশ পানে তাকিয়ে রইল। যখন প্রায় এক ঘণ্টার ওপর এরোপ্লেনটি এমনি সহজভাবে আকাশপথে উড়ে বেড়িয়ে নির্ব্বিঘ্নে নীচে নেমে এল তখন সেই বিপুল জনসঙ্ঘের প্রশংসা ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল।

ইহার পরে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় ইউরোপ ভ্রমণে বেরুলেন। তাঁরা ইউরোপের নানা জায়গায় বিশেষভাবে সম্মানিত হলেন। জার্ম্মানীতে তাঁদের খুবই সম্বর্দ্ধনা করা হয়। জার্ম্মানীতেই কাউণ্ট জেপ্লিন প্রথম জেপ্লিন জাহাজ উদ্ভাবন করেন একথা তোমাদের আগেই বলেছি।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় এই এরোপ্লেনের আরও সমধিক উন্নতি সাধিত হয়। বিমানবিহারী যোদ্ধারা সন্ধানীর কার্য্য (Scouting) খুব ভাল ভাবেই করতে সমর্থ হয়েছিল। সন্ধানীরা এই এরোপ্লেনের সাহায্যে শত্রুপক্ষের সৈন্যশ্রেণীর বিন্যাস-কৌশল ও তার চারদিককার জায়গার ফটো এরোপ্লেন হতে তুলে নিতেন ও শত্রুপক্ষের নানা

জায়গায় বোমা নিক্ষেপ করবার জন্য ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতেন। যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য যে সব এরোপ্লেন তৈরি হয়েছিল তা খুব শক্তিমান ইঞ্জিনের দ্বারা চালিত হ'ত।

যুদ্ধের সময় যখন আমেরিকা মিত্রপক্ষের সঙ্গে যোগ দেয় তখন মিত্ররাজ্যের সকলেই আমেরিকাকে বহু সংখ্যক এরোপ্লেন নির্ম্মাণ করবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করে। আমেরিকাও তখন এরোপ্লেন নির্ম্মাণ কার্য্যে একান্তচিত্তে নিযুক্ত হয়। ইঞ্জিন বস্তুটাই এরোপ্লেনের প্রাণস্বরূপ। এজন্য আরও উৎকৃষ্টতর ও অধিকতর কার্য্যকরী ইঞ্জিন তৈরি করতে না পারলে শুধু সাধারণ রকমের ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করে বিশেষ কিছু ফল হবে না বুঝতে পেরে, যাতে বড় রকমের এরোপ্লেনের জন্য খুব সুন্দর ও শক্তিমান ইঞ্জিন তৈরি করতে পারেন, আমেরিকার বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ সেই চেষ্টায় নিমগ্ন হলেন।

অশ্রান্ত চেষ্টার ফলে বড় এরোপ্লেনের জন্য আমেরিকায় এক নূতন ইঞ্জিন উদ্ভাবিত হল। এই ইঞ্জিনের নাম হল "স্বাধীনতা ইঞ্জিন" (Liberty Engine)। এই ইঞ্জিনের সাহায্যে মিত্রপক্ষ স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে এই আশা করে নবোদ্ভাবিত ইঞ্জিনের এইরূপ নামকরণ হল। স্বাধীনতা ইঞ্জিনে পূর্ব্বের পেট্রোল ইঞ্জিনের সব গুণ ত বর্ত্তমান রইলই, তার ওপর আরও নানাদিক দিয়ে তা আগেকার ইঞ্জিন হতে বহু গুণে উৎকৃষ্টতর হ'ল। এই ইঞ্জিনের ওজন হ'ল মাত্র দশ মণ বারো সের এবং ইহা প্রবল হ'ল প্রায় চারশ কুড়ি অশ্বশক্তিতে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালী প্রভৃতি দেশে এই স্বাধীনতা ইঞ্জিন অসংখ্য বিক্রয় হয়ে গেল। একথা বললে সত্যের কিছু অপলাপ করা হয় না যে, মিত্রপক্ষের যুদ্ধজয়ের একটি সর্ব্বপ্রধান সহায় হয়েছিল এই নূতন স্বাধীনতা ইঞ্জিন!

যুদ্ধের সময় দু'পক্ষের এরোপ্লেনের মধ্যে যখন লড়াই বাঁধত তখন

এরোপ্লেন

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার——২ পৃষ্ঠা
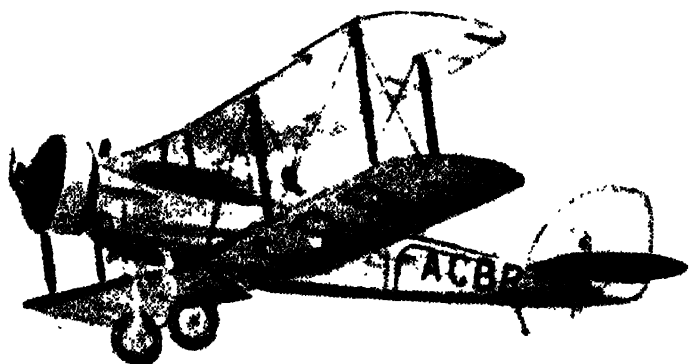
কল্পনা করতে পার, কি কাণ্ডটাই হত! যে পক্ষের এরোপ্লেনের গতিবেগ বেশি হত ও দ্রুত গতিতে বহু উর্দ্ধে উঠে যেতে পারত তাদেরই হত খুব সুবিধা। এ বিষয়ে এই স্বাধীনতা ইঞ্জিনটি মিত্রপক্ষের একটি অতুল সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। দুই পক্ষের যুদ্ধে যে সব এরোপ্লেন আহত হয়ে বহু উর্দ্ধ হতে তীরবেগে নীচে মাটির ওপর এসে পড়ত, তা আরোহীদের নিয়ে একেবারে চূর্ণিত হয়ে যেত। কোনটা বা লড়াইয়ের সময় হঠাৎ জ্বলে উঠে আগুনে পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যেত। কি ভয়ানক ও বীভৎস সেই দৃশ্য!

বিগত মহাযুদ্ধের পরে এরোপ্লেনকে প্রয়োজনীয় অনেক ভাল কাজে নিয়োজিত করা হ'ল। কি করে আরও অল্প ব্যয়ে তা প্রস্তুত করা যায় তারও চেষ্টা হতে লাগল। তখন ডাকের চিঠিপত্র প্রভৃতি এরোপ্লেনের সাহায্যে দেশ বিদেশে যেতে লাগল।

শীঘ্রই এরোপ্লেনের সাহায্যে বহুদূরের জায়গায়ও খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠল। ১৯১৯ সালে ইংলণ্ড হ'তে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড হতে ইংলণ্ড এই এরোপ্লেন প্রথম যাতায়াত করে।

সাধারণ এরোপ্লেনগুলি দেখতে কি রকম সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

পূর্ব্বেই বলেছি এরোপ্লেন দেখতে অনেকটা পাখীর মত। তার দুপাশে দুখানি করে খুব লম্বা মতন ডানা থাকে। এরোপ্লেনের পেছনের দিকটা পাখীর লেজের মত বেশ সরু। তার সাম্নের দিককার সরু মুখের সম্মুখে একটি পরিচালক (Propellor) লাগান থাকে। আর এরোপ্লেনের ঠিক সম্মুখের দিকে মোটর-ইঞ্জিনটি বসান হয়। এই ইঞ্জিনের কাছেই চালকের বসবার জায়গা ও ঠিক চালকের পেছনে আরোহীদের বসবার জায়গা। মোটর

গাড়ীকে নানাদিকে ঘোরবার জন্য যেমন একটি নিয়ামক-চক্র থাকে, এই এরোপ্লেনকে চালাবার ও প্রয়োজনমত তার গতি পরিবর্ত্তন করবার জন্যও ঠিক সেই রকমের একটি নিয়ামক-চক্র থাকে। এই চক্রের প্রতি আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরোপ্লেনের অবস্থানের ও গতির পরিবর্ত্তন করা যায়। আর আগেই বলেছি যে এরোপ্লেনের পাখার প্রত্যেক অংশ কতকগুলো নিয়ামক তন্ত্রীর দ্বারা এমনভাবে পরস্পর সংযুক্ত থাকে যে, তার কোন অংশের অবস্থানের পরিবর্ত্তন সাধন করলেই, তার অন্যান্য অংশগুলির অবস্থানও স্বতঃই পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। এরোপ্লেনের সামনের দিকে দুটি ক্ষুদ্র বায়ুপূর্ণ রবারটায়ার সংযুক্ত চাকা থাকে। চাকা দুটি ঠিক মোটরগাড়ীর বায়ুপূর্ণ চাকার মত। এই চাকা দুটির ওপর যখন এরোপ্লেনটি দাঁড়ায় তখন মনে হয় যেন এক অপরূপ পাখী দুটি পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। এরোপ্লেনের ইঞ্জিনটির প্রধান কাজ হল এরোপ্লেনের পাখাগুলোকে খুব জোরে ঠেলে বায়ুর ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া। ইঞ্জিনটি কাজ করতে সুরু করলেই এরোপ্লেনটি সামনের দুটি চাকার ওপর দিয়ে কিছুদূর দ্রুত অগ্রসর হয়ে হু হু শব্দে উর্দ্ধে উঠে যায়। আবার নামবার সময় তা' বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে নীচে নেমে আসে। আর মাটির ওপর এসেই তা' হঠাৎ থেমে যায় না, চাকার ওপর দিয়ে অনেকটা গড়িয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে থেমে যায়। যে জায়গায় এরোপ্লেনকে রাখা হয় তাকে বলা হয় "হ্যাঙ্গার" (Hangar)।

আমেরিকার রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ই প্রথম এরোপ্লেন উদ্ভাবন করেন। তাদের নাম জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকবে। এই এরোপ্লেনের উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জগতে তাঁদের যশোশিখাও দিন দিন উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশ পাবে।

বাষ্পীয় জাহাজের কথা

আগেকার দিনের সব বড় বড় জাহাজ চলত পালের সাহায্যে। এখন যেমন নদীবক্ষে অনেক নৌকো পাল তুলে দিয়ে চলতে দেখতে পাও, পূর্ব্বে ঠিক তেমনি বড় বড় জাহাজের সমুচ্চ মাস্তুলে পাল খাটিয়ে দিয়ে তাদের চালান হত। যখন বাতাস অনুকূল থাকত ও বেশ জোরে বইত তখন জাহাজও চলত খুব দ্রুত, আর যখন হাওয়ায় জোর কম থাকত তখন জাহাজকে চলতে হ'ত খুব ধীর ও মন্থর গতিতে। আবার বায়ুপ্রবাহ মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে গেলে জাহাজকেও একেবারে গতিহীন হয়ে পড়তে হ'ত তখন আর তার পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠত না। এইরূপ গতিহীন অবস্থায় জাহাজকে মাঝে মাঝে ২।৩ দিন, এমন কি তারও বেশী, এক এক জায়গায় অচল ও আবদ্ধ হয়ে থাকতে হত। আর যখন প্রতিকূল বায়ু বইত তখনও জাহাজের পক্ষে অগ্রসর হওয়া বড়ই কঠিন হয়ে পড়ত ও সেই অবস্থায়ও অনেক সময় জাহাজকে আটকে থাকতে হ'ত। তখনকার দিনে এইরূপ কত অসুবিধাই যে ছিল, এই সব জাহাজ চলাফেরা করবার পথে, তা তোমরা কল্পনা করতে পার।

এই গেল বাষ্পীয় জাহাজ উদ্ভাবিত হবার আগেকার কথা। বাষ্পচালিত জাহাজের উদ্ভাবনের পর এই সব অসুবিধা আর কিছুই রইল না। বায়ুপ্রবাহ থাকুক আর নাই থাকুক, তা অনুকূলই হ'ক কিম্বা প্রতিকূলই হ'ক, তাতে এই বাষ্পচালিত জাহাজের কিছু যায় আসে না। সব রকম অবস্থায় তারা বেশ দিব্যি আরামে ও সহজে নদী

কি সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গের উপর দিয়ে নাচতে নাচতে চলতে থাকে ও বাষ্পীয় কলের সাহায্যে সমস্ত বাধাপুঞ্জ হেলায় অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছায়।

ষ্টীমইঞ্জিন উদ্ভাবিত হওয়ার বহুদিন পরে জাহাজ ও বোট প্রভৃতি সেই ইঞ্জিনের সাহায্যে চালাবার বুদ্ধি মানুষের মাথায় প্রথম উদিত হয়।

প্রথম প্রথম নানারকমের ষ্টীমবোট নির্ম্মিত হ'ল, কিন্তু কোনটাই তেমন কার্য্যকরী হ'ল না। সর্ব্বপ্রথম এই বিষয়ে বিশেষ কৃতকার্য্য হলেন রবার্ট ফাল্টন। তিনিই প্রথম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটি ষ্টীমবোট নির্ম্মাণ করতে সফলকাম হ'ন।

রবার্ট ফাল্টন ১৭৬৫ সালে আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। রবার্টের বয়স যখন মাত্র তিন বৎসর তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। এই কারণে বাল্যকালে তাঁর লেখাপড়া বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারে নি। তাঁর বয়স যখন ১০ বৎসর তখন তাঁর শিক্ষককে তিনি একদিন বললেন—"মাষ্টারমশায়, আমার মাথাটা এমন সব বিস্ময়কর কল্পনায় পূর্ণ যে, তাতে এসব ধূলিমলিন পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানসঞ্চয় করে রাখবার আর জায়গা নেই।"

ফাল্টনের বয়স যখন ১৩ বৎসর, তখন তিনি ৪ঠা জুলাই, আমেরিকার জাতীয় উৎসবের দিনে, আমোদ করবার জন্য বড়ই উদগ্রীব হয়ে উঠেন ও তাঁদের বাড়ী দীপমালায় সজ্জিত করবার জন্য, নিজের হাতে অনেক মোমবাতি তৈরি করেন। কিন্তু গ্রামের কর্ত্তারা বাড়ীঘরে আগুন লাগতে পারে এই ভয়ে, সে দিন বাড়ীতে বেশী বাতি না জ্বালাবার জন্য গ্রামের সকলকে অনুরোধ করায়, ফাল্টন বাজারে গিয়ে তাঁর তৈরি সমস্ত মোমবাতি বিক্রী করে দিয়ে, সেই পয়সায় কিছু বারুদ ও "পেষ্টবোর্ড" কিনে নিয়ে

আসেন হাউই বাজি তৈরি করবার জন্য। বারুদ নিয়ে কি করবে জানবার জন্য কুতূহলী দোকানদার ফাল্টনকে জিজ্ঞাসা করল—"আচ্ছা এই বারুদ নিয়ে তুমি কি করবে?" ফাল্টন যখন উত্তর দিলেন যে তিনি তা দিয়ে হাউই বাজি তৈরি করবেন, তখন ত দোকানদারের একেবারে চক্ষু স্থির! সে ইতিপূর্ব্বে কখনও হাউই বাজি দেখেনি, তাই সে ফাল্টনের উত্তর শুনে বলে উঠল "থাম, থাম, সে অসম্ভব।" ফাল্টন দৃঢ়স্বরে বললেন "না মশায়, সংসারে অসম্ভব কিছুই নেই।"

ফাল্টন যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন তখন তিনি ঝুঁকে পড়লেন খুব বেশী চিত্রবিদ্যার দিকে। তিনি এই সময়ে বেঞ্জামিন ওয়েষ্ট নামক একজন চিত্রশিল্পীর খুব কাছেই থাকতেন, এবং প্রায়ই ওয়েষ্টের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করবার জন্য যেতেন। শীঘ্রই তিনি চিত্রবিদ্যায় খুব একজন দক্ষ শিল্পী হয়ে উঠেন, এবং চিত্রাঙ্কনের দ্বারা কিছুকাল জীবিকা অর্জ্জন করেন।

ফাল্টন এমন খেয়ালী ছিলেন যে, ইহার অনতিকাল পরেই তিনি চিত্রাঙ্কন ত্যাগ করে যন্ত্র নির্ম্মাণ কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি ষ্টীমইঞ্জিন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য কিছুকাল পরে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে ষ্টীমইঞ্জিন সম্বন্ধে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তিনি ফ্রান্সে যান, ও সেখানে সাবম্যারিণ নির্ম্মাণ করবার চেষ্টায় থাকেন। ১৮০০ সালে ফাল্টন তাঁর প্রথম সাবম্যারিণ বোট "নটিলাস" নির্ম্মাণ করেন। ফাল্টনের এই সাবম্যারিণ নির্ম্মাণের কথা সাবম্যারিণের কাহিনীতে সব জানতে পারবে। এই প্রবন্ধে আমি তাঁর ষ্টীম বোট নির্ম্মাণের কথাই বলব।

কয়েক বৎসর থেকে ষ্টীমবোট নির্ম্মাণ করবার সঙ্কল্প ফাল্টন অন্তরে পোষণ করে আসছিলেন। ১৭৬৩ সালে ফাল্টনের প্রতিবেশী

উইলিয়াম হেনরী প্রথম একটি ষ্টীমবোট নির্ম্মাণ করেন। ফাল্টন তখন বালক মাত্র ছিলেন। হেনরী ষ্টীমবোট তৈরি করে তা নদীর উপর চালাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই বোটখানি কিছুক্ষণ চলবার পরই জলমগ্ন হয়। ফাল্টন যখন ইউরোপে উপস্থিত হন, তখন হেনরীর মৃত্যু হয়।

হেনরীর মৃত্যুর পরে জন ফিচ নামক তাঁর একজন কারিগর বন্ধু ১৭৮৬ সালে একটি ছোট ষ্টীমবোট তৈরি করে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ডালাওয়্যার নদীর উপর চালান। এই বোটের দাঁড়গুলিকে একটি বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে চালান হয়।

১৮০৪ সালে জন্ রামসে (John Rumsey) নামক এক যন্ত্রশিল্পী ডালওয়্যার নদীর উপর ফিচের তৈরি ষ্টীমবোটখানি দেখে এমন মুগ্ধ হ'ন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে ফিচের তৈরি বোটের চাইতে উৎকৃষ্টতর একখানি বোট তিনি নির্ম্মাণ করবেনই। তিনি অনেক চেষ্টার পর এক খানি ষ্টীমবোট তৈরি করেন এবং বছরখানেক পরে তার চাইতেও নানাদিক দিয়ে উৎকৃষ্টতর আর একখানি ষ্টীমবোট নির্ম্মাণ করেন। তাঁর এই নূতন ষ্টীমবোটখানি ঘণ্টায় ৮ মাইল বেগে চলতে সমর্থ হ'ল। কিন্তু এসব ষ্টীমবোট নেহাৎ ছোট ছিল বলে ও সব বিষয়ে নিখুঁত না হওয়ায় যাত্রী নিয়ে চলাফেরা করতে সাহসী হ'ল না।

এই সকল ষ্টীমবোট যখন আমেরিকায় তৈরি হচ্ছিল তখন ফাল্টন ছিলেন ফ্রান্সে। তিনি এই সমস্ত নূতন উদ্ভাবিত ষ্টীমবোটের কথা কিছুই জানতে পারলেন না। ১৮০৩ সালে ফাল্টনও একখানি ছোট বোট তৈরি করেন, এবং যখন তা সিন নদীর ওপর ভাসিয়ে দিয়ে তার উপর ষ্টীম ইঞ্জিনের যন্ত্রাদি এনে চাপালেন, তখন হায়! তাঁর ক্ষুদ্র বোটখানি

সেই যন্ত্রাদির ভারে দু'আধখানা হয়ে গেল। ফাল্টনের আর আপশোসের সীমা রইল না। তিনি অতিকষ্টে নদীগর্ভ হতে যন্ত্রাদি তুলে নিলেন। পরে তিনি খুব শক্ত করে আর একখানি বোট নির্ম্মাণ করে, তাতে ষ্টীমইঞ্জিন সংযুক্ত করে দিয়ে ঘণ্টায় চার মাইল বেগে চালাতে সমর্থ হলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্যারিসের লোকেরা তাঁর এই বোটখানি দেখবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ দেখালে না, তিনিও তাই বোটখানি চালান বন্ধ করে দিলেন।

ইহার পরে ফাল্টন ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে দেখলেন সিমিংটন (Symington) নামক একজন ইংলণ্ডের ইঞ্জিনিয়ার, তাঁর নির্ম্মিত ষ্টীমবোট অপেক্ষা একটি উৎকৃষ্টতর ষ্টীমবোট নির্ম্মাণ করেছেন। তিনি এই বোটে চড়ে একবার ঘুরে এলেন ও তার প্রত্যেক অংশ ও নির্ম্মাণ-কৌশল খুব মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করে, তার সমস্ত বিশেষত্বগুলি নোট-বইতে টুকে নিলেন।

এবার ফাল্টন বোটে বসাবার উপযোগী একটি খুব সুন্দর ষ্টীমইঞ্জিন ক্রয় করে তা আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলেন, ও ১৮০৬ সালে তিনি স্বদেশযাত্রা করলেন। নিউইয়র্কে পৌছবার পরে তাঁর এক বন্ধু লিভিংষ্টোনের (Livingstone) সহযোগে তাঁর অঙ্কিত নক্সা'মত বেশ একখানা বড় ধরণের ষ্টীমবোট তৈরি করবার জন্য এক শিল্পী নিযুক্ত করেন। কিন্তু সেই বোট নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হবার পূর্ব্বেই তাঁদের হাতের টাকাকড়ি সব নিঃশেষিত হয়ে গেল ও তাঁরা খুবই বিপদে পড়লেন। তাঁদের এই ষ্টীমবোট নির্ম্মাণরূপ বাজে, বুদ্ধিহীন কাজের জন্য টাকা খোয়াতে প্রস্তুত আছেন এমন লোক পেতে তাঁদের বিলক্ষণ কষ্ট পেতে হ'ল। যা হোক পরে এই বোট নির্ম্মাণের জন্য কয়েকজন লোক তাঁদের টাকা দিতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু পাছে বন্ধুবান্ধবরা

শুনলে তাঁদের বোকা ভাবে এই ভয়ে তাঁদের নাম যেন কিছুতে প্রকাশ করা না হয় এবিষয়ে ফাল্‌টনকে বার বার সতর্ক করে দিলেন।

ফাল্‌টনের বোট যখন তৈরি হতে লাগল তখন লোকে তার নাম দিল "ফাল্‌টনের বোকামি" (Fulton's Folly)। কেউ বিশ্বাস করতে পারল না যে এই বোটখানি কখনও জলের ওপর দিয়ে যাত্রী নিয়ে চলতে পারবে। যারা বোট দেখতে এসে নানা রকমের ঠাট্টা তামাসা করত ফাল্‌টন অনেকসময় প্রচ্ছন্নভাবে তাদের মধ্যে গিয়ে ঘোরাফেরা করতেন। তিনি শুনতেন দর্শকেরা সকলেই তাঁর নির্ব্বুদ্ধিতা নিয়ে নানারকম সমালোচনা করছে। বৃথা টাকার অপব্যয় হচ্ছে ভেবে অনেকে ফাল্‌টনকে যা তা বলতে লাগল। একটি আশার বাণীও ফাল্‌টন কারও মুখ হতে বের হতে কখনও শুনলেন না।

ফাল্‌টন এইরূপ নানা প্রতিকূল সমালোচনাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি একান্ত যত্ন ও নিষ্ঠার সহিত বোটের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত করলেন। বোট যখন তৈরি হ'ল, তার নাম দেওয়া হ'ল "ক্লেরমণ্ট" (Clermont)। এবার ক্লেরমণ্টকে জলে ভাসান হ'ল ও তাকে সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুসম্ভারে সজ্জিত করা হ'ল। স্থির হ'ল এই নবনির্ম্মিত বোট ১৮০৭ সালের ১১ই আগষ্ট নিউইয়র্ক হতে যাত্রী ও পণ্যদ্রব্যাদি নিয়ে যাত্রা করবে।

১৮০৭ সালের ১১ই আগষ্ট এই অদ্ভুত বোটের জলযাত্রা দেখবার জন্য দলে দলে লোক চারদিক থেকে জড় হতে লাগল। সকলেরই মুখে এই এক কথা যে এই বোট চলতে গিয়ে নিশ্চয়ই ডুবে যাবে ও তা' দেখে তারাও হেসে হেসে বাড়ী ফিরবে। বোট-যাত্রার সময় উপস্থিত হ'ল। বোটের দুইপাশের বড় চাকাদুটী চারদিকে জলকণা বিক্ষিপ্ত করতে করতে ঘুরে উঠল, ও "ক্লেরমণ্ট"ও তার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে দুলে

উঠল। দেখতে না দেখতে বোটখানি নির্ব্বিঘ্নে বহুদূরে চলে গেল। যখন সেই সুবৃহৎ জনতা দেখতে পেল যে এই অপূর্ব্ব বোটখানি নিরুপদ্রবে ও নির্ব্বিবাদে জলের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে তখন তাদের আনন্দ ও প্রশংসাধ্বনিতে দিগন্ত কম্পিত হয়ে উঠল।

এই বোটে করে যেতে অনেকে প্রথম সাহস করল না। মাত্র ১২ জন যাত্রী নিয়ে ক্লেরমণ্ট প্রথম যাত্রা করে। হাডসন্ নদীর দুপারে সেদিন জনতা আর যেন ধরে না। যে সব সহরের পাশ দিয়ে এই ক্লেরমমণ্ট চলতে লাগল সে সমস্ত সহরের নদীতীর জনাকীর্ণ হয়ে গেল। হাডসন্ নদীর দু'পারের আনন্দধ্বনিতে চারদিক প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

সেদিন হাডসন্ নদীর উপরেও তামাসাটা বড় কম হ'ল না। যে সব নৌকো নদীর উপরে ছিল সে সব, এই ধূম্রউদ্গারী অদ্ভুত জানোয়ারটিকে বিনাপালে স্রোতের প্রতিকূলে জলরাশি মন্থন করতে করতে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে দেখে ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল। মাঝিরা যে যার নৌকো নিয়ে চারদিকে পালাতে আরম্ভ করল। আর যে সব নৌকো পালাতে পারল না তাদের যাত্রীরা অতিমাত্র ভয়ে নৌকোর ভিতর যে কি কাণ্ডটা সুরু করল সে এক হাস্যকর ব্যাপার।

ক্লেরমণ্টের প্রথম জলযাত্রা সমস্ত দেশময় একটি উত্তেজনার সাড়া সৃজন করে তুলল। ক্লেরমণ্ট নিউইয়র্ক হতে আলবেনী পর্য্যন্ত এই ১৫০ মাইল ৩২ ঘণ্টায় যেতে সমর্থ হ'ল এবং ফিরবার সময় ৩০ ঘণ্টায় ফিরে এল। ইহার পর হতে ক্লেরমণ্ট নিয়মিতরূপে যাত্রী ও পণ্যদ্রব্যাদি নিয়ে যাতায়াত করতে লাগল ও ষ্টীমবোটের কার্য্যকারিতা ও সফলতা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে জনসাধারণের নিকট প্রমাণ করল। ব্যবসার দিক থেকেও ষ্টীমবোট চালান লাভজনক বলে গণ্য হ'ল। ফাল্টনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হ'ল।

অনেকদিন পর্য্যন্ত ফাল্‌টনের নির্ম্মিত ষ্টীমবোট ছাড়া অন্য কোনরকম ষ্টীমবোটের, হাডসন্ নদী দিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ১৮১৫ সালে ফাল্‌টনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ১৭ খানি ষ্টীমবোট নির্ম্মাণ করেন। তিনিই প্রথম বাষ্পীয় রণপোত, টরপিডো বোট এবং বাষ্পচালিত খেয়া বোট নির্ম্মাণ করেন।

ফাল্‌টন যে সব বাষ্পীয় পোত নির্ম্মাণ করেছিলেন তা বিশেষভাবে নদীবক্ষে চলবার মতন করেই তৈরি হয়। সে সব বোটের পক্ষে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে চলা নিরাপদ ছিল না। ফাল্‌টনের তৈরি ষ্টীমবোটের দুপাশে দুটি খুব প্রকাণ্ড চালন-চক্র সংযুক্ত থাকত। ষ্টীম ইঞ্জিনের শক্তিতে সেই বৃহৎ চাকাদু'টি ঘুরে উঠলেই জাহাজ চলতে সুরু করত। চাকাদু'টি যে পরিমাণ জোরে জলের ভিতর আবর্ত্তিত হ'ত তার অনুরূপ বেগে জাহাজও অগ্রসর হ'ত। কিন্তু এইরূপ চক্রসমন্বিত বোট সাগরবক্ষে চলতে গেলে সাগরের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে তার চাকা অনেক সময়ে বিকৃত ও বিকল হয়ে যেত, আর ভয়ানক ঝড়ের সময়ে সেই চাকার সাহায্যে দোলায়মান বোটের অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠত।

বাষ্প চালিত জাহাজকে সমুদ্রবক্ষে চলবার জন্য বিশেষভাবে যোগ্য করে তুললেন আর একজন বিখ্যাত উদ্ভাবক জন এরিকসন (John Ericsson)। ১৮০৩ সালে এরিকসন সুইডেনে জন্মগ্রহণ করেন। অনেক বৎসর পরে তিনি তাঁর জন্মভূমি সুইডেন ছেড়ে আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এই আমেরিকাতেই এরিকসন একজন উদ্ভাবক বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৮১৯ সালে প্রথম একখানা সাধারণ রকমের বাষ্পীয় জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে যেতে সমর্থ হয়। এই সময় এরিকসন ইঞ্জিনিয়ারিং শিখবার জন্য ইংলণ্ডে বাস করছিলেন। এই অভিনব ঘটনা এরিকসনের চিত্তকে বাষ্পীয়

জাহাজের দিকে প্রথম আকৃষ্ট করে। এরিকসন ভাবতে আরম্ভ করলেন কি উপায়ে তিনি বাষ্পীয় জাহাজের সমধিক উন্নতি সাধন করবেন। কেবল শান্ত সমুদ্রবক্ষের উপর দিয়ে নয়, কিন্তু বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের উপর দিয়েও নির্ব্বিবাদে চলতে পারে এমন একখানি বাষ্পীয় জাহাজের নির্ম্মাণ করবার জন্য তিনি একান্তমনে চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৮৩০ সালে তিনি একখানি বাষ্পীয় জাহাজের নক্সা তৈরি করেন। নক্সাতে বাষ্পীয় জাহাজের দুইপাশের বৃহৎ দুটী চাকার পরিবর্ত্তে তিনি স্ক্রু পরিচালকের (Screw propellor) ব্যবস্থা করেন। এরিকসন এই "স্ক্রু পরিচালকটি" জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে, নীচে, হালের ঠিক সম্মুখে স্থাপন করলেন। এখনকার দিনের জাহাজেও তাঁর উদ্ভাবিত স্ক্রু পরিচালকই ব্যবহৃত হয়। এই স্ক্রু পরিচালক জলের নীচে কাজ করে বলে সমুদ্রের পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গের আঘাতেও তার কোন রকম অনিষ্ট হবার কোন আশঙ্কা থাকে না। প্রথম প্রথম এরিকসনের এই নক্সা নৌবিভাগের পরিদর্শকের ঠিক পছন্দসই হ'ল না ও তিনি ইহার বিরুদ্ধে নানারকম আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁর এক প্রধান আপত্তির কারণ হ'ল এই যে, স্ক্রু পরিচালক, জাহাজকে চালাতে পারলেও, ইহা কার্য্যকরী হবে না, কারণ তা যখন জাহাজের পেছনে বসান হবে, তখন ঠিকভাবে জাহাজের গতি নিয়মন করা অসম্ভব হবে। এ আপত্তি খণ্ডন করবার জন্য এরিকসন প্রথম এই আদর্শে একখানা ছোট বাষ্পীয় পোত নির্ম্মাণ ক'রে ১৮৩৭ সালে তা টেমস্ নদীতে ভাসালেন। এই নূতন ধরণের ষ্টীমার দেখবার জন্য টেমস্ নদীর দুপার লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। স্ক্রু পরিচালকের সাহায্যে, সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে, এই অপূর্ব্ব ক্ষুদ্র বোটখানি ঘণ্টায় ১০ মাইল বেগে চলতে পারল। বাইরের

পরিচালক চক্র না থাকাতে কি করে যে বোটখানি চলছিল তা কেউ বুঝতে পারল না।

১৮৩৮ সালে এরিকসন "রবার্ট এফ্‌ ষ্টক্‌টন্‌" নামে একখানি বড় জাহাজ নির্ম্মাণ করলেন। এই স্ক্রু চালিত ষ্টীমারখানিই সর্ব্বপ্রথম আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে ইংলণ্ড হতে নিউইয়র্ক গিয়ে উপস্থিত হয়। ইংলণ্ড কিন্তু এরিকসনের এই নূতন ধরণের ষ্টীমার প্রথম প্রথম গ্রহণ করতে রাজি হ'ল না। ইংরাজরা সাধারণতঃ নূতন কোন জিনিষ শীঘ্র গ্রহণ করতে চায় না। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তারাও এরিকসনের স্ক্রু পরিচালিত ষ্টীমারের আদর্শে তাঁদের সমস্ত ষ্টীমার তৈরি করতে আরম্ভ করেন।

এরিকসনের এই স্ক্রু চালিত ষ্টীমার যখন প্রথম নিউইয়র্কে এসে পৌঁছাল তখন এরিকসনের আমেরিকাস্থ বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁকে আমেরিকায় চলে আসতে আহ্বান করলেন? তাঁরা বললেন তাঁর নূতন উদ্ভাবিত ষ্টীমারের আদর্শ আমেরিকায় সাদরে গৃহীত হবে।

আমেরিকার নৌবিভাগে তখনকার দিনে বাষ্পীয় ষ্টীমার ছিল না। এরিকসন আমেরিকায় ফিরে এলেন ও দুইবৎসরের মধ্যেই "প্রিন্সটন" (Princeton) নামে একটি লৌহ নির্ম্মিত যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ করলেন। এই জাহাজখানিতে স্ক্রু পরিচালকের ব্যবস্থা ত হ'লই, উপরন্তু তা'তে এরিকসনের উদ্ভাবিত অভিনব কামানবাহী শকটগুলিকে সজ্জিত করে রাখবার সুন্দর ব্যবস্থাও হ'ল। এই প্রিন্সটনটি হ'ল একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের যুদ্ধজাহাজ। তখনকার দিনের অন্য সমস্ত যুদ্ধজাহাজ হতে এর গতিবেগও হ'ল খুব বেশী, এবং ইহার যন্ত্রসমূহ জাহাজের জলদাগের (water line) নীচে অবস্থিত হওয়াতে, শত্রুপক্ষের গোলাগুলিতে তার কোনরকম জখম হওয়ার ভয়ও রইল না। এই নূতন যুদ্ধজাহাজের স্ক্রু

পুরানো ধরণের বাষ্পীয় জাহাজ

—৯০ পৃঃ

আধুনিক ষ্টীমার -৯১ পৃঃ
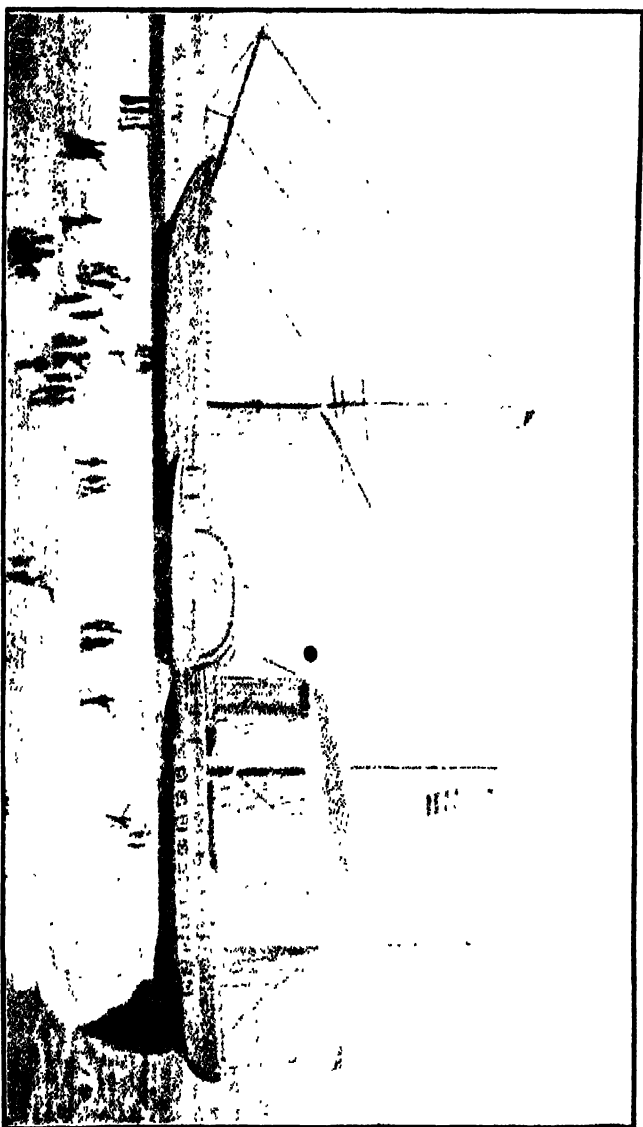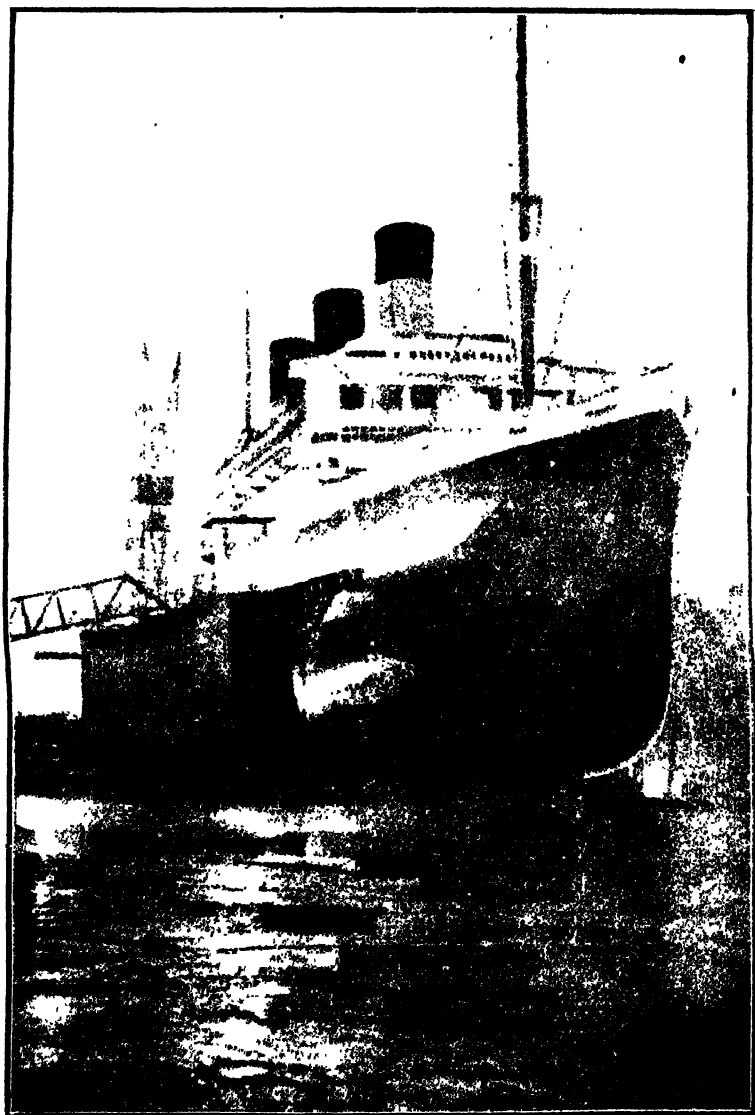
পরিচালক ও কামানসজ্জার অভিনব ব্যবস্থা পৃথিবীর সমস্ত নৌ-বিভাগের কর্ত্তাদের মনে একটি চাঞ্চল্যের স্বজন করে তুলল। ১৮৪৮ সালে এরিকসন্ আমেরিকায় নাগরিকের সমস্ত অধিকার লাভ করেন। ১৮৬১ সালে যখন আমেরিকায় অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হয় তখন এরিকসন্ উত্তরপ্রদেশ সমূহের সহিত যোগ দেন। তিনি দক্ষিণপ্রদেশ সমূহের রণবহরকে নৌযুদ্ধে পরাজিত করবার জন্য সভাপতি লিন্‌কলনের অনুমতিক্রমে "মনিটার" নামে নূতন ধরণের লৌহনির্ম্মিত আর একখানি যুদ্ধজাহাজ তৈরি করেন। তাঁর এই নূতন রণপোতের সাহায্যেই উত্তর রাজ্য দক্ষিণরাজ্যের নৌবহরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করতে সমর্থ হয়।

আগেকার দিনের যুদ্ধজাহাজগুলি সবই কাঠ দিয়ে তৈরি হত। এরিকসনের তৈরি অভিনব যুদ্ধজাহাজ জগতের নৌবিভাগে এক যুগান্তরের স্বজন করে। ইহার পরে পৃথিবীর সমস্ত রণপোতই এরিকসনের যুদ্ধজাহাজের আদর্শে তৈরি হতে লাগল।

এই সুপ্রসিদ্ধ এরিকসনই প্রথম বাষ্পীয় দমকল উদ্ভাবন করেন। তিনি পরে আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশে তাঁর বিবিধ উদ্ভাবনের জন্য বিশেষভাবে সম্মানিত হন।

তোমাদের বাষ্পীয় জাহাজের উদ্ভাবনের কথা বলেছি। এই বাষ্পীয় জাহাজ ধীরে ধীরে নানা দিক দিয়ে এমন অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করেছে যে বর্ত্তমানের জাহাজের সঙ্গে, সুখসুবিধা ও দ্রুতগামিতার দিক থেকে, আগেকার জাহাজের তুলনাই হয় না। এখনকার দিনের বড় বড় ষ্টীমারগুলি যেন অনেকটা ছোটখাটো এক একটি সহরের মতন। তাতে এখনকার সহরের প্রায় সবরকম সুখসুবিধারই বন্দোবস্ত আছে। খুব বড় ষ্টীমারগুলিতে খেলবার জায়গা, স্নান করবার জন্য জলাশয়, বাগান, ব্যাঙ্ক, থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি প্রায় সবই আছে।

প্রত্যেক ষ্টীমারেই বিপদের সময় জীবনরক্ষা করবার জন্য একরকম "জ্যাকেট" রাখা হয়। এই জ্যাকেট পরলে যারা সাঁতার জানে না তারাও জলের উপর অনায়াসে ভেসে থাকতে পারে। ইহা ছাড়া বিপদের সময় জীবনরক্ষার জন্য "লাইফ বেল্ট," "লাইফ বোট" প্রভৃতিও রাখা এখন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রত্যেক ষ্টীমারেই এখন বেতার-টেলিগ্রাফ থাকে। হঠাৎ বিপদের সময় ষ্টীমার হতে বেতারবার্ত্তা প্রেরিত হলেই নিকটস্থ অন্যান্য সমস্ত ষ্টীমার শীঘ্র ছুটে এসে বিপন্ন ষ্টীমারের সমস্ত যাত্রীদের তুলে নিয়ে যায়। এইরূপ বিপদবার্ত্তাকে বলা হয় ইংরাজিতে S. O. S.

প্রত্যেক ষ্টীমারেই দিক্‌দর্শন যন্ত্র থাকে। এই যন্ত্রের সাহায্যে রাত্রির নিবিড় অন্ধকারেও দিঙ্‌নির্ণয় করে তা আপন গন্তব্যপথে নিশ্চিন্তে ও নিরুদ্বেগে অগ্রসর হতে পারে।

এই প্রকারের নানা উদ্ভাবনের সাহায্যে এখনকার দিনে ষ্টীমারে যাওয়া-আসা যথাসম্ভব নিরাপদ হয়েছে।

ডুবোজাহাজ বা সাবম্যারিণ

তোমরা এরোপ্লেনের কথা জান। এরোপ্লেন বিমানপথে হাওয়ার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে তোমরা সবাই দেখেছ, কিন্তু সাবম্যারিণ তোমরা কেউ কখনও দেখনি। আজ তোমাদের এই সাবম্যারিণের গল্প বল্‌ব। এ বড় অদ্ভুত রকমের জাহাজ। এর আর এক নাম হ'ল "ইউ-বোট"।

ষ্টীমার, জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি জলের উপর দিয়ে চলে, কিন্তু এই অদ্ভুত "ইউ-বোট" চলে জলের ভিতর দিয়ে। তোমরা হয়ত জিজ্ঞাসা করবে, জলের ভিতর দিয়ে এই বোট কি করে চলে, আর যারা তা চালায় তারা জলের নীচে বাঁচেই বা কি করে। এই ডুবো জাহাজ এমন কৌশলে তৈরি হয় যে বেশ নির্ব্বিবাদে মাছের মতন জলের ভিতর চলাফেরা করতে পারে। আর এই জাহাজে এমন সুন্দর উপায়ে প্রয়োজনমত হাওয়া ও রসদ প্রভৃতি নেওয়া হয় যে, তার নাবিকদের নিশ্বাস প্রশ্বাস নেবার কি খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্টই হয় না। তারা বেশ দিব্য আরামে বোটে ক'রে জলের নীচে ঘোরাফেরা করে বেড়ায়।

মানুষের বুদ্ধিবলে আকাশে পাখীর মতন সহজে চলবার এরোপ্লেন যেমন উদ্ভাবিত হয়েছে, তেমনি জলের ভিতর মাছের মতন স্বচ্ছন্দগতিতে চলাফেরা করবার জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে এই সাবম্যারিণ।

এই ইউ-বোটগুলি আরোহী নিয়ে যাতায়াত করবার জন্য তৈরি হয়নি, কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনেই তা নিৰ্ম্মিত হয়েছে।

এই সব ইউ-বোট জলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে থেকে শত্রুপক্ষের বড় বড় যুদ্ধজাহাজগুলি ধ্বংস করবার চেষ্টা করে। ইউ-বোট প্রয়োজনমত জলের ওপরেও ভেসে উঠ্‌তে পারে, আবার যখন খুসি ডুব দিয়ে জলের নীচেও চলে যেতে পারে।

ইউ-বোট যখন জলের নীচ দিয়ে চলে তখন সমুদ্রগামী বড় বড় যুদ্ধজাহাজ তাকে দেখ্‌তে পায় না, কিন্তু সাবম্যারিণের লোকেরা জলের নীচ হ'তে সমুদ্রের ওপরকার জাহাজাদি বেশ দেখ্‌তে পায়। ইউ-বোটগুলি জলের নীচ দিয়ে সেই সব জাহাজের কাছে এসে, টর্পেডো কি কামান ছুঁড়ে তাদের অতর্কিতে এমন বিষম আঘাত করে যে, তাদের গায়ের নানা জায়গায় ফুটো হয়ে গিয়ে তারা অচিরে জলমগ্ন হয়।

তোমরা নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবে জলের নীচ থেকে ইউ-বোটের নাবিকরা এই সব বড় বড় যুদ্ধজাহাজ কি করে দেখতে পায়। জলের নীচ থেকে ইউ-বোট একটি যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রের ওপরকার সব কিছু দেখতে পায়। এই যন্ত্রটির নাম হ'ল, পরিবীক্ষণ যন্ত্র বা পেরিস্কোপ (Periscope)। এই পেরিস্কোপটি হ'ল সাবম্যারিণের চক্ষু। সাবম্যারিণের ঠিক ওপরের কক্ষটিকে—যে ঘরে বসে কাপ্তান ইউ-বোটের গতি নিয়মন করেন—বলা হয় কনিং টাওয়ার (Conning Tower), ও এই কনিং টাওয়ারে দিক্‌দর্শন যন্ত্র, পরিবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি সবই থাকে। এই কক্ষটিতে ১৫।২০ ফিট্ উঁচু দুটি পেরিস্কোপ বসানো থাকে। পেরিস্কোপের ভিতর এমন চমৎকার নৈপুণ্যের সহিত কতগুলি ছোট আর্শি বসানো থাকে যে, ওপরের আর্শিতে প্রতিফলিত সমস্ত বস্তুই সর্ব্বনিম্নকার আর্শিতে বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। নিম্নের নিরাপদ স্থানে থেকে এই পেরিস্কোপের সাহায্যে ইউ-বোটের লোকেরা

সমুদ্রের ওপরকার জাহাজ প্রভৃতি বেশ দেখ্‌তে পায়। এই পেরিস্কোপের মাথাটি ঠিক সাগর-জলের একটু ওপরে যেন ভেসে চলে এবং ইহার মাথায় যে কাচখণ্ডটুকু থাকে তা'তে সমুদ্রের উপরিভাগের জাহাজাদির ছবি এসে প্রতিফলিত হয়। আর এই প্রতিফলিত ছবিটি গিয়ে পেরিস্কোপের নীচেকার আর্শিতে প্রতিফলিত হতেই কাপ্তান সমুদ্রের ওপরে কোথায় কি আছে তা বেশ সহজে দেখ্‌তে পান। পেরিস্কোপের মাথাটি যে পর্য্যন্ত না সমুদ্রের জলের ওপরে এসে পৌছায় ততক্ষণ ইউ-বোট একেবারে অন্ধ হয়ে থাকে। সে অবস্থায় ইউ-বোটকে একরকম চারিদিকে অন্ধের মত হাতড়িয়ে চল্‌তে হয়। তখন শুধু দিকদর্শন যন্ত্র ও জলের গভীরতা পরিমাপকটির সাহায্যে সমুদ্রগর্ভস্থ কোন চড়ায় কিম্বা সমুদ্রতীরস্থ অগভীর জলতলে এসে না পড়ে এই ভাবে, তাকে চলতে হয়। এই পেরিস্কোপের মাথাটি যতক্ষণ না জলের ওপরে ভেসে ওঠে ততক্ষণ এই ইউ-বোটকে বড়ই ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়, কারণ এইরূপ অন্ধ অবস্থায় চল্‌তে গিয়ে কখন সমুদ্রের ওপরকার কোন্‌ যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে হঠাৎ ঠোকাঠকি হয়ে যায় তার ঠিক থাকে না। আর একটি ভয় থাকে এই যে, ইউ-বোটের পেরিস্কোপ জলের ভিতর দিয়ে চলবার সময় তার পেছনে জলের ওপর একটি দাগ রেখে যায় ও এই দাগটি সমুদ্রের ওপরকার কোন যুদ্ধজাহাজের দৃষ্টিপথে হঠাৎ পড়লেই তা' ইউ-বোটের অবস্থিতি স্থান জানতে পেরে তাকে আক্রমণ করতে পারে। পেরিস্কোপটির মাথাটা জলের ওপর একবার ভেসে উঠলেই কাপ্তান ইউ-বোটের অবস্থিতি স্থান জানতে পেরে তাকে ঠিকপথে চালিত করতে সক্ষম হ'ন, এবং তখন আর কোন ভয়ের কারণই থাকে না।

ইউ-বোটগুলির এক এক জায়গায় এক একটি কেন্দ্র থাকে।

এই কেন্দ্রস্থল হতে প্রয়োজনমত হাওয়া, অক্সিজেন ও রসদ প্রভৃতি নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে, বোটগুলি একটি নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে নানাদিকে বেরিয়ে পড়ে। এই কেন্দ্রের সঙ্গে বেতার টেলিগ্রাফে প্রত্যেক ইউ-বোটের যোগ থাকে। রসদ প্রভৃতি নিঃশেষিত হয়ে গেলে, আবার তাদের এই কেন্দ্রস্থানে এসে সব ভর্ত্তি করে নিতে হয়।

এবার তোমাদের ইউ-বোটের জন্মকাহিনীটি বলছি। এই জন্মকথা বলতে গিয়ে এসম্বন্ধে আরও অনেক কথা তোমাদের বলব। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় সর্ব্বপ্রথম একটি ছোট খাট সাবামারিণ ব্যবহৃত হয়। এই প্রথম সাবমারিণ আকারে খুব ছোটই ছিল; ডাভিড বুসনেল (David Bushnell) এই সাবম্যারিণখানি নির্ম্মাণ করেন। বুসনেল এর নাম দেন "টার্টল" (Turtle) বা কচ্ছপ, কারণ ইহার আকারটি হয়েছিল দেখতে ঠিক কচ্ছপেরই মতন। এই অদ্ভুত রকমের বোটখানি কেবল একজনমাত্র লোক বহন করে চলতে পারত। দু'টি দাঁড়ের সাহায্যে এই "টার্টল" বোটখানি চালান হ'ত, ও তা'র ভিতর থেকেই দাঁড় টানবার বন্দোবস্ত ছিল. এই বোটখানি আধঘণ্টাকাল জলের ভিতর ডুবে থাকতে পারতো। যখন এই প্রথম সাবমারিণের সঙ্গীহীন কাপ্তান জলের নীচে যেতে ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি বোটের জলাধারের মুখটি খুলে দিতেন ও সেই জলাধারটা ভর্ত্তি হয়ে গেলেই জলের ভারে সাবম্যারিণ নীচে নেমে পড়ত। আবার যখন তিনি জলের উপরে উঠে আসতে ইচ্ছা করতেন তখন এই জলাধারটি একটি পাম্পের সাহায্যে শূন্য করে নিতেন। এখনকার বড় বড় সাবম্যারিণে এই সব কাজ যন্ত্রের সাহায্যেই হয়, কিন্তু ডাভিড্ বুসনেলকে এই সব কাজ নিজের হাতেই করতে হ'ত। এই "টার্টলের" তলাতে তিনি প্রায় আড়াই মণ ওজনের একটি দস্তার পাত

সংলগ্ন করে দেন যাতে তা হঠাৎ তরঙ্গের আঘাতে না উল্টে যায়। যখন কাপ্তান খুব শীঘ্র জলের নীচ হতে ওপরে উঠ্‌তে চাইতেন, তখন তিনি এই ভারি জিনিষটি বোটের নীচ থেকে খুলে দিতেন।

দুই টুকরা কাঠের ভিতরটা ফাঁক করে নিয়ে তাতে বারুদ ভর্ত্তি করে এই টার্টলে রাখা হ'ত। আর এই টার্টল ডুব দিয়ে অতি সন্তর্পণে যে কোন যুদ্ধজাহাজের নীচে গিয়ে, সেই জাহাজের গায়ে একটি গর্ত্ত করে, গর্ত্তের ভিতর সাবধানে এই অদ্ভুত রকমের কাঠের তোপ দুটি রেখে, তা বিদারণের পূর্ব্বেই দূরে পালিয়ে আসত। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই টার্টল ইংলণ্ডের ঈগল নামে এক যুদ্ধ-জাহাজকে ধ্বংস করবার জন্য চেষ্টা করে। টার্টল সেই ঈগল জাহাজের নীচে গিয়ে দেখতে পেল যে তার সর্ব্বাঙ্গ পিতলের পাত দিয়ে মোড়া ও তাতে কোন ফুটো করা অসম্ভব। ব্যর্থমনোরথ হয়ে টার্টলকে ফিরে আসতে হ'ল। ইহার পরে আরও দুএকবার এই টার্টল বৃটিশ রণতরী নষ্ট করবার চেষ্টায় ব্যর্থকাম হয়। তারপরে একবার এই "টার্টল" সাবম্যারিণখানাকে জাহাজে তুলে অন্যত্র নিয়ে যাবার সময় জাহাজখানা সাবম্যারিণসহ জলমগ্ন হয়। সর্ব্বপ্রথম সাবম্যারিণের শোচনীয় অবসান হ'ল এইভাবে।

এই ঘটনার পরে রবার্ট ফাল্‌টন (Robert Fulton) নামক আর একজন আমেরিকাবাসী ১৮০০ খৃষ্টাব্দে "নটিলাস" (Nantilas) নামক এক সাবম্যারিণ নির্ম্মাণ করেন। তিনিই আবার ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম নির্ম্মিত সাবম্যারিণ হতে অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর আর একখানি সাবম্যারিণ নির্ম্মাণ করেন ও সেই বোটখানির নামও "নটিলাস" দেন। তাঁর এই দ্বিতীয় বোটখানি তিনি সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শন করেন। তিনি ও আর একজন নাবিক এই সাবম্যারিণখানিতে আরোহণ ক'রে প্রায় ২০

মিনিট পর্য্যন্ত জলের নীচে থেকে যখন বেরিয়ে আসেন, তখন হাজার হাজার দর্শকের প্রশংসাধ্বনিতে আকাশ কেঁপে ওঠে। এই ডুবো বোটখানিই জলতল হতে সর্ব্বপ্রথম "টরপিডো" তোপ নিক্ষেপ করতে সমর্থ হয়। এই সময়ে সুবিখ্যাত নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সঙ্গে ইংলণ্ডের খুব যুদ্ধ চল্‌ছিল। বৃটিশ রণপোতসমূহ যখন ফ্রান্সের উপকূল বেষ্টন করে রেখেছিল তখন নেপোলিয়ন রবার্ট ফাল্‌টনকে বলেন যে, তিনি যদি তাঁর সাবম্যারিণের সাহায্যে শত্রুপক্ষের দশকামানের কোন যুদ্ধ জাহাজ বিনষ্ট করতে পারেন তবে ষাট হাজার ফ্র্যাঙ্ক পারিতোষিক লাভ করবেন, আর যদি ৩০ কামানের বেশী কোন রণতরী ধ্বংস করতে পারেন তবে চারলক্ষ ফ্র্যাঙ্ক পুরস্কার পাবেন।

ফাল্‌টন তাঁর নটিলাসের সাহায্যে বৃটিশ রণতরী ধ্বংস করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি একখানি যুদ্ধ-জাহাজও নষ্ট করতে পারলেন না। একবার একখানা খুব বড় রণতরী লক্ষ্য করে তাঁর "নটিলাস" হতে একটি টরপিডো তোপ নিক্ষেপ করেন, কিন্তু সে রণতরীখানি একটুর জন্য রক্ষা পায়। এই কার্য্যে ব্যর্থ হওয়াতে তিনি নেপোলিয়নের প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভ করতে পারলেন না। দুঃখের বিষয় ইহার পরে ফ্রান্সের নৌ-বিভাগের কোন বড় কর্ম্মচারীরই তাঁর সাবম্যারিণের ওপর আর কোনরূপ শ্রদ্ধা রইল না।

ইহার কিছুকাল পরে ফাল্‌টন ইংলণ্ডে গিয়ে তাঁর উদ্ভাবিত এই সাবম্যারিণ সেখানকার শাসন-বিভাগের বড় বড় কর্ত্তাদের সম্মুখে প্রদর্শন করেন। ইংলণ্ডের তখনকার প্রধান মন্ত্রী উইলিয়াম পিট্ (William Pitt) এই সাবম্যারিণ দেখে এমন মুগ্ধ হয়ে যান যে, তিনি বলেন এই সাবম্যারিণ রূপ অস্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত রণতরী অতি সহজে ধ্বংস করা সম্ভব হবে। ফাল্‌টন তাঁর সাবম্যারিণের শক্তি

সাবমেরিন

সাধারণের সম্মুখে প্রদর্শন করতে গিয়ে, মাত্র ৩৫ সের ওজনের বারুদে পূর্ণ কয়েকটি টরপিডোর আঘাতে একখানি খুব বড় ভারি পুরাণো জাহাজকে চূর্ণিত করে দেন।

কিন্তু ফাল্‌টনের এমনি কপাল যে তাঁর বিশেষ উৎসাহদাতা ও বন্ধু প্রধান মন্ত্রী পিটের, এই ঘটনার অল্প কয়েকদিন পরেই মৃত্যু হয়। পিটের মৃত্যুর পরে যিনি প্রধান মন্ত্রী হলেন তিনি ফাল্‌টনের সাবম্যারিণের প্রতি তেমন একটা আগ্রহ দেখালেন না। এই সময়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ফাল্‌টনের এই উদ্ভাবন ক্রয় ক'রে নিয়ে সাবম্যারিণ নির্ম্মাণ বন্ধ ক'রে দেবার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু ফাল্‌টন তাতে স্বীকৃত হলেন না। তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বললেন যে, বছরে তাঁকে তিন লক্ষ করে টাকা দিলেও তিনি তাঁর উদ্ভাবন এই সর্ত্তে বিক্রী করতে রাজী নন, কারণ তাঁর নিজের মাতৃভূমিরই কোনদিন এই উদ্ভাবনের প্রয়োজন হতে পারে।

ফাল্‌টনের টরপিডো নিক্ষেপের প্রণালী ও অন্যান্য অনেক কল-কৌশল বর্ত্তমানের প্রায় সব সাবম্যারিণে গৃহীত হয়েছে।

আমেরিকার অন্তর্বিপ্লবের সময় হাণ্ডলে (Hundley) নামক একখানি সাবম্যারিণ নির্ম্মিত হয়। এই সাবম্যারিণখানা আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দক্ষিণপ্রদেশসমূহ তৈরি করে। ইহা আকারে খুব ছোটই ছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এই হাণ্ডলে সাবম্যারিণ নয়জন নাবিক ও একটি টরপিডো তোপ নিয়ে চারল্‌শটাউন (Charlestown) বন্দরে প্রবেশ ক'রে, আমেরিকার উত্তর প্রদেশের হাউসেটানিক (Housatanic) রণতরীকে বিনষ্ট করতে সমর্থ হয়। সাবম্যারিণ হতে নিক্ষিপ্ত টরপিডো দ্বারা এই যুদ্ধজাহাজখানির বারুদের কক্ষ আহত হয়ে বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং তা তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হয় এবং সেই সময় সাবম্যারিণখানা রণতরীর খুব নিকটে ছিল বলে তা নিজেও আহত হয়ে রণতীরর সঙ্গে জলমগ্ন

হয়। সাবম্যারিণের ইতিহাসে, যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস কার্যো এই হ'ল তা'র সর্ব্বপ্রথম সফলতা। আমেরিকার অন্তর্বিপ্লবের পরে বহু বৎসর পর্য্যন্ত আর এই ডুবোজাহাজের কোনরূপ উন্নতি সাধনের কোন চেষ্টাই হয়নি।

তখনকার দিনে সাবম্যারিণের মস্তবড় একটা অসুবিধা ছিল এই যে, তাকে জলের নীচে ইচ্ছামত চালিত করবার কোন উপায়ই ছিল না। ষ্টীমইঞ্জিন দিয়ে তাকে চালাবার উপায় ছিল না, কারণ বাষ্প সঞ্চার করতে ঢের কয়লার প্রয়োজন হয়, আর কয়লা জিনিষটা খুব ভারি ও অনেকটা জায়গা অধিকার করে বলে তা সাবম্যারিণে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। তা ছাড়া হাওয়া না থাকলে আগুন জ্বলে না, কাজেই ষ্টীমইঞ্জিন চালাতে গেলে প্রচুর হাওয়ার প্রয়োজন হয়। আবার হাওয়াও অত বেশী পরিমাণে সাবম্যারিণে সঞ্চিত করে রাখবার তখন কোন সুবিধাই ছিল না। এই সব কারণে ডুবোজাহাজ বহুদিন অনাদৃত অবস্থায় পড়ে ছিল।

বহুদিন পরে তিনটি অতি প্রয়োজনীয় উদ্ভাবন এই ম্রিয়মাণ সাবম্যারিণকে পুনরায় সঞ্জীবিত করে তোলে। এই তিনটি উদ্ভাবনের প্রথমটি হ'ল পেট্রল ইঞ্জিন। দ্বিতীয়টি হ'ল বৈদ্যুতিক গতিসঞ্চারক (Electric motor) এবং তৃতীয়টি হ'ল তড়িৎসঞ্চয়ী যন্ত্র (Storage Battery)। এর প্রথমটির পরিচালনের জন্য কয়লা কিম্বা অন্য কোনরূপ ভারি জিনিষের প্রয়োজন হয় না। যখন সাবম্যারিণ জলের উপর দিয়ে চলে, তখন এই ইঞ্জিনের সাহায্যেই তাকে চালান হয়। আর অপর দুটি যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তিতে সাবম্যারিণকে জলের ভিতর দিয়ে চালান হয়। এই সময়ে সাইমন লেক্ (Simon Lake) নামে এক ব্যক্তি এই সব উদ্ভাবিত যন্ত্রাদির সাহায্যে এমন একখানি

সাবম্যারিণ নির্ম্মাণ করবার সঙ্কল্প করলেন যা'র সাহায্যে যে কোন জলমগ্ন জাহাজ হতে তার সমস্ত মূল্যবান জিনিষাদি পুনরুদ্ধার করা যায়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এই অভিপ্রায়ে "আর্গোনাট জুনিয়ার" (Argonut Junior) নামে একখানি ১৪ ফিট্ দীর্ঘ সাবম্যারিণ নির্ম্মাণ করেন। এই বোট-খানির নীচে চারটি চাকা লাগান হয় যা'তে সমুদ্রতলে তা বেশ সহজে চল্‌তে পারে। ইহার অগ্রভাগে অবস্থিত একটি কক্ষের ভিতর দিয়ে যাতে ডুবুরীরা বেরিয়ে এসে নির্ব্বিবাদে উদ্ধার কার্য্য সম্পন্ন করতে পারে তারও বেশ সুন্দর রকম ব্যবস্থা করা হয়। এই বোটখানি মাত্র জলের ২০ ফিট্ নীচ পর্য্যন্ত যেতে পারল। লেক্ এই বোটের সাহায্যে সমুদ্রের অগভীর জলে যে সব সম্পদ নিমজ্জিত ছিল তার বেশীর ভাগই উদ্ধার করেন।

এই উদ্ধারকার্য্যে সফলকাম হ'বার পরে লেক্ খুব উৎসাহিত হ'য়ে আরও দু'খানি সাবম্যারিণ নির্ম্মাণ করেন। এই দুখানি বোটে অন্ততঃ চারজন নাবিকের শোবার জায়গা ও ৪৮ ঘণ্টা ব্যবহারের উপযোগী বায়ু সঞ্চিত করে রাখবার সুন্দর ব্যবস্থা করেন। এই নূতন সাবম্যারিণ ভয়ানক ঝড়ের সময়ও বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষের ওপর দিয়ে বেশ নিরাপদে চলতে সমর্থ হ'ল। আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই "লেক-সাবম্যারিণ" ক্রয় করতে অনিচ্ছুক হওয়াতে ইহাদের একখানি রুশসাম্রাজ্যের নিকট বিক্রীত হয়ে ব্লাডিভষ্টকে প্রেরিত হয়।

এখনকার দিনের উন্নততর সাবম্যারিণের উদ্ভাবনকর্ত্তা বলা যেতে পারে জন হলাণ্ডকে (John Holland)। হলাণ্ড আমেরিকায় প্রথম সাত খানি সাবম্যারিণ নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু তার একখানিও তেমন ভাল হ'ল না। অনেক চেষ্টার পর তিনি পরিশেষে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে খুব চমৎকার একখানি সাবম্যারিণ নির্ম্মাণ করেন। এই নূতন সাবম্যারিণের

নাম হল "আট নম্বর হলাণ্ড" (Holland No. 8)। ইহা বেশ মাছের মতন জলের নীচে সহজেই যথেচ্ছ চল্‌তে সমর্থ হ'ল। জলের ওপর দিয়ে ইহা ঘণ্টায় ৮ মাইল বেগে ছুট্‌তে পারল, ও একবার মাত্র ইন্ধন ও রসদাদি নিয়ে ১৫০০ মাইল পর্য্যন্ত জলের নীচে চলাফেরা করতে সমর্থ হল।

যুদ্ধের সময় এইরূপ ডুবোজাহাজ খুব কার্য্যকরী হবে, হলাণ্ডের এই নূতন জাহাজখানি দেখে সকলেরই এই দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল। তখন জার্ম্মানী, আমেরিকা, ইংলণ্ড ও জাপান প্রভৃতি সমস্ত দেশ এই রকম সাবমারিণ নির্ম্মাণ করবার জন্য বড়ই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। হলাণ্ডও এই সুযোগে সাবম্যারিণের নানারকম নক্সা তৈরি করে তা এই সমস্ত দেশের নিকট বহুমূল্যে বিক্রয় করলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এই সমস্ত দেশে ইউ-বোট নির্ম্মাণের মহা ধুম পড়ে গেল। এই সময়ে অনেক বৃহদাকারের সাবমারিণ তৈরি হয়।

হলাণ্ডের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এই ইউ-বোটের সাহায্যে শত্রুপক্ষের সমস্ত যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করে দেওয়া খুব সহজ হয়ে উঠবে; কিন্তু তিনি যা ভেবেছিলেন কার্য্যকালে তার কিছুই হল না। বিগত মহা-যুদ্ধের সময় তাঁর উদ্ভাবিত ইউ-বোটের কার্য্য দেখবার সৌভাগ্য তাঁর হ'ল না, কারণ যুদ্ধ আরম্ভ হবার ঠিক পূর্ব্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

জার্ম্মানরা বিগত মহাযুদ্ধের সময় এই ইউ-বোটের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে। তারা দেখল যে ইউ-বোটে পেট্রল ইঞ্জিন ব্যবহার করলে তাতে ভয়ের কারণ থাকে খুবই বেশী। পেট্রল জিনিষটা খুব শীঘ্রই বাষ্পীভূত হয়ে যায়। পেট্রলের অণুগুলির মধ্যে যোগাকর্ষণ-শক্তি খুব কম বলে তা সহজেই উড়ে চারদিকে ছড়িয়ে যায়। ইউ-বোট

যখন জলের নীচে থাকে তখন পেট্রলের অণুগুলি পেট্রলপাত্র হতে বেরিয়ে এসে ইউ বোটের ভিতরকার হাওয়ার সঙ্গে মিশে যায়। আর তখন যদি বৈদ্যুতিক গতি সঞ্চারক (Electric Motor) হতে কোন উপায়ে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়ে তাতে এসে পড়ে তবে সেই পেট্রল মিশ্রিত হাওয়া হঠাৎ জ্বলে উঠে ইউ-বোটখানাকে একেবারে বিনষ্ট ক'রে দেবার খুবই ভয় থাকে। আবার পেট্রল ব্যবহার করতে হলে উচ্চশক্তির ইঞ্জিনের দরকার হয় এবং উচ্চশক্তির ইঞ্জিনে ইন্ধনও জোগাতে হয় অত্যন্ত বেশী। আর ইন্ধন সংগ্রহের জন্য ইউ-বোটকে বার বার কেন্দ্রস্থলে আসতে হলে তার পক্ষে কেন্দ্রস্থান ছেড়ে খুব বেশী দূর যাওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

ইউ-বোটের এই সব অসুবিধা দূরীকৃত হ'ল—যখন জার্ম্মানরা "ডিজ্‌ল্ অয়েল ইঞ্জিন" (Diesel Oil Engine) উদ্ভাবন করল। এই ইঞ্জিনে কেরোসিন কিম্বা বেঞ্জল (Benzol) ব্যবহৃত হয়। এই তেল ব্যবহার করলে খরচও পড়ে খুব কম ও ইঞ্জিনের শক্তিও বেড়ে যায় খুব বেশি, এবং আগুনের ভয়ও তাতে আর থাকে না। ডিজ্‌ল্ অয়েল ইঞ্জিন বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের কোন অপেক্ষা রাখে না। কারণ এই ইঞ্জিনের সিলিণ্ডার বায়ুতে পূর্ণ হলে, পিষ্টনের ঊর্দ্ধচাপে সিলিণ্ডারস্থ বায়ু অতিমাত্র সঙ্কুচিত হয়ে খুব অল্প জায়গায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে, এবং এই অবস্থায় সেই হাওয়ার ওপর চাপ পড়ে প্রতি ইঞ্চিতে প্রায় ছয় মণ। আর এই উচ্চ চাপের কাজটি এত শীঘ্র সম্পন্ন হয় যে তাতে হঠাৎ সংক্ষুব্ধ ও সঙ্কুচিত বায়ু আগুনের মত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ও এই অতিমাত্র উত্তপ্ত হাওয়াতে তেল এসে পড়া মাত্রই নিমেষে তা নিজ হতে জ্বলে উঠে।

বিগত যুদ্ধের সময় প্রায় সমস্ত ইউ-বোটেই এই নূতন উদ্ভাবিত ইঞ্জিন

ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হয়। এই "ডিজ্‌ল্‌ অয়েল ইঞ্জিনটি" ইউ-বোটের ইতিহাসে একটি যুগান্তরের সূত্রপাত করে দিয়েছে।

জার্ম্মানরা যখন দেখতে পেল যে ইংলণ্ডের অসংখ্য রণপোতের বিরুদ্ধে সমুদ্রের মুক্তবক্ষে যুদ্ধ করে জয়ী হবার আশা নেই, তখন কি উপায়ে এই ইউ-বোটের সমধিক উন্নতি সাধন ক'রে, তার সাহায্যে ইংলণ্ডের রণতরীসমূহ ধ্বংস করা যায় সেই চেষ্টায় তারা আত্মনিয়োগ করল। যুদ্ধের প্রারম্ভে যে সব ইউ-বোট নির্ম্মিত হ'ত তা দীর্ঘে ১৫০ ফিট্‌ পর্য্যন্ত হ'ত। কিন্তু যুদ্ধের ২।৩ বৎসর পরে জার্ম্মানীতে ৩০০ ফিট্‌ দীর্ঘ ইউ-বোট তৈরি হতে সুরু হ'ল। এই সব সুবৃহৎ ইউ-বোটের গতিবেগও হ'ল খুব বেশী।

তোমাদের ইতিপূর্ব্বে ইউ-বোটের চক্ষুস্বরূপ পরিবীক্ষণ যন্ত্রের কথা বলেছি। জার্ম্মানীতে এই সময়ে এক নূতন রকমের পেরিস্কোপ উদ্ভাবিত হয়। ইহাকে একটি হাতকলের সাহায্যে ওঠানো নামানো সম্ভব হ'ল। ইউ-বোট যখন জলের নীচ দিয়ে চলত তখন ইউ-বোটের কাপ্তান এই পরিবীক্ষণ যন্ত্রটি যখন খুসী তুলে দিয়ে চারিদিক দেখে নিতেন ও কোন বিপদের কারণ দেখতে পেলেই তা অতি শীঘ্র নামিয়ে নিতেন। আগেকার পেরিস্কোপগুলি সব সময়েই উঁচু হয়ে থাকত বলে ইউ-বোট চলবার সময়ে সেইসব পেরিস্কোপ জলের উপর একটি দাগ রেখে যেত; কিন্তু এই নূতন উদ্ভাবিত পেরিস্কোপ নামিয়ে নেওয়া যেত বলে সে ভয় আর রইল না।

ইউ-বোটের অগ্রভাগে ৩।৪টি টরপিডো টিউব সজ্জিত করে রাখা হয় এবং প্রয়োজনমত টরপিডোগুলিকে বায়ুপ্রবাহের (Air blast) আঘাতে সজোরে লক্ষ্যবস্তুর প্রতি নিক্ষেপ করা হয়। এই টরপিডোগুলি দেখতে অনেকটা চুরটের আকার এবং এক একটি টরপিডো সচরাচর

১৫।২০ ফিট্ লম্বা হয়। ইহা জলের ১৫ ফিট্ আন্দাজ নীচ দিয়ে ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে ছুটে চলে। এই টরপিডোগুলিতে ঠিক ছোটখাটো মোটর-বোটের ইঞ্জিনের মতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঞ্জিন সংযুক্ত থাকে; কিন্তু এই ক্ষুদ্র ইঞ্জিনগুলি চলে তার অন্তস্থিত সঙ্কুচিত বায়ুর বিক্ষেপশক্তিতে। যখন এই টরপিডোগুলিকে টিউবের ভিতর হ'তে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তারা টিউব হতে বেরিয়ে এসে নিজের ভিতরকার বায়ু চালিত যন্ত্রের (air motor) দ্বারা সবেগে চালিত হয়। প্রত্যেক টরপিডোর সম্মুখভাগ, T. N. T. নামক এক রকম ভয়ানক বিদারণশীল বস্তু দ্বারা পূর্ণ করে দেওয়া হয়, যা শত্রুপক্ষের জাহাজকে আঘাত করেই সশব্দে বিদীর্ণ হয়ে যায়।

যুদ্ধের শেষের দিকে যে সব ইউ-বোট তৈরি হয় তাতে এরকম টরপিডোর পরিবর্ত্তে ৬ ইঞ্চি পরিধির কামানও রাখা হত। টরপিডোগুলি বড় ব্যয়সাধ্য ছিল বলে এইরূপ কামান রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

যুদ্ধের সময় এই সব ইউ-বোটের সঙ্গে তাদের স্ব স্ব কেন্দ্রস্থানের বেতার টেলিগ্রাফের দ্বারা যোগাযোগ থাকত। সাধারণতঃ যখন রাত্রে ইউ-বোটগুলি জলের ওপরে উঠে আসত, তখনই কেন্দ্র-স্থানের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'ত বেশী। জার্ম্মানরা তারহীন টেলিগ্রাফের মাস্তুলগুলি, ইউ-বোটের ছাদের ওপর গুটিয়ে ভাঁজ করে করে রেখে দেবার বেশ বন্দোবস্ত করে। যখন যুদ্ধের সময় এই ইউ-বোটের গতিরোধ করবার জন্য ষ্টীলের জাল তৈরি হ'ল, তখন সেই জাল কেটে অগ্রসর হবার জন্য সমস্ত ইউ-বোটের অগ্রভাগে দাঁত বসানো খুব ধারাল ছুরি লাগানো হ'ল। এই সুতীক্ষ্ণ ছুরির সাহায্যে ষ্টীল নির্ম্মিত জাল কেটে অগ্রসর হওয়া ইউ-বোটের পক্ষে খুব সহজ হয়ে গেল।

বড় বড় সব ইউ-বোটগুলি প্রায় দুইদিন পর্য্যন্ত সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত

হয়ে থাকতে পারে। প্রত্যেক ইউ-বোটে প্রচুর পরিমাণে হাওয়া নিয়ে যাওয়া হয়। ইউ-বোটের ভিতরকার বায়ু যখন নিশ্বাস প্রশ্বাসে দূষিত হয়ে পড়ে, তখন সেই বায়ুকে নির্ম্মল করে তোলবার জন্য পটাস টেবলেট ও অক্সিজেনের বড় বড় আধার পাত্র সঙ্গে রাখা হয়। ইউ-বোটের মেরামতের জন্য প্রত্যেক বোটেই ডুবুরী মিস্ত্রী থাকে। ডুবুরী মিস্ত্রীরা চোখে মুখে জল না ঢুক্‌তে পারে এইরূপ একটি মুখাবরণ ব্যবহার করে। এই মুখাবরণের ভিতরও অক্সিজেন ও পটাস টেবলেট রেখে দেবার ব্যবস্থা আছে, যেন তার ভিতরকার হাওয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসে দূষিত হয়ে না পড়ে। অক্সিজেন ও পটাস টেবলেট তাদের মুখাবরণের মধ্যে রাখবার ব্যবস্থা হওয়াতে, মুখাবরণের সঙ্গে কোনরূপ বায়ুনলের সংযোগ রাখার এখন আর প্রয়োজন হয় না। জলের নীচে মিস্ত্রীরা বেশ সহজভাবে বোটের চারদিকে ঘুরেফিরে প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজ সম্পন্ন করে।

যুদ্ধের প্রারম্ভে এই ইউ-বোটের কাপ্তানের কাজ খুব সহজই ছিল। তিনি জলের নীচে নিরাপদে অদৃশ্য হ'য়ে থেকে সমুদ্রোপরি শত্রুপক্ষের যুদ্ধজাহাজ লক্ষ্য করে খুসীমত টরপিডো নিক্ষেপ করে ঘুরে বেড়াতে পারতেন, কিন্তু যুদ্ধ যেমন অগ্রসর হতে লাগল ইউ-বোটেরও আর এইরূপ সহজ নিরাপদ অবস্থা রইল না। ইউ-বোটের নাবিকদেরও সর্ব্বদা প্রাণভয়ে শঙ্কিত হয়ে থাকতে হ'ত, কারণ সাগরগভস্থ ইউ-বোটকে ধ্বংস করবার জন্য তখন নানা উপায় বেরুল।

এই ইউ-বোট ধ্বংস করবার কয়েকটি উপায়ের কথা তোমাদের শুনতে বেশ লাগবে। ইউ-বোটের প্রধান শত্রু হল ইউ-বোট-শিকারী (U-Boat chaser) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রুতগামী বোট। এই বোটগুলি আকারে এত ছোট ছিল যে তাদের লক্ষ্য করে ইউ-বোট হ'তে টরপিডো নিক্ষেপ

করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, কারণ এই টরপিডোগুলিকে জলের অন্ততঃ ১৫ ফিট্ নীচ দিয়ে যেতে হ'ত। তার ওপরে উঠলেই, সেগুলির আকার যে রকম ছিল, তাতে সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে তাদের উল্‌টে যাবার ভয় ছিল খুবই বেশী। ইউ-বোটের পক্ষেও জলের ওপর উঠে এসে যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না, কারণ জলের ওপরে উঠে এসে কামান দেগে শত্রু ধ্বংস করবার পূর্ব্বেই এই ক্ষিপ্রগতি শিকারী বোটগুলি ওপর হতে বোমা ফেলে তাদের দফা রফা করে দিত। এইরূপ অবস্থায় ডুবোজাহাজের পালিয়ে প্রাণ বাঁচান ছাড়া আর গত্যন্তর থাকত না।

বৃটিশরা শত্রুদের সাবম্যারিণ ধ্বংস করবার আর এক অভিনব উপায় বার করল। তারা সমুদ্রের গাংচিলগুলিকে (Seagulls) এমন শিক্ষা দিতে লাগল যাতে তারা জলের নীচে ইউ-বোট দেখলেই তার পিছু ধরে। কি করে এই পাখীগুলিকে বৃটিশরা এইভাবে শিক্ষা দেয় সেটি ভারি মজার কথা। একটি কথা তোমাদের বলে রাখা দরকার যে সমুদ্রের উপরকার কোন জাহাজ বা বোট হতে সাগর জলের ভিতরকার কোন বস্তু দেখা না গেলেও, বহু ঊর্দ্ধ হতে বৈমানিকরা বা পাখীরা সমুদ্রজলের ৫০ ফিট্ নীচ পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্ট দেখতে পায়। বৃটিশরা তাদের কয়েকখানি ইউ-বোট নিয়ে এই গাংচিলগুলিকে বেশ শিক্ষা দিতে লাগল। সাধারণতঃ এই পাখীগুলি ষ্টীমারের ওপর হতে যে সব উচ্ছিষ্ট বা পরিত্যক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি জলে ফেলে দেওয়া হয় তা খাবার জন্য ষ্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের বহুদূর অবধি চলে যায়। এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করে বৃটিশ ইউ-বোটগুলি জলের নীচ হতে মাঝে মাঝে ওপরে ভেসে উঠে এই গাংচিলগুলিকে খুব ভাল ভাল খাদ্য দিয়ে এমন প্রলুব্ধ করে তুল্‌ল যে, জলের নীচে সাব-ম্যারিণ দেখলেই তারা খাবারের লোভে তার পিছু নিত ও তার

ঠিক ওপরে উড়তে থাকত। ভাল ভাল খাবার পাবার প্রলোভনে এই গাংচিলগুলির তখন কাজ হ'ল জলের নীচে কোথায় ইউ-বোট আছে তা খুঁজে বার করে তার অনুসরণ করা। এই ভাবে গাংচিলকে উড়তে দেখ্‌লেই, সেখানে ইউ-বোট আছে জানতে পেরে ইউ-বোট-শিকারী ক্ষিপ্রগতি বোটগুলি ছুটে এসে বোমা ছুঁড়ে তার ধ্বংস সাধন করত। ইংলণ্ডের ইউ-বোটের নাবিকরা সমুদ্রের জলসিংহগুলিকেও (Sea Lions) ঠিক এই উপায়ে মাছ খাইয়ে এমন প্রলুব্ধ করে তুলল যে তারাও সমুদ্রনিম্নে ইউ-বোট দেখলে তার পিছু পিছু সাঁতরাতে সুরু করত এবং এইভাবে ইউ-বোটের অবস্থিতি স্থান ইংরেজদের জানিয়ে দিত। সাবম্যারিণ খুঁজে বার করার আর একটি বিশেষ সুবিধা হ'ল সিপ্লেনের (Sea plane) সাহায্যে। এই সিপ্লেনগুলি এমনভাবে তৈরি হয় যে তা এরোপ্লেনের মতন আকাশে উড়ে যেমন চলতে পারে, আবার তেমন জলের ওপর দিয়েও বেশ চলাফেরা করতে পারে। সিপ্লেনগুলি সমুদ্রের উপকূলের কাছ দিয়েই চলাফেরা করে। সিপ্লেনের লোকেরা ওপর থেকে সমুদ্রজলের প্রায় ৭০ ফিট্ নীচ পর্যান্ত বেশ দেখতে পায়, অবশ্য যখন সমুদ্র শান্ত অবস্থায় থাকে। সিপ্লেনগুলি ইউ-বোট দেখতে পেলেই তা ধ্বংস করবার জন্য ইউ-বোট-শিকারী বোটকে সঙ্কেতের দ্বারা জানিয়ে দিত। তাই সিপ্লেনের ভয়ে সাবম্যারিণকে উপকূল হতে বহুদূরে থাকতে হত।

জার্ম্মান সাবম্যারিণ যখন মিত্রপক্ষের বড় বড় বাণিজ্যপোত-গুলিকেও বিনষ্ট করতে আরম্ভ করল, তখন এই বাণিজ্যপোতগুলিকে ইউ-বোটের আক্রমণ হতে রক্ষা করবার জন্য নানা রকম উপায় অবলম্বন করা হয়। তখন বাণিজ্যপোতগুলিকে এমন রঙে চিত্রিত করে দেওয়া হল যে, সমুদ্রের ওপরে তাদের লক্ষ্য করবার আর উপায়

সিপ্লেন (Sea-plane)

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—১৮০ পৃঃ

রইল না। তারা সোজাভাবে না চলে এঁকে বেঁকে অগ্রসর হতে লাগল। এঁকে বেঁকে চলবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ঐ ভাবে চললে ইউ-বোটের পক্ষে তাদের প্রতি টরপিডো নিক্ষেপ করা অসম্ভব হ'ত, কারণ ইউ বোটকে টরপিডো ছুঁড়তে হ'ত চলন্ত জাহাজের ঠিক অগ্রভাগ লক্ষ্য করে। বাণিজ্যপোতগুলি আর এক উপায়ে আত্মগোপন করত। চলবার সময় এই জাহাজগুলি এমন কৃষ্ণবর্ণ ধোঁয়া উদগীরণ করতে করতে চলত যে, সেই ধোঁয়ার ঘনকৃষ্ণ যবনিকার ভিতর দিয়ে তাদের লক্ষ্য করা সাবম্যারিণের অসাধ্য হয়ে উঠত। তা ছাড়া এই জাহাজগুলি চলবার সময় আলকাতরা ও একরূপ রাসায়নিক মিশ্রণ চারদিকে ঢেলে দিতে দিতে চলত, যা'তে ষ্টীমারের পশ্চাতে সমুদ্রোপরি একটি আবরণ সৃজিত হয়ে তাদের একেবারে আড়াল ক'রে রাখে। এই তৈলাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে ইউ-বোটের পরিবীক্ষণ যন্ত্রের উপরকার কাচখানাও এমন আচ্ছন্ন হয়ে যেত যে, তার ভিতর দিয়ে তখন আর কিছুই দেখা যেত না।

বড় বড় যুদ্ধজাহাজগুলিতে একরকম "শেল" (Shell) ব্যবহৃত হত যা নিক্ষেপ করলে সোজাভাবে জলের নীচে চলে গিয়ে, তা ইউ-বোটকে এমন প্রচণ্ড বেগে আঘাত করত যে, অনেক সময়ে ইউ-বোট তাতে চূর্ণিত হয়ে যেত। আর একরকম বোমা পরে তৈরি হয় যার নাম "অ্যাস্ ক্যান" (Ash Can)। এই অ্যাসক্যান্‌গুলি যখন বড় বড় যুদ্ধজাহাজের পেছনদিক হতে, নীচেকার ইউ-বোট লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হত, তখন তা নিমেষে জলের অনেক নীচে চলে গিয়ে ইউ-বোট হতে ১০০ ফিটের মধ্যে যে কোন জায়গায় বিদীর্ণ হয়ে তাকে একেবারে অতল জলধিগর্ভে ডুবিয়ে দিত। অ্যাস্‌ক্যানগুলি ঠিক জায়গায় অনেক সময় বিদীর্ণ হতে না পারলেও তার সামান্য আঘাতই সাবম্যারিণকে অচল করে দিত। একবার ঠিক এইরকম

একটি অ্যাস্‌ক্যানের সামান্য আঘাতে একখানি ইউ-বোটের বৈদ্যুতিক আলো সব নিবে যায়। বোটের নাবিকরা তখন অন্ধের মতন হয়ে যায় ও ইউ-বোটকে জলের ওপর তুলে আনতে কাপ্তানকে বাধ্য করে। বোটখানা ভেসে উঠবার পরেই, বোটের ছাদের চাপদরজাটা খুলে যায় এবং নাবিকরা বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে হাততুলে যুদ্ধ জাহাজের কাপ্তানের কাছে সকলে আত্মসমর্পণ করে।

এই ইউ-বোট মিত্রপক্ষের মনে এমন ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছিল যে, ইউ-বোটকে জব্দ করবার এত সব উপায় বার করেও তারা নিজেদের নিরাপদ মনে করতে পারল না। সমস্ত বৈজ্ঞানিক মিলে এবার এমন কোন যন্ত্রের উদ্ভাবন করবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করলেন যাতে বহুদূর হতেও ইউ-বোটের অবস্থিতি নির্ণয় করা যেতে পারে। অবশেষে মার্কিণরাজ্যের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিলে হাইড্রোফোন (Hydrophone) যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে বহু মাইল দূরবর্ত্তী ইউ-বোটের অবস্থিতি ও গতিবিধি নির্ণয় করা সম্ভব হ'ল। বড় বড় যুদ্ধজাহাজ চলবার সময় সাবম্যারিণের ইঞ্জিনের কম্পন এই হাইড্রোফোনে ধ্বনিত হয়ে উঠত, আর এইরূপ শব্দ ইউ-বোটের দূরত্ব অনুযায়ী উচ্চতর অথবা ক্ষীণতর হয়ে শোনা যেত। এই যন্ত্রের সাহায্যে ইউ-বোট আবিষ্কার করে তা বিনষ্ট করা যুদ্ধজাহাজের পক্ষে অনেকটা সহজ হয়ে উঠল।

বিগত যুদ্ধের সময় শত্রু-সপ্তরথীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বীরশিশু সাবম্যারিণের পরাজয় হল।

সাবম্যারিণ সম্বন্ধে মোটামুটি তোমাদের অনেক কথা বলা হ'ল। তোমরা বড় হয়ে এসম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানতে পারবে।

বিদ্যুতের কথা

বিদ্যুতের প্রকাশ আজ তোমরা সকলেই তোমাদের চারদিকে দেখতে পাচ্ছ। এই বিদ্যুতের সাহায্যে মানুষের কত রকমের কাজ যে চলছে তার ইয়ত্তা নেই। বিদ্যুতের সাহায্যে এখনকারদিনে আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে, ট্রাম চলছে, টেলিগ্রাফের খবর যাওয়া আসা করছে, টেলিফোনে কথাবার্ত্তা চলছে ও নানা জায়গায় রেলগাড়ীও চলছে। আরও কত রকমের কাজ যে মানুষ এই বিদ্যুতের অদ্ভুত শক্তির সাহায্যে সহজে সম্পন্ন করে নিচ্ছে তার আর কি বলব।

কিন্তু মানুষের নানাবিধ কাজে এই বিদ্যুতের বিচিত্র খেলা যেমন আমরা দেখছি, তেমন আমাদের মনে এ প্রশ্ন স্বতঃই জেগে ওঠা স্বাভাবিক যে, এই যে অসীম শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ, একে মানুষ কি করে প্রথম জানলে এবং কি উপায়ে তাকে এমন নাগপাশে বদ্ধ করে এত সব কাজ করিয়ে নেবার কৌশল বার করলে।

বহু শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন গ্রীকেরা একটি বিষয় লক্ষ্য করে, যে একটুক্‌রা তৈলস্ফটিককে (amber) কিছুক্ষণ ঘষলে, তৈলস্ফটিকের টুকরাটি এমন একটি অপূর্ব্ব শক্তিলাভ করে যে তার কাছে হালকা যে কোন পদার্থ—যেমন ঘাসের টুকরা কিম্বা পাখীর পালক প্রভৃতি, রাখলে তা সব ইহা টেনে নিয়ে আসে।

তারা এই amber এর নাম হতে এই বৈদ্যুতিক শক্তির নামকরণ করলেন ইলেক্‌ট্রিসিটি (Electricity)। গ্রীকভাষায় "য়্যামবারের" আর এক নাম হল "ইলেকট্রোন"। গ্রীসের লোকেরা এই সামান্য ব্যাপার ছাড়া বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানতে পারেন নি।

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের রাজত্বের সময় গিল্‌বার্ট নামক এক ব্যক্তি এমন কতকগুলো পদার্থের এক তালিকা প্রস্তুত করলেন যা' ঘষলেই, তার মধ্যে এই রহস্যময় বিদ্যুতের আবির্ভাব হয়। কিন্তু ১৭৩৩ সালে দুফে (Du Fay) নামক একজন ফরাসী প্রথম বিদ্যুৎ সম্বন্ধে এই সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন যে, প্রায় সমস্ত পদার্থেই এই বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার করা যায়, যদি কোন উপায়ে সে সমস্ত পদার্থকে সমস্ত সংযোগমুক্ত (insulate) করা যায়। দুফেই আবার এই তথ্যেরও প্রচার করেন যে, দুই প্রকারের বিদ্যুৎ আছে। এক রকম বিদ্যুতের সঞ্চার হয় কাচের সাহায্যে, ও আর এক রকম বিদ্যুতের প্রভব হয় গালার সাহায্যে। তিনি আরও প্রমাণ করেন যে কোন কোন পদার্থের ভিতর দিয়ে এই তড়িৎ খুব সহজে ও দ্রুতবেগে চলাচল করতে পারে, ও তার গতি এই সমস্ত পদার্থকে অবলম্বন করে দুর্নিবার হয়ে ওঠে—যেমন ধাতু, জল, নুন, ক্ষার পদার্থের কোনরূপ জলীয় মিশ্রণ, পশুদের শরীরাদি ও এই পৃথিবী। আবার অন্য কতকগুলো জিনিষ আছে যার ভিতর দিয়ে এই তড়িৎ মোটেই চলাফেরা করতে পারে না। এসব জিনিষ দেখলেই যেন বিদ্যুৎ থমকে দাঁড়ায়—একেবারে যেন কাবু হয়ে যায়। এই অমিততেজসম্পন্ন বিদ্যুৎ, এসব পদার্থের সংস্পর্শে এসে যেন এক মায়াজালে জড়িত হয়ে পড়ে—তার সব শক্তি মুহূর্ত্তে হারিয়ে ফেলে।

যে সব পদার্থের ভিতর দিয়ে এই বিদ্যুৎ নির্ব্বিবাদে চলাফেরা করতে পারে তাদের বলা হয় তড়িৎ-সঞ্চালক (Good Conductor), আর যে সব পদার্থের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাফেরা করতে পারে না তাদের বলা হয় তড়িৎ-রোধক (Bad Conductor)।

দুফের এই আবিষ্কারের কিছুকাল পরে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা

এই বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আর একটি নূতন সত্যের পরিচয় লাভ করলেন। সেই সত্যটি হচ্ছে এই যে, ডুফের আবিষ্কৃত এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির বিদ্যুৎ একসঙ্গে, একই পদার্থে বর্তমান থাকে। ঘর্ষণ দ্বারা এই দুই রকমের বিদ্যুৎ পরস্পর হতে বিযুক্ত হয়ে ভিন্নরূপে প্রকাশ পায় মাত্র।

বোষ্টনের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন এই দুই রকমের বিদ্যুতের নাম দিলেন ধনাত্মক বিদ্যুৎ (Positive Electricity) ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ (Negative Electricity)।

ইহার পরে লিডেনের কোন অধ্যাপক লিডেন তড়িৎপাত্র (Leyden jar) উদ্ভাবন করেন। এই লিডেন তড়িৎপাত্রে বহু পরিমাণ বিদ্যুৎ একসঙ্গে সঞ্চিত করে, তা' আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হল। লিডেন পাত্রটি তৈরি হল একটি স্ফটিক পাত্রের ভিতর দিক ও বাইরের দিক পাতলা টিনের পাতে আবৃত করে। যখন এই লিডেন পাত্রটিকে তড়িৎপূর্ণ করে তোলা হয়, তখন এই সঞ্চিত তড়িৎ সেই পাত্রে আবদ্ধ হয়ে থাকে যতক্ষণ না ঐ পাত্রের ভিতরকার ও বাইরের টিনের পাত দুটিকে কোন একটি ধাতুনির্মিত তারের দ্বারা, কি অন্য কোন একটি তড়িৎ-সঞ্চালকের দ্বারা সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। এইরূপ একটি লিডেন পাত্র একহাতে কেউ ধরে, যদি আর এক হাত দিয়ে সেই পাত্রের ভিতরকার টিনের পাতের সহিত সংযুক্ত বাইরের ক্ষুদ্র গোলকটি (Knob) স্পর্শ করে, তবে হঠাৎ তার ভয়ানক আঘাত লাগবে।

যিনি এই লিডেন পাত্রটি উদ্ভাবন করলেন, তিনি একদিন এই পাত্রটিকে বিদ্যুৎপূর্ণ করে, নানাভাবে তাকে পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে এমন এক বিষম আঘাত পেলেন যে, তিনি তাতে ভয়ে একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন।

এই ঘটনার পরেই তিনি বলেন যে, যদি কেউ তাঁকে লক্ষ টাকাও দিতে চান তবুও তিনি এইরূপ তড়িৎপূর্ণ পাত্র নিয়ে আর কখনও নাড়াচাড়া করবেন না। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর এই ভয় কেটে গেল, এবং তিনি পরে খুব সাবধানতার সহিত এমন একটি লিডেন পাত্র তৈরি করলেন, যাতে সেই পাত্র হতে আর ভয়ানক রকমের কোন আঘাত না লাগতে পারে। এই পাত্রটি এবার এমন কৌশলের সহিত তৈরি হল যে, অনেকে সখ করে এই বিদ্যুৎপাত্রের এক আধটু আঘাত নিতে চারদিক থেকে আসতে আরম্ভ করল। পরে এই পাত্রটি সকলের পক্ষে একটি খেলার জিনিষের মত হয়ে উঠল।

বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ইতিহাসে, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন একটি বড় রকমের ঘুড়ির সাহায্যে একটি নূতন সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, মেঘের বিদ্যুৎ এবং ঘর্ষণজনিত বিদ্যুৎ স্বরূপত একই জিনিষ।

তোমরা ঘুড়ির কথা শুনে বোধ করি অবাক্ হচ্ছ। তোমরা ভাবছ ঘুড়ি ত সকলেই ওড়ায়, ও তা উড়িয়ে কেবল ওড়াবার আনন্দটুকু মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তার দ্বারা কোন সত্যের আবিষ্কার কি করে সম্ভব হয়! কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলিনের ঘুড়িখানি ছিল একটু অসাধারণ রকমের। তিনি নিজেই সেই ঘুড়িখানি খুব বুদ্ধি করে তৈরি করেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ একদিন একটি অপূর্ব্ব খেয়াল তার মাথায় উদয় হয়। খেয়ালটি মাথায় আসা মাত্র, তিনি সেই খেয়াল মত কাজ সুরু করলেন। তিনি খুব যত্নের সহিত রেশমী কাপড়ের একখানি ঘুড়ি তৈরি করলেন, এবং ঐ ঘুড়ির মাথায় একখানি সরু তার লাগিয়ে দিলেন। পরে ঐ ঘুড়ির সঙ্গে খুব লম্বা একখানি পাটের সুতো বেঁধে দিয়ে সেই সুতোর একেবারে নীচের প্রান্তে একটি ধাতুনির্ম্মিত চাবি বেশ
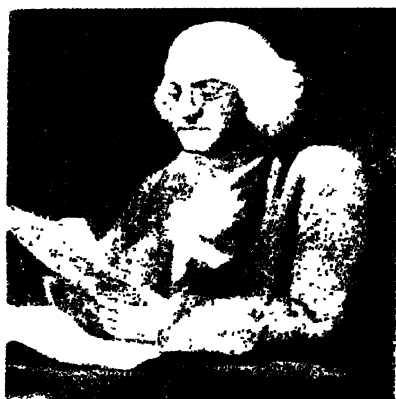
শক্ত করে এঁটে দিলেন, ও একখানি রেশমী ফিতে তা'র নীচের দিকটায় বেঁধে নিলেন। তিনি ভাবলেন যে, যদি তাঁর ধারণা ঠিক হয়, অর্থাৎ মেঘের বিদ্যুৎ ও লিডেন পাত্রের আবদ্ধ বিদ্যুৎ একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র হয়, তবে মেঘের তড়িৎ তাঁর ঘুড়ির সূতোকে আশ্রয় করে নীচে নেমে আসবে, এবং তিনি সূতোর নীচে যে ধাতু নির্ম্মিত চাবিটি এঁটে দিয়েছেন তা' হতে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ নির্গত করতে পারবেন। তিনি স্থির করলেন, রেশমের ফিতেখানি তিনি ধরে থাকবেন ও রেশমের ফিতে তড়িৎরোধক বলে, মেঘ থেকে ঘুড়ির সূতোর ভিতর দিয়ে যে বিদ্যুৎপ্রবাহটি নেমে আসবে, তা তাঁর শরীরের ভিতর দিয়ে গিয়ে মাটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

ফ্র্যাঙ্কলিন খুব ব্যাকুলভাবে এমন একটি শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় রইলেন যখন তাঁর এই অদ্ভুত ঘুড়ির সাহায্যে তাঁর মতবাদটি ভাল করে পরীক্ষা করতে পারবেন।

একদিন হঠাৎ চারদিক ঘনঘটা করে অন্ধকার হয়ে এল, এবং দেখতে দেখতে খুব এক ঝড় উঠল। সেই ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজলীর চমক ও বাজের ভীষণ শব্দে মনে হল আবার আকাশরাজ্যে দেবাসুরের সংগ্রাম বুঝিবা সুরু হল। এমন সময় ফ্র্যাঙ্কলিন ও তাঁর পুত্র সেই ঘুড়িখানি নিয়ে একটি খোলা মাঠের মধ্যে এসে একটি চালার নীচে আশ্রয় নিলেন। তিনি সেই ঝড়ে তাঁর অপূর্ব্ব ঘুড়িখানি উড়িয়ে দিলেন। ঝড়ের বেগে ঘুড়িখানি নিমেষে বহুঊর্দ্ধে উঠে উড়তে লাগল। এমন সময় একখানি কাল মেঘ তাঁর ঘুড়িখানিকে যেন প্রায় স্পর্শ করে চলে গেল। তিনি তাতে এমন কিছুই লক্ষ্য করলেন না। কিন্তু দ্বিতীয় বার একখানি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ তাঁর ঘুড়ির দিকে অগ্রসর হয়ে আসতেই ফ্র্যাঙ্কলিন্ দেখতে পেলেন, তাঁর ঘুড়ির পাটের সূতোর আঁশগুলি হঠাৎ

সব খাড়া হয়ে উঠে নড়তে লাগল। এবার তিনি তাঁর আঙ্গুলের গাঁট সেই ধাতুনির্ম্মিত চাবিটির কাছে নিতেই দেখতে পেলেন যে, চাবি হতে একটি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এসে তাঁর হাতের ওপর লাফিয়ে পড়ল। এই সময় ঝড়ের সঙ্গে খুব বৃষ্টিও আরম্ভ হল। বৃষ্টির জলে ঘুড়ির সুতোখানি ভিজে যাওয়াতে তা' এখন আরও ভালরূপে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করতে লাগল, এবং এবার ফ্রাঙ্কলিনও অনেক দীর্ঘতর স্ফুলিঙ্গ তাঁর সেই চাবি হতে পেতে সমর্থ হলেন।

এই নূতন সত্য আবিষ্কার করে ফ্রাঙ্কলিনের মনে আর আনন্দ ধরে না। তিনি তাড়াতাড়ি একটি লিডেন পাত্র নিয়ে এসে তাতে এই মেঘের বিদ্যুৎ সঞ্চিত করে রাখলেন। তিনি পরে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, এই মেঘের বিদ্যুতের দ্বারা তাঁর যন্ত্রসঞ্চিত ঘর্ষণজনিত বিদ্যুতের মতন সকল কাজই করা যায়। পরীক্ষার দ্বারা তিনি নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করলেন যে, মেঘের বিদ্যুৎ ও ঘর্ষণজনিত বিদ্যুৎ একই জিনিষ।

একটি ঘুড়ি তৈরি করে মেঘের অন্তর্নিহিত বিদ্যুতকে এমন অভিনব উপায়ে পরীক্ষা করা যায়, এই মতলবটি কি করে ফ্রাঙ্কলিনের মাথায় প্রথম উদয় হল একথা বোধ করি তোমাদের অনেকের জানতে ইচ্ছা করছে। একথা তোমাদের পরে বলব। ফ্রাঙ্কলিন নানা রকম পরীক্ষা কার্য্য করে দেখতে পেলেন, বিদ্যুৎ যে ঘর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন হয় তা নয়, কিম্বা অন্য কোন কৃত্রিম উপায়েও যে তা উৎপন্ন হয় তাও নয়; কিন্তু বিদ্যুৎ স্বাধীনভাবে প্রত্যেক পদার্থেই বিদ্যমান থাকে। বিদ্যুৎ সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কলিনের মোটামুটি মতবাদ হল এই যে, সমস্ত বস্তুতেই তা বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু তা এমন অবস্থায় থাকে যে, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতে পারে না। এই যে স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যুৎ প্রত্যেক

বস্তুতে থাকে, তার এই অবস্থাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় অবস্থা (Neutral State)। বিদ্যুৎ যেন প্রত্যেক বস্তুতে ঘুমিয়ে থাকে, আর ঘর্ষণ দ্বারা আমরা তাকে দিই শুধু জাগ্রত করে।

একরকমের বস্তু আছে যেমন স্ফটিক, যা ঘর্ষণ দ্বারা অতিরিক্ত পরিমাণে বিদ্যুন্ময় হয়ে ওঠে, আবার অন্য কতকগুলো বস্তু আছে যেমন লাক্ষা ও রজন প্রভৃতি, যা' ঘর্ষণ দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে তড়িন্ময় হয়ে ওঠে। একরকমের বস্তু এই প্রক্রিয়ার দ্বারা কিছু অত্যধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ লাভ করে, আবার অন্যরকমের পদার্থ হ'তে এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎ অপসৃত হয়। আর এই ভাবে দুরকমের বস্তুতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ হয় ঠিক উল্টো প্রকৃতির। তোমরা নিজেরাই এবিষয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পার। একটি কাঁচদণ্ড রেশমের কাপড় দিয়ে ঘসে' তার নিকট এক টুকরা শোলা নিয়ে গেলেই দেখতে পাবে, তা' সেই শোলার টুকরাটিকে আকর্ষণ করে নেবে। আবার তখনই যদি একটি লাক্ষাদণ্ডকে ফ্লানেল কাপড় দিয়ে ঘসে তা সেই শোলার টুকরাটির কাছে নিয়ে যাও, তবে দেখবে তা সেই শোলার টুকরাটিকে কাছে না টেনে, তাকে দূরে ঠেলে দেবে। ফ্র্যাঙ্কলিন এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতির বিদ্যুৎকে ধনাত্মক (Positive) ও ঋণাত্মক (Negative) এই দুই নামে অভিহিত করেন। এবার তিনি লিডেন পাত্রের সাহায্যে একটি ব্যাটারি (Battery) নির্ম্মাণের উপায় উদ্ভাবন করলেন। অনেকগুলো লিডেন পাত্র পাশাপাশি স্থাপন করে, প্রত্যেকটির ভিতরকার পাতটি ঠিক তার পরেরটির বাইরের পাতের সহিত সংযুক্ত করে দিয়ে তিনি একটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারি নির্ম্মাণ করলেন, ও তাঁর এই ব্যাটারি হতে তিনি খুব বড় রকমের বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ পেতে সমর্থ হলেন।

বিজ্ঞানজগতে ফ্র্যাঙ্কলিনের সব চাইতে বড় আবিষ্কার হচ্ছে মেঘের বিদ্যুৎ সম্বন্ধে তিনি যে বড় সত্যটি আবিষ্কার করেন তা। সে সত্যটি হচ্ছে এই যে, মেঘের বিদ্যুৎ ও ঘর্ষণজনিত বিদ্যুৎ একই জিনিষের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র।

মেঘের বিদ্যুৎ ও বাজের শব্দ সম্বন্ধে পূর্ব্বে নানা দেশের লোকের নানা রকমের অদ্ভুত ধারণা ছিল। আমাদের দেশেও এই বাজের শব্দ ও বিজলী সম্বন্ধে তোমরা অনেকে বোধ করি তোমাদের ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমার মুখ হতে অনেক গল্প শুনেছ। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এরকম সব আজগুবী ধারণা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাচ্ছে।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের পূর্ব্বে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে, মেঘে একরকমের গ্যাস্ (gas) আছে না জ্বলে উঠে বিজলীরূপে প্রকাশ পায়। ফ্র্যাঙ্কলিন দেখালেন যে এইরূপ ধারণা বড়ই ভ্রমাত্মক। তিনিই এই মেঘের বিদ্যুতের সত্য পরিচয়টি লাভ করে তা প্রথম প্রচার করেন ও আগেকার দিনের ভ্রমাত্মক ধারণাটির অপনোদন করেন।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কলিন যখন বোষ্টনে ছিলেন, তখন বিদ্যুৎ সম্বন্ধে সেখানকার বৈজ্ঞানিকদের কতগুলো পরীক্ষাকার্য্য দেখে, সে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করবার জন্য তিনি বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তখনও সেলের (cell) সাহায্যে বিদ্যুৎ সঞ্চার করবার উপায় উদ্ভাবিত হয়নি। তখন ঘর্ষণজনিত বিদ্যুতের সঙ্গেই শুধু সকলের পরিচয় হয়েছিল।

বোষ্টনে, ফ্র্যাঙ্কলিন বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষাগারে যেসব যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তির নানা রকমের ক্রিয়া দেখেন, ঠিক সেই রকমের যন্ত্রাদি কোন উপায়ে সংগ্রহ করে নিজেই এবার তিনি বিদ্যুৎ সম্বন্ধে নানা রকমের পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ করলেন।

তিনি এই সমস্ত যন্ত্রাদি নিয়ে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত হলেন, এবং আরও উৎকৃষ্টতর যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি অচিরে এমন একটি সুন্দর যন্ত্র তৈরি করলেন যাতে তাঁর পক্ষে আরও দীর্ঘতর বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ লাভ করা সহজ হয়ে উঠল। এই স্ফুলিঙ্গগুলিকে মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করে দেখে তাঁর এই মনে হ'ল যে, মেঘের বিজলী ও তাঁর যন্ত্রোত্থিত বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ এদুটির রূপ ও প্রকৃতি যেন একই রকমের। তিনি ভাবলেন যে, মেঘের বুকে যে বিজলী খেলে বেড়ায় তা' হয়ত তাঁর যন্ত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গরাজির সুবৃহৎ আকার মাত্র।

যতই তিনি ধীরভাবে, ও একান্তচিত্তে এ সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন, ততই তাঁর মনে এই ধারণা দৃঢ়তর হ'তে লাগল যে এ দুটি জিনিষ স্বরূপত একই বস্তু। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে, তিনি এই দুটি জিনিষের মধ্যে যে সব সামান্যধর্ম্ম লক্ষ্য করেন তার একটি তালিকা প্রকাশ করেন। তিনি দেখালেন যে তাঁর যন্ত্র হ'তে যে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ নির্গত করা যায় তা' যেমন ঠিক সোজাভাবে না চলে এঁকেবেঁকে চলে, মেঘের বিদ্যুতের গতিও ঠিক সোজা নয় কিন্তু বক্র ও কুঞ্চিত। তীক্ষ্ণাগ্র জিনিষ মাত্রই যেমন যন্ত্রসঞ্চারিত তড়িৎকে আকর্ষণ করে, মেঘের বিদ্যুৎও তেমন উচ্চশীর্ষ পর্ব্বত, উচ্চ বৃক্ষ, গম্বুজ, জাহাজের মাস্তুল, গৃহাদির উপরিস্থিত ধূমনালী প্রভৃতিকেই সচরাচর আঘাত করে। মেঘের বিদ্যুতের আঘাতে যেমন জীবজন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যন্ত্রোদ্ভূত তড়িৎশক্তি যখন খুব প্রবল হয় তখন তার আঘাতেও জীবজন্তুর মৃত্যু হয়। তিনি বল্লেন যে বাজের ভীষণ শব্দটাও, তাঁর যন্ত্রে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ প্রকাশের সময় যে ক্ষুদ্র শব্দ হয় তারই সুবৃহৎ রূপ।

ফ্র্যাঙ্কলিন এসম্বন্ধে বলেন যে, দুটি ছোট বন্দুকের নলকে যদি বিদ্যুন্ময় করে দুই ইঞ্চি দূরে স্থাপিত করা যায়, তবে সে দুটোর যোগজনিত শব্দটি যদি বেশ বড় রকমের হয়, তবে যোজনব্যাপী বিদ্যুৎময় মেঘমালার পরস্পর সংযোগ জাত শব্দ কি পরিমাণ উচ্চ ও বিকট হতে পারে তা' সহজে কল্পনা করা যায়।

অনেক বৈজ্ঞানিকই তাঁর এই সিদ্ধান্ত খুব যুক্তিযুক্ত বলে মনে করলেন। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলিন তাতে সন্তুষ্ট থাকতে না পেরে তাঁর এ মতই যে ঠিক তা' পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হলেন।

তিনি অবিলম্বে এই সিদ্ধান্তটি প্রমাণ করবার জন্য একটি উপায় ভেবে নিলেন। তিনি ভাবলেন যে, সমগ্র মেঘমালাই যখন বিদ্যুৎসম্পন্ন, তখন এই মেঘের বিদ্যুৎকে কোন সূক্ষ্মাগ্র বস্তুর সাহায্যে টেনে নীচে নিয়ে আসা সম্ভব। তিনি স্থির করলেন এমন একটি উচ্চপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করবেন যার সমুচ্চ গম্বুজটি গিয়ে ওপরের মেঘমালাকে স্পর্শ করবে। এই রকমের একটি গম্বুজ নির্ম্মাণকল্পে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা নানা জায়গায় এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করে অর্থ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

যখন ফ্র্যাঙ্কলিন বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে দু'জন ফরাসী, দু'টি লৌহনির্ম্মিত উচ্চ দণ্ডের তলদেশ হতে ঝড়ের সময় বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ লাভ করতে সমর্থ হন। ফ্র্যাঙ্কলিন এই সংবাদ শুনে ভাবলেন যে, এদুটি লৌহদণ্ড যখন একশ ফিট উচ্চও ছিল না, তখন তা মেঘমালা হতে অবশ্য অনেক নীচেই ছিল। এই কারণে সেই স্ফুলিঙ্গই যে মেঘের বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ তার প্রমাণ হল না। এদু'টি দণ্ডে হয় ত অন্য কোন উপায়ে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়েছিল। এই সময়ে তাঁর মনে হঠাৎ একটি অভিনব বুদ্ধি জেগে উঠল। তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে খুব উচ্চ গম্বুজ তৈরি না করে আরও সহজ উপায়ে মেঘ

হতে বিদ্যুৎ আকর্ষণ করে নেওয়া যেতে পারে। তিনি স্থির করলেন যে, একটি বড় রকমের ঘুড়ির সাহায্যে মেঘ হতে বিদ্যুৎ টেনে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন। এই ঘুড়ির কথা তোমাদের আগেই বলেছি।

ফ্র্যাঙ্কলিন যখন মেঘের বিদ্যুৎ ও ঘর্ষণজনিত বিদ্যুৎ একই জিনিষ এই সত্য প্রমাণের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, ও সে সম্বন্ধে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটিতে (Royal Society) এক সুন্দর ও সারবান প্রবন্ধ পড়লেন, তখন সেই সোসাইটির কয়েকজন সদস্য তাঁর এসব কথা শুনে হাসলেন ও তাঁকে নানারকম বিদ্রূপ করতেও ছাড়লেন না। কিন্তু ইউরোপের অনেক বড় বৈজ্ঞানিক তাঁর আবিষ্কৃত এই নূতন সত্য শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করলেন। ফ্র্যাঙ্কলিনের এই প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিক জগতে একটি উত্তেজনা ও আলোড়নের সৃজন করে তোলে। এই নূতন সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে সব ভয়াবহ পরীক্ষাকার্য্যে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাতে যে তাঁর মৃত্যু হয়নি ইহা বড়ই আশ্চর্য্য।

এই নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ফ্র্যাঙ্কলিন অশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। এই বিষয়ে তাঁর সফলতার ফলস্বরূপ, বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আরও অধিকতর জ্ঞানলাভ করবার জন্য সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের মনে এক অমিত উৎসাহের সঞ্চার হয়। পরে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আরও কত রকমের গবেষণা ও কত অসংখ্য রকমের পরীক্ষাকার্য্য হয়েছে তা তোমরা বড় হয়ে সব জানতে পারবে।

এই অলৌকিক বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে মানুষ আজ অসীম শক্তিমান হয়ে উঠেছে। আজ এই শক্তির সাহায্যে কত কঠিন ও বিস্ময়কর কাজ যে মানুষ অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করছে তার ইয়ত্তা নেই।

বৈদ্যুতিক আলো ও তোমাস্ য়্যালভা এডিসন্

আজকাল বৈদ্যুতিক আলোর খেলা আমরা চারদিকে দেখতে পাই। বড় বড় সহরের বাড়ীঘর, পথঘাট, থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি সব জায়গা এই বিজলীবাতির আলোতে আলোময় করে তোলবার বন্দোবস্ত এখন হয়েছে। এখনকার দিনে আলোর 'সুইচ্‌টা' টিপলেই যে অমনি ঘরের আলোটি নিমিষে জ্বলে উঠে, এরকম সুবিধা বছর চল্লিশ পূর্ব্বে ছিল না। যে মনীষী বিদ্যুতের সাহায্যে ঘর-বাড়ী আলোকিত করে তোলবার প্রথম প্রস্তাব করেন, তাঁকে চল্লিশ বছর আগেকার লোকেরা পাগল বলে ভেবেছিল। তাঁর এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে প্রথম সকলে হেসেই অস্থির হল। সকলে ভাবলে লোকটির মাথাটি নিশ্চয় রীতিমত বিগ্‌ড়ে গেছে। কিন্তু এই মনস্বী পুরুষ সমগ্র ঠাট্টা-বিদ্রূপ তুচ্ছজ্ঞান করে তাঁর এই সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করবার জন্য একনিষ্ঠচিত্তে সাধনায় নিযুক্ত হলেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের দ্বারা যা' সকলে অসম্ভব ভেবেছিল, তাকে করে তুললেন তিনি সম্ভব, যা' সকলের স্বপ্নাতীত ছিল তাকে করে তুললেন দেদীপ্যমান বাস্তব।

এই মনস্বীর নাম তোমাস্ য়্যালভা এডিসন্। এডিসন্ যে শুধু বৈদ্যুতিক আলোর উদ্ভাবনকর্ত্তা তা' নয়, তিনি তা' ছাড়া আরও নানা রকম উদ্ভাবনকার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করে জগতে অমরকীর্ত্তি অর্জ্জন করে গেছেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এডিসন্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর

এডিসন

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—১২২ পৃ

পিতা একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন ও তাঁর মাতা স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতেন। বাল্যকালে এডিসনের শরীরটি একটু রোগা মতন ছিল ও তাঁর মাথাটি ছিল একটু অস্বাভাবিক রকমের বড়। এডিসনের স্বভাবটি ছিল কেমন একটু অসাধারণ গোছের। অনেক সময় তাঁর নানাবিধ প্রশ্নের দ্বারা তিনি বয়স্কদের অস্থির ও উত্যক্ত করে তুলতেন, ও কোন প্রশ্নের উত্তর পেয়ে তা' বিশ্বাস করতেন না, যতক্ষণ না তিনি নিজের বুদ্ধিতে তা' পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারতেন। এডিসনের মাথাটি একটু অস্বাভাবিক রকমের বড় দেখে ডাক্তাররা মনে করেন তাঁর মস্তিষ্কের অবস্থা ঠিক সুস্থ ও স্বাভাবিক হবে না। একবার একজন শিক্ষক এডিসন্ সম্বন্ধে এই ভাবের একটি মত প্রকাশ করেন যে, এডিসন্ বড়ই হাবা ও স্থূলবুদ্ধি। শিক্ষকের এই মন্তব্যের কথা শুনে এডিসনের মাতা তাঁকে স্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে এসে, বাড়ীতে নিজেই সযত্নে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে মাতা ও পুত্র একসঙ্গে অনেক ভাল ভাল বই পড়ে ফেললেন। এডিসনের পিতাও এডিসনকে পড়াশুনায় উৎসাহ দেবার জন্য এমন এক নিয়ম করে দিলেন যে, কোন ভাল পুস্তক এডিসন্ পড়লেই তার জন্য পুরস্কার স্বরূপ তিনি কিছু পয়সা পাবেন। পয়সার লোভে অল্প সময়ে এডিসন্ অনেক ভাল ভাল বই পড়ে ফেললেন। এডিসনের পিতামাতার উৎসাহ ও যত্নে বাল্যকাল হতেই তাঁর বেশ পড়াশুনা করবার, ও স্বাধীনভাবে কোন বিষয় চিন্তা ও বিচার করবার অভ্যাস হয়ে যায়।

বাল্যকালে দুরন্তপনার জন্য এডিসনের জীবন অনেকবার বিপদাপন্ন হয়েছিল। একবার তিনি বাঁদরামি করতে গিয়ে এক খালের ভিতর পড়ে যান, ও একটুতে রক্ষা পান। আর একবার তিনি শস্য-উত্তোলক যন্ত্রের ভিতর পড়ে গিয়ে, চাপা পড়ে মারা যাবার মত হয়েছিলেন, কিন্তু

সেবারেও ভগবানের কৃপায় একটুতে বেঁচে যান। একদিন হঠাৎ গোলা-ঘরের মেজে অগ্নিসংযোগ করবার তাঁর এক অদ্ভুত খেয়াল চাপল। তিনি আগুন জ্বালাতেই সমস্ত সঞ্চিতশস্য সহ গোলা-ঘর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে' পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেল। এই গুরুতর অপরাধের জন্য তাঁকে সর্ব্বসমক্ষে খুব করে চাবুক মারা হয়। এইরূপ আরও নানা রকমের উৎপাত সৃজন করে তিনি অনেকবার শাস্তি লাভ করেন। এডিসনের মা কিন্তু তাঁর এসব দুরন্তপনার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হতেন না। তিনি ভাবতেন এই সমস্ত নানা রকমের অভিজ্ঞতার দ্বারা এডিসনের ভাবী জীবনের উপকারই হবে। আর এডিসনের এই ভাবী জীবন সম্বন্ধে তার মায়ের একটি খুবই উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর পুত্রের দ্বারা জগতের একটি কোন মহৎ ও মহিমাময় কার্য্য সাধিত হবেই হবে। এডিসন্-পরিবার যখন তাঁদের মিলানের বসতবাটী ছেড়ে হুরণ বন্দরে উঠে এসে বসবাস করতে লাগলেন, তখন এডিসনের এক খেয়াল চাপল যে, তিনি ট্রেনে খবরের কাগজ বিক্রী করার কাজ নেবেন। তাঁর মা তাতে অনেক আপত্তি করলেন, কিন্তু এডিসন্ কিছুতেই শুনলেন না। অনেক সাধ্যসাধনা করে তাঁর মায়ের অনুমতি নিয়ে, হুরণ বন্দর ও ডেট্রয়টের মধ্যে যে ট্রেন চলাচল করে, সেই ট্রেনে তিনি কাগজ বিক্রী সুরু করলেন।

এডিসন্ ট্রেনে কাগজ বিক্রী করে দিন প্রায় দশ ডলার অর্জ্জন করতে লাগলেন। তিনি এ কার্য্যে এরূপ অসাধারণ সফলতা লাভ করে তাঁর ব্যবসায় বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিলেন। ট্রেন পৌঁছুবার পূর্ব্বেই টেলিগ্রামযোগে তিনি সব জরুরী খবরাদি প্রত্যেক ষ্টেশনে পাঠিয়ে তা' ষ্টেশনের বিজ্ঞাপন-বোর্ডে লিখে দেবার বন্দোবস্ত করেন,

ও এই উপায়ে প্রত্যেক ষ্টেশনে ট্রেন পৌছন মাত্রই অতি সহজে ও সত্বর তাঁর ঢের কাগজ বিক্রী হয়ে যেত।

এই সময় যে এডিসন্ শুধু কাগজ বিক্রী নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন তা' নয়। তিনি রোজ বিকাল বেলা ডেট্রয়টে পৌছে সেখানকার পুস্তকাগারে গিয়ে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সমূহ একাগ্রচিত্তে পাঠ করতেন। তিনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের জন্য এই সময় একান্ত উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাঁর মায়ের একটি ভাঁড়ার-ঘরে, নানারকম রাসায়নিক দ্রব্যে পূর্ণ অনেকগুলো বোতল পর পর সাজিয়ে রেখে, যাতে বোতলে অন্য কেউ হাত না দেয় এই উদ্দেশ্যে, সমস্ত বোতলের গায়ে "বিষ" বলে লেবেল এঁটে দেন। এই সময় তিনি বৈজ্ঞানিক পুস্তক সমূহ হতে, তড়িৎ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান সঞ্চয় করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। রাত নয়টার পরে বাড়ী ফিরে এসে, নানা রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত হতেন। তিনি এত বেশি রাত জেগে কাজকর্ম্ম করতেন যে, তাঁর পিতা তাঁকে শুতে যাবার জন্য প্রায় রোজই পীড়াপীড়ি করতেন।

তিনি যে ট্রেনে সংবাদ পত্র বিক্রী করতেন, সে ট্রেনের গার্ডের কক্ষেই তাঁকে জায়গা দেওয়া হয়েছিল। একদিন তিনি গার্ডের কক্ষে বসে কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য্য করতে গিয়ে সেই কক্ষে হঠাৎ আগুন লাগিয়ে দেন। তাঁর এই কার্য্যে ট্রেনের চালক এত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে যে, সে তাঁকে পরের ষ্টেশনেই গাড়ী হতে ঠেলে বার করে দেয় এবং এত জোরে তাঁর দু' কাণের ওপর উপর্য্যুপরি ঘুষা মারে যে, তার ফলে চিরকালের জন্য তাঁর শ্রবণশক্তির প্রায় বিলোপ ঘটে। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করে এডিসন্ পরে বলতেন যে কাণে কম শোনাতে তাঁর খুব উপকারই হয়েছিল। কারণ বাইরের অনেক কিছু

তাঁর কাণে পৌঁছত না বলে খুব একাগ্রতার সহিত কোন বিষয় চিন্তা করা তাঁর পক্ষে সহজ হ'ত।

এই ঘটনার পরে এডিসনের ট্রেনে কাগজ বিক্রীর কাজটি গেল। এবার তিনি টেলিগ্রাফ সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন, এবং অচিরে সে বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন। এই সময়ে তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খুব অল্প কয়েকঘণ্টা মাত্র নিদ্রায় অতিবাহিত করতেন ও বাকি প্রায় সমস্তক্ষণই অধ্যয়নে নিরত থাকতেন। এই অক্লান্ত সাধনার ফলে তিনি যে জ্ঞান লাভ করেন তার সাহায্যে তখনকার দিনের টেলিগ্রাফযন্ত্রের নানারকম উন্নতিবিধান করে, তিনি তা' একরকম দোষহীন করে তুলতে সমর্থ হন।

আমেরিকার অন্তর্বিপ্লবের পরে অনেক বৎসর এডিসনকে বেকার অবস্থায় থাকতে হয়। এই সময়ে তিনি একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় নিউইয়র্কে এসে উপস্থিত হন। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি নিউইয়র্কে পৌঁছবার পরেই সেখানকার গোল্ড রিপোর্টিং কোম্পানীতে (Gold Reporting Company) একটি চাকরি লাভ করেন। এই অফিসের অধিনায়ক ডাক্তার লজের উদ্ভাবিত একটি যন্ত্রের সাহায্যে, তাঁর অফিস হতে দৈনিক পরিবর্ত্তনশীল সোনার মূল্যের খবর সহরের সমস্ত দালালদের অফিসে টেলিগ্রাফে প্রেরিত হ'ত। এডিসন্ এই অফিসে কাজ পাবার তিন দিন পরেই হঠাৎ ডাক্তার লজের সেই যন্ত্রটি খারাপ হয়ে যায়। তখন চারদিকের দালালদের অফিস হতে প্রায় তিনশ লোক এসে ডাক্তার লজের অফিসে ভয়ানক গণ্ডগোল আরম্ভ করল। সকলেই বলতে লাগল যে তাদের অফিসের যন্ত্র খারাপ হয়ে যাওয়াতে তাতে কোন কাজ হচ্ছে না, ও অবিলম্বে তা' যেন মেরামত করে দেওয়া হয়। যাঁর তত্ত্বাবধানে এই সমস্ত যন্ত্রাদি ছিল তাঁর ত তখন

বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেল। তিনি কোথায় যে কি খারাপ হয়েছে তা' কিছুই বুঝতে না পেরে একেবারে বোকা বনে গেলেন।

এডিসন্ মুহূর্ত্তেই বুঝতে পারলেন যন্ত্রের কোথায় কি গলদ হয়েছে, এবং ডাক্তার লজের অনুমতিক্রমে তিনি যন্ত্রটি অচিরে মেরামত করে দিলেন। দু' ঘণ্টার মধ্যেই আবার সমস্ত অফিসে পূর্ব্বের মত কাজকর্ম্ম চলতে লাগল।

এই ঘটনার পরেই ডাক্তার লজ এডিসনকে এই সমস্ত যন্ত্রাদির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেন, ও এধার তাঁর মাহিনা স্থির হ'ল মাসে তিনশ ডলার বা প্রায় ১০০০৲ টাকা। এই সময়ে এডিসনের বয়স ছিল মাত্র ২২ বৎসর।

এডিসন্ এই নূতন কাজ পাবার পর হতে প্রতিদিন প্রায় কুড়ি ঘণ্টা কার্য্যে নিযুক্ত থাকতেন, ও মাত্র চার ঘণ্টা খাওয়া দাওয়া ও নিদ্রায় অতিবাহিত করতেন। তিনি টেলিগ্রাফিযন্ত্রের আরও নানা রকম নূতন কলকৌশল উদ্ভাবন করে উহার যথেষ্ট উন্নতি বিধান করলেন। তাঁর এই সব নূতন উদ্ভাবনের দ্বারা তাঁর অফিসের কর্ত্তাদেরও কাজকর্ম্মের খুব সুবিধা হল। তাঁরা এডিসনের কাজকর্ম্মে, এবং তাঁর অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি অতিশয় সদয় ও অনুরক্ত হলেন।

একদিন এডিসনের অফিসের বড় কর্ত্তা তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি যে সব কলকৌশল নূতন উদ্ভাবন করেছেন সে সমস্ত উদ্ভাবন কত মূল্যে তিনি কোম্পানীকে বিক্রী করতে রাজি আছেন। এডিসন্ ভাবলেন তিনি পাঁচ হাজার ডলার অর্থাৎ আন্দাজ ১৮,৫০০ টাকা চাইবেন; কিন্তু অত মূল্য চাইতে তাঁর সাহস হল না! তিনি তখন তিন হাজার ডলার অর্থাৎ আন্দাজ ১১,০০০ টাকা চাইবেন স্থির করে, আবার হঠাৎ একটু চিন্তা করে বললেন—

"মশায়, আমি চিন্তা করে আপনাকে পরে জানাব।" তাঁর অফিসের বড় কর্ত্তা তখন বললেন—"আপনি চল্লিশ হাজার ডলারে (প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) তা বিক্রী করতে রাজি আছেন কি?" এডিসন্ শুনেই ত অবাক! কোথায় তিনি তিন হাজার ডলার চাইতে যাচ্ছিলেন, আর এ কিনা একেবারে ৪০ হাজার ডলার দিতে রাজি! এডিসন্ ৪০ হাজার ডলারের চেক্‌খানি পেয়ে, তাঁর এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যসম্পদে বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে, টলতে টলতে অফিস হতে বেরিয়ে পড়লেন।

এবার আর এডিসনের পয়সাকড়ির অভাব রইল না। এই অচিন্তনীয় সম্পদ লাভের পরে তিনি আরও উৎসাহিত হয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচর্চ্চায় একাগ্রচিত্তে নিযুক্ত হলেন। তিনি তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিকে এবার বহুবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত করতে সমর্থ হলেন। এডিসন্ ইহার কিছুকাল পরেই ডুপ্লেক্স (Duplex) টেলিগ্রাফ যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে একটি তারের ওপর দিয়ে একই সময়ে দুই বিপরীত দিকে, কি একই দিকে, এক সঙ্গে দু'টি সংবাদ পাঠান সম্ভব করে তুললেন। ১৮৭৪ সালে ইহা হতেও উন্নততর কোয়াড্রুপ্লেক্স (Quadruplex) টেলিগ্রাফ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে যুগপৎ চারটি সংবাদ পাঠান সম্ভব হল।

এডিসন্ তড়িৎ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করবার সময় রসায়নশাস্ত্রও খুব ভাল রকম অধ্যয়ন করেন। বাড়ীর অন্য সকলে যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকতেন তখন তিনি অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকতেন। তাঁর এই বিরামহীন অধ্যয়নের ফলে তিনি বিজ্ঞান-জগতে, বহুবিধ আবিষ্কার ও উদ্ভাবন দ্বারা অবিনশ্বর কীর্ত্তি অর্জ্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এডিসন্ ১৮৭৭ সালে কলের গান বা গ্রামোফোন উদ্ভাবন করেন। এই কলের গান তোমরা প্রায় সকলেই শুনে থাক; কিন্তু কে প্রথম এই আশ্চর্য্য যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন তা বোধ করি তোমাদের মধ্যে অনেকে জান না। এডিসন্ যখন প্রথম স্থির করেন যে, তিনি মানুষের কথাবার্ত্তা ও গানবাজনা ধরে রাখবার জন্য এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করবেন তখন তাঁর বাড়ীর লোক ও বন্ধুবান্ধবেরা তাঁর কথা শুনে হেসে আকুল হল। এডিসন্ কিন্তু কারও হাসিতে টলবার পাত্র ছিলেন না। তিনি নানারকম পরীক্ষাকার্য্যের পরে এই গ্রামোফোন যন্ত্র উদ্ভাবন করে সকলকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করলেন।

এইবার এডিসন্ বৈদ্যুতিক আলো নিয়ে নানা রকমের পরীক্ষা কার্য্য আরম্ভ করলেন। অনেকে মনে করেন যে এডিসনের যাবতীয় উদ্ভাবনের মধ্যে তাপোজ্জ্বল (incandescent) বৈদ্যুতিক আলো, এবং বৈদ্যুতিক উত্তাপ ও বৈদ্যুতিক শক্তির যথাযথ বিতরণের প্রণালী উদ্ভাবনই তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন। তাঁর এই অমূল্য দানের জন্য মানবসমাজ আজ তাঁর নিকট চিরঋণে ঋণী।

এডিসনের পূর্ব্বে বিশেষজ্ঞরা বৃহদাকারের এক একটি বৈদ্যুতিক আলো নির্ম্মাণ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এডিসন্ চেষ্টা করলেন কি উপায়ে বৈদ্যুতিক শক্তিকে এমন সুন্দরভাবে ভাগ করে নেওয়া যায়, যাতে গ্যাসের মতন প্রয়োজনানুযায়ী পরিমিত পরিমাণে তা ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

এডিসন্ প্রথম বৈদ্যুতিক আলোতে তামার তার ব্যবহার করে দেখলেন। কিন্তু তামার তার এত বেশি ব্যয়সাধ্য যে, তিনি যে প্রণালী মতে আলো জ্বালাবার বন্দোবস্ত করবেন মতলব করলেন তার জন্য উপযোগী হবে না ভেবে তা ত্যাগ করলেন। পরে তিনি বিশুদ্ধ

অঙ্গার (Carbon) ব্যবহার করে দেখলেন যে, তাতে মাত্র অল্প কয়েক মিনিট আলো জ্বলে নিবে যায়। এইরূপে নানা রকমের জিনিষ দিয়ে পরীক্ষাকার্য্য করতে গিয়ে, ১৮৭৭ সালে, একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, যদি বায়ুশূন্য একটি কাচের গোলকে প্ল্যাটিনামের তার ব্যবহার করা হয় এবং সেই তারের ভিতর দিয়ে একটি তড়িৎ-প্রবাহ প্রেরিত হয়, তবে তারটি উত্তপ্ত হয়ে উঠে বেশ চমৎকার আলো দেয় ও সেই উত্তাপে তারটি গলে যায় না।

এই ঘটনাটি লক্ষ্য করবার পরে তিনি সাধারণ একগাছি সেলাইয়ের সূতো অঙ্গারীভূত করে তা' একটি গোলকের ভিতর লাগিয়ে, সেই গোলকটি বায়ুশূন্য করে নিয়ে তার মুখটি বন্ধ করে দিলেন। পরে তিনি গোলকটিকে বৈদ্যুতিক প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে দেখলেন যে এই আলোটি প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জ্বলল। ইহার পরে এডিসন্ বৈদ্যুতিক আলোর উপযোগী একটি উৎকৃষ্ট তন্তু আবিষ্কার করবার জন্য, নানা রকমের তন্তু অঙ্গারে পরিণত করে, তা দিয়ে বহুবিধ পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করলেন। তিনি পাটের সূতো, কাগজের তৈরি সূতো, নানা রকমের লতাপাতা, গাছগুল্মের তন্তু সবই পরীক্ষা করলেন। কথিত আছে এই উপলক্ষে তিনি ছয় হাজার রকমের গাছগুল্মের তন্তু পরীক্ষা করে দেখেন।

একদিন তিনি তাঁর পরীক্ষাগারের সম্মুখে একখানা তালপাতার পাখা পড়ে আছে দেখতে পেলেন। তিনি তা' তুলে নিয়ে তার একপাশে লাগানো একটি বাঁশের টুকরো হতে একটি সরু তন্তু বার করে নিয়ে তা' দিয়ে আলো কি রকম জ্বলে তা' পরীক্ষা করে দেখলেন। এপর্য্যন্ত তিনি যতরকম তন্তু পরীক্ষা করে দেখেছেন, দেখলেন এই বাঁশের তন্তুই তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তড়িৎ-পরিচালক। পরে এরকমের বাঁশ

আনবার জন্য তিনি জাপানে একজন লোক পাঠান, এবং এরকম বাঁশ স্বদেশে উৎপাদন করবার জন্য একজন জাপানী কৃষক নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি বেশিদিন এই বাঁশের তন্তুতেও সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তিনি তাঁর আদর্শ তন্তুর জন্য এবার সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, এবং ইহার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হলেন না। অবশেষে তিনি সেলুলোজ মিশ্রণ (cellulose mixture) হতে এমন এক তন্তু নির্ম্মাণ করতে সমর্থ হলেন, যে তন্তু সেই বাঁশের তন্তুর চাইতে বহুগুণে ভাল হল।

তিন বৎসর পর্য্যন্ত এডিসন্ তাঁর খরচা হতেও অনেক কম দামে বৈদ্যুতিক আলো বিক্রয় করলেন। চতুর্থ বৎসর তিনি খুব কম খরচায় তা নির্ম্মাণ করতে সমর্থ হলেন। এই সময়ে তাঁর এই আলোর কাটতি এত বেশি হতে লাগল যে আগেকার সমস্ত লোকসান উঠে গিয়ে তাঁর বেশ লাভ হতে আরম্ভ হল। এ বিষয়ে কৃতকার্য্যতার পরেই, এডিসন্ বৈদ্যুতিক আলো, উত্তাপ এবং শক্তি কি উপায়ে একটি কেন্দ্রস্থান হতে চারদিকে বিতরণ করা যেতে পারে তার একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন। প্রত্যেক বাড়ীতে পৃথক্ ভাবে বৈদ্যুতিক প্রবাহ যোগান, ও তাঁর উদ্ভাবিত পরিমাপকের (meter) সাহায্যে পৃথক্ পৃথক্ বাড়ীতে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক প্রবাহের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা সম্ভব করে তুললেন।

এডিসন্ সব সময়ই এমন কর্ম্মনিরত থাকতেন যে ব্যর্থতা নিয়ে দুঃখ করবার কিংবা কৃতকার্য্যতা নিয়ে আনন্দ করবার তাঁর সময় হত না। তিনি কোন কার্য্যে ব্যর্থকাম হলে, সে বিষয়ের সব ভাবনা ত্যাগ করে আবার অবিলম্বে এক নূতন কাজে আপনাকে নিয়োজিত করতেন; এবং কোন কাযে সফলতা লাভের পরেও তা' নিয়ে আনন্দ করবার

অবসর তাঁর হ'ত না, কারণ কাজটি সুসম্পন্ন হলেই আবার অন্য একটি কাজে তিনি তখনই হাত দিতেন। এইরূপ অদ্ভুত পরিশ্রমী ও কর্ম্মপ্রিয় পুরুষ খুব কমই দেখা যায়। তাঁর মনটি অসংখ্য কল্পনা ও সঙ্কল্পে সব সময় এমন পূর্ণ হয়ে থাকত যে, তিনি কি উপায়ে সে সব কল্পনা ও সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করবেন এই ভেবে অনেক সময় বড়ই বিব্রত হয়ে পড়তেন। একবার তিনি তাঁর এক বন্ধুকে বলেন—"এত কাজ করবার আছে আর তার তুলনায় আমার জীবনটি এত ক্ষণস্থায়ী যে, আমাকে সব কিছুর সঙ্গেই ধাক্কাধাক্কি করে ছুটতে হচ্ছে।"

এডিসন্ দেখলেন যে ভাল রকমের একটি বৈদ্যুতিক সংরক্ষক ব্যাটারির (Storage Battery) প্রয়োজন। এক রকমের সংরক্ষক ব্যাটারি তখন ছিল যা তৈরি হত দস্তার পাত ও সালফিউরিক য়্যাসিডের (Sulphuric acid) সাহায্যে। তিনি নানা রকমের ধাতু দিয়ে পরীক্ষাকার্য্য করে দেখলেন যে, নিকেল ও লোহার মধ্যে প্রতিক্রিয়াটাই হয় সব চাইতে ভাল। তিনি এবার নূতন ধরণের একটি ব্যাটারি নির্ম্মাণের জন্য রসায়নবিৎ ও ইঞ্জিনিয়রদের সঙ্গে দিনরাত কাজ করতে আরম্ভ করলেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার রকম পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করে, বহুবর্ষ পরে, সংরক্ষক ব্যাটারিকে নির্দ্দোষ করে তুললেন। এইরূপ ব্যাটারির সাহায্যে মোটর ও ট্রামগাড়ীর পক্ষে যাত্রী ও মালপত্রাদি বহন করে নিয়ে যাবার খুব সুবিধা হবে মনে করেই তিনি প্রথম একাজে হাত দেন।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় এডিসন্ যুদ্ধসংক্রান্ত নানা প্রয়োজনীয় কার্য্যে আপনাকে একান্তভাবে নিয়োজিত করেন। যে সব জিনিষ আমেরিকা বিদেশ হতে বরাবর আমদানি করত তা' যুদ্ধের সময় যখন আর পাওয়ার উপায় রইল না, তখন এডিসন্ বৈজ্ঞানিক উপায়ে তা প্রস্তুত

করবার জন্য প্রয়োজনীয় অনেক যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করেন। তিনি কয়েক রকমের রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করবার জন্য নয়টি, ও বেঞ্জল তৈরি করবার জন্য দুটি নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। গোলা-গুলি তৈরি করবার জন্য যখন কার্বলিক য়্যাসিড্ (carbolic acid) আর পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন এডিসন্ আট নয় দিনের মধ্যে এই কার্বলিক য়্যাসিড্ প্রস্তুত করবার কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করে তা' প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করতে সমর্থ হন। এক সময় কার্বলিক য়্যাসিডের এত বেশি প্রয়োজন হয় যে, তিনি অবিলম্বে আর একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করে দৈনিক ১৬২ মণ য়্যাসিড্ উৎপাদন করতে সমর্থ হন। ইহা ছাড়া যুদ্ধের সময় আরও অনেক রকম রাসায়নিক পদার্থ আমেরিকার জন্য তাঁকে প্রস্তুত করতে হয়েছিল।

যখন আমেরিকা মিত্রপক্ষদের সঙ্গে যোগদান করেন তখন এডিসন্ অকুণ্ঠিত চিত্তে আমেরিকার যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্যে তার সমস্ত শক্তি ও সময় নিয়োজিত করবার জন্য প্রস্তুত হলেন, কিন্তু দেশের কাজে তিনি পারিশ্রমিকরূপে কিছু গ্রহণ করতে রাজি হলেন না।

তিনি যুদ্ধের সময় সাবম্যারিণ সংক্রান্ত কার্য্যেও তাঁর অনেক সময় ব্যয় করতেন। তিনি এমন একটি যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন যার সাহায্যে তিনহাজার মাইল দূর হতে সাবম্যারিণ হতে নিক্ষিপ্ত টরপিডোর শব্দ শোনা সম্ভবপর হল।

যে সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় উদ্ভাবনের দ্বারা এডিসন্ জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন, আজ সমস্ত জগতবাসী তাঁর সেই অক্ষয় ও অমূল্য দানের পরিবর্ত্তে তাঁকে তাঁদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন।

টেলিগ্রাফের কথা

কোন দরকারী খবর কোথাও খুব শীঘ্র পাঠাতে হ'লে টেলিগ্রাফের সাহায্যে তা' করতে হয় একথা তোমরা সবাই জান। এই টেলিগ্রাফ যন্ত্র উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উদ্ভাবিত হয়। তার পূর্ব্বে সব খবরই ডাকে পাঠাতে হ'ত। খুব জরুরি খবর হলেও তা খুব শীঘ্র পাওয়ার বা কোথাও পাঠাবার কোনও উপায়ই তখন ছিল না। পূর্ব্বে দূরদেশে "ঘোড়ার ডাকে", জরুরি চিঠিপত্রাদি পাঠাবার বন্দোবস্ত ছিল।

টেলিগ্রাফে খবরপ্রেরণের প্রবর্ত্তকরূপে কয়েকজন ইতিহাস-বিখ্যাত ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—নিউইয়র্কের সুপ্রসিদ্ধ স্যামুয়েল্ মর্স, উইলিয়ম ক্যাথারগিল্ কুক্, শিলিং, ষ্ট্যান্হাইল, সমেরিং, গস্ ও ওয়েবার্।

শিলিং, ষ্ট্যান্হাইল, সমেরিং, গস্ ও ওয়েবার বিদ্যুতের সাহায্যে দূরে সঙ্কেত প্রেরণ সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষাকার্য্য করেছিলেন ও সে বিষয়ে অল্পবিস্তর অগ্রসরও হয়েছিলেন তা' ঠিক, কিন্তু টেলিগ্রাফে সংবাদ আদান-প্রদানকে কার্য্যকরী করে তোলার দিক থেকে এঁদের মধ্যে কেউ বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি।

বর্ত্তমান সময়ে যে সুন্দর ও সহজ উপায়ে তারের খবর দেশ-দেশান্তরে প্রেরণ করা হয়, তার সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তক হলেন স্যামুয়েল মর্স। বিদ্যুতের সাহায্যে কোন খবর কোথাও পাঠান যেতে পারে এই চিন্তাটি অবশ্য সর্ব্বপ্রথম মর্সের মনে উদয় হয়নি, কিন্তু তাঁরই

একান্ত চেষ্টা ও সাধনার ফলে আজ টেলিগ্রাফের এমন অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। স্যামুয়েল মর্সের কথা তোমাদের পরে বলব। তার পূর্ব্বে টেলিগ্রাফের অন্যতম প্রবর্ত্তক ক্যাথারগিল্ কুকের কথা তোমাদের কিছু বলছি।

উইলিয়ম ক্যাথারগিল্ কুক্ ও লণ্ডনের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার্ চার্লস্ হুইটসনের চেষ্টায় ইংলণ্ডে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়। কুক্ এক সময়ে ভারতবর্ষে মান্দ্রাজ প্রদেশের সৈন্যবিভাগে একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ১৮৩৬ সালে ছুটি নিয়ে একবার স্বদেশে যান ও ছুটির বেশির ভাগই ইউরোপের নানাদেশ পরিভ্রমণ করে বেড়ান। প্রত্যেক দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদুঘর প্রভৃতি, যেখানে যা' দেখবার ছিল তা সবই ঘুরে ঘুরে দেখেন। এই দেশপর্য্যটনের সময়ে তিনি হাইডেলবার্গের (Heidelberg) এক বক্তৃতাগৃহে একদিন একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ছোট "মডেল্" দেখতে পান। যন্ত্রটি সেই বক্তৃতাগৃহে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রদর্শনের জন্যই রাখা হয়েছিল। তিনি দেখলেন এই বৈদ্যুতিক যন্ত্রটির সাহায্যে তাড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চার করে তার আবার নিরোধ করলে, তাতে একরকম বৈদ্যুতিক কম্পন সৃজিত হয়। যন্ত্রটি দেখবার কিছুদিন পরে একদিন হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, এইরূপ বৈদ্যুতিক কম্পনের সাহায্যে বহুদূরে কোন রকম সঙ্কেত পাঠান হয় ত সম্ভবপর হবে। এই চিন্তাটি তাঁর মনে জেগে রইল। দেশপর্য্যটন শেষ করে তিনি যখন বাড়ী ফিরে এলেন, তখন তাঁর সৌভাগ্যবশতঃ তখনকার দিনের লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার্ চার্লস্ হুইটসনের সঙ্গে তাঁর একদিন হঠাৎ পরিচয় হয়। কুক্ তাঁর কল্পিত বিষয়টি হুইটসনের কাছে সব খুলে বললেন। হুইটসনও তাঁর প্রস্তাবটি শুনে খুবই আনন্দিত হলেন। পরে সেই প্রস্তাব কার্য্যে

পরিণত করবার জন্য তাঁরা দুজনে মিলে প্রাণপণে খাটতে আরম্ভ করলেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই একটি স্মরণীয় দিন। সেদিন সর্ব্বসমক্ষে তাঁদের তৈরি নূতন যন্ত্রের প্রথম পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষাকার্য্যের সময় তাঁদের একজন থাকলেন ক্যামডেনে (Camden) ও আর এক জন রইলেন ইয়ুসটনে (Euston)। এক প্রান্ত হতে বৈদ্যুতিক খবর প্রেরিত হল, আর অপর প্রান্ত হতে সেই খবর গৃহীত হল। তাঁদের সমস্ত শ্রম সার্থক হল। বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের আবির্ভাব হ'ল।

এবার টেলিগ্রাফের সুবিখ্যাত প্রবর্ত্তক মর্সের কথা বলব। মর্সের নাম তারবার্ত্তার ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে থাকবে।

মর্স ছিলেন একজন চিত্রকর। তিনি ইউরোপের প্রধান প্রধান চিত্রশালার বিখ্যাত চিত্রাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার জন্য তিন বৎসর দেশে দেশে ভ্রমণ করে বেড়ান। তিনি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে চিত্রসন্দর্শন কার্য্য সমাপ্ত করে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সালী (Sully) নামক একখানি জাহাজে এসে উঠলেন। মর্সের বয়স তখন ৪১ বৎসর। তিনি সেই সময়ে আমেরিকার একজন প্রধান চিত্রকর বলে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করবার সময় সঙ্কল্প করেন যে এবার তিনি এমন একখানি ঐতিহাসিক চিত্র আঁকবেন যা তাঁর অঙ্কিত সমস্ত চিত্রের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলে পরিগণিত হবে। কিন্তু ইহা বড়ই আশ্চর্য্য যে মানুষ যা করবে বলে সঙ্কল্প করে, ও জীবনকে যে পথে চালাবে বলে ভেবে নেয়, কোন এক আকস্মিক সামান্য ঘটনায় অনেক সময় তার মনে এমন এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে যে, তখন তার পক্ষে, তার পূর্ব্বের সঙ্কল্পিত পথে অগ্রসর হওয়ার আর

কোন প্রবৃত্তিই থাকে না। এক অদৃশ্য হস্ত তার জীবনকে ভিন্ন পথে চালিত করে নিয়ে যায়। মর্সের জীবনেও এরূপ একটি অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হল। তিনি যে জাহাজে বাড়ী ফিরে আসছিলেন ঠিক সেই জাহাজেই ডাক্তার জ্যাক্‌সন্ নামে একজন যাত্রী ছিলেন। ডাক্তার জ্যাক্‌সন্, পারি (Paris) সহরে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যে সব বিস্ময়কর পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হতে একদিন দেখেছিলেন, তা মর্সের নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করেন। এই সময়ে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে সমস্ত পাশ্চাত্য দেশেই একটি প্রবল ঔৎসুক্য জাগ্রত হয়েছিল ও অনেকেই বৈদ্যুতিক শক্তি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হয়ে উঠে। বৈদ্যুতিক চুম্বক (Electro magnet) তখন সবেমাত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। ডাক্তার জ্যাক্‌সনের সঙ্গেও একটি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক চুম্বক ছিল। মর্স এই বৈদ্যুতিক চুম্বক সম্বন্ধে ডাক্তার জ্যাক্‌সনকে নানা রকমের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে সে সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিলেন। মর্স কলেজে পড়বার সময় বিদ্যুৎ এবং চুম্বক সম্বন্ধে অধ্যাপকদের অনেক বক্তৃতা শুনেছিলেন, এ কারণে এ বিষয়ে তিনি একেবারে অনভিজ্ঞও ছিলেন না।

একদিন সেই জাহাজের আর একজন আরোহী ডাক্তার জ্যাক্‌সনকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ঐ বৈদ্যুতিক চুম্বকে যে তারটি বাঁধা রয়েছে সেই সুদীর্ঘ তারের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ যেতে কত সময় লাগে। ডাক্তার জ্যাক্‌সন্ বললেন যে, পরীক্ষার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়েছে যে, তার যতটা দীর্ঘই হোক্ না কেন মুহূর্ত্তের মধ্যেই তা' বিদ্যুন্ময় হয়ে উঠে।

মর্স ডাক্তার জ্যাক্‌সনের এই কথা শুনে ভাবলেন যে, যদি এই প্রবাহ-পথের (circuit) প্রত্যেক অংশই মুহূর্ত্ত মধ্যে বিদ্যুন্ময় হয়ে

যায়, তবে নিশ্চয়ই এক স্থান হতে অন্য স্থানে এই বিদ্যুতের সাহায্যে মুহূর্ত্তের মধ্যেই যে কোন সঙ্কেত প্রেরণ করা যেতে পারে। এই চিন্তাটি মনে আসতেই তিনি দিনরাত এ সম্বন্ধে ভাবতে লাগলেন। আর যতই এ সম্বন্ধে চিন্তা করেন ততই তাঁর মনে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হ'য়ে ওঠে। জাহাজে তিনি যতদিন ছিলেন ততদিন কেবল এই বিষয় নিয়ে নানা রকম জল্পনা কল্পনায় ডুবে রইলেন, ও বিদ্যুতের সাহায্যে সংবাদ পাঠান সম্ভবপর করে তোলবার জন্য তাঁর নক্সা বইখানিতে নানা রকমের কল্পিত যন্ত্রের নক্সা আঁকতে লাগলেন। যে সময়ে তিনি আমেরিকায় এসে পৌছলেন, সেই সময় তাঁর কল্পিত যন্ত্রের নক্সা একরকম প্রস্তুত হয়ে গেল।

মর্স ষ্টীমার হতে নামবার সময় জাহাজের কাপ্তানকে বললেন, "দেখুন, কাপ্তান, যদি কখনও বিদ্যুতের সাহায্যে সংবাদ প্রেরিত হচ্ছে এমন অদ্ভুত কথা কখনও শোনেন, তবে একথা মনে রাখবেন যে তার আবিষ্ক্রিয়া আপনার এই সুন্দর সাদা জাহাজের ওপরেই হয়েছিল।"

মর্সের গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের পরে তাঁর বন্ধুরা যখন দেখলেন যে, মর্সের চিত্রবিদ্যার প্রতি আর তেমন কোন টান নেই ও তিনি তাঁর বৈদ্যুতিক পরীক্ষাকার্য্য নিয়েই মত্ত হয়ে আছেন, তখন তাঁরা তাঁর এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে বড়ই বিস্মিত হলেন। এই সময়ে মর্সের অর্থ সম্বল মোটেই ছিল না, তাই এই কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি ক্রয় করবার মতন অর্থের যোগাড় তিনি করতে পারলেন না। কাজেই তাঁকে নিজের ভরণপোষণের জন্য চিত্রবিদ্যা নিয়ে আরও ২।৩ বৎসর কাল থাকতে হ'ল। এই সময়ে তিনি তাঁর চিত্রাঙ্কন কার্য্যের অবসর কালে তারবার্ত্তা সম্বন্ধীয় নানাবিধ পরীক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকতেন।

মর্সের ভ্রাতারা, এই সময়ে মর্সকে তাঁদের অফিস্ গৃহের একখানি

মর্সের উদ্ভাবিত যন্ত্রদ্বয়
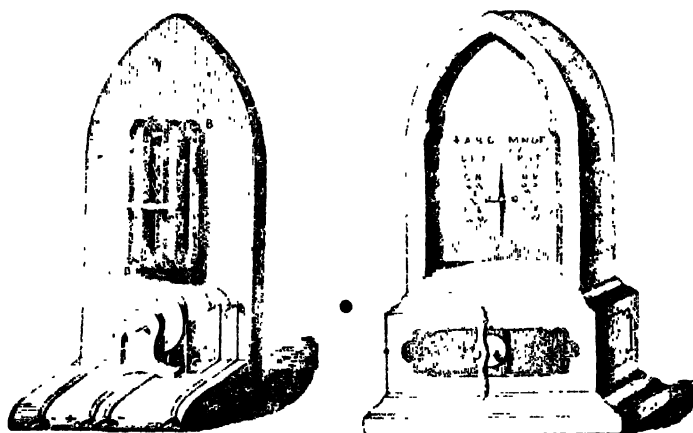
ঘর, তাঁর এই উদ্ভাবন সংক্রান্ত কাজের পরীক্ষাগাররূপে ব্যবহার করতে দিলেন। মর্স অনেকদিন পর্য্যন্ত এই একখানি ঘরেই তাঁর চিত্রাঙ্কন কার্য্য, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য্য ও রন্ধনাদি প্রভৃতি অন্য সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতেন। এ ঘরটি তিনি আবার রাত্রে শয়নগৃহরূপেও ব্যবহার করতেন।

এই সময়ে মর্স যে কি ভয়ানক কষ্টের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন তা' তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। অর্থের অভাবে তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি কিছুই ক্রয় করতে না পেরে, নিজের হাতেই তা' সব তৈরি করলেন। তখন বৈদ্যুতিক চুম্বক বাজারে পাওয়া যেত না, কাজেই মর্সকে তাও নিজের হাতে তৈরি করে নিতে হল। তিনি একটি ক্ষুদ্র লৌহদণ্ডকে, কামারশালা হতে ঘোড়ার নালের আকারে তৈরি করিয়ে নিয়ে, সংযোগমুক্ত (Insulated) তামার তার দিয়ে তার মাঝখানটা সুন্দররূপে জড়িয়ে নিলেন। সংযোগমুক্ত তামার তারও তখন পাওয়া যেত না। মর্স কয়েক গজ তামার তার কিনে নিয়ে এসে তাকে সুতো দিয়ে বেশ জড়িয়ে নিয়ে সংযোগমুক্ত (Insulated) করে নিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত নূতন যন্ত্রের অন্যান্য অংশও সব তাঁকে নিজের হাতেই তৈরি করে নিতে হল।

মর্স তাঁর তৈরি নূতন টেলিগ্রাফযন্ত্র সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করবার পূর্ব্বে, প্রথম ভাল করে তার কার্য্য পরীক্ষা করে নিলেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন যে, খুব দূরবর্ত্তী জায়গায় খবর পাঠাতে হলে তাঁর যন্ত্রের ক্ষীণ তড়িৎ-প্রবাহ হতে বৈদ্যুতিক চুম্বক প্রয়োজন মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে না। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য তিনি প্রথম একটি "রিলে" (Relay) নির্ম্মাণ করেন। যে ষ্টেশন হতে সংবাদ পাঠাতে হবে সেই ষ্টেশনের ব্যাটারি হতে উদ্ভূত তড়িৎ-

প্রবাহ সেই "রিলের" চুম্বক সমূহের ভিতর দিয়ে গিয়ে খুব শক্তিমান হয়ে উঠল। "রিলে" নির্ম্মাণ করে তিনি এবিষয়ে একটি প্রধান অসুবিধা দূর করলেন। মর্সের টেলিগ্রাফে এই রিলের কল্পনা ও সৃষ্টি তাঁর এক অদ্ভুত কীর্ত্তি বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই রিলের দ্বারাও এবিষয়ের সমস্ত অসুবিধা দূর হল না।

মর্স ভাবলেন এই টেলিগ্রাফকে একটি কার্য্যকরী উদ্ভাবনে পরিণত করতে হলে প্রত্যেক ষ্টেশনকে এমন করে তুলতে হবে যে, তা' যেন খবর প্রেরণ করতেও পারে আবার গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। তাঁর টেলিগ্রাফ-যন্ত্রের কার্য্য প্রদর্শন করতে হ'লে অন্ততঃ পক্ষে দুই "সেট" (Set) যন্ত্রের প্রয়োজন। তিনি দু'বৎসরের মধ্যে তাঁর প্রথম যন্ত্রটির নানা রকম উন্নতি সাধন করে, তাকে যতটা সম্ভব দোষহীন করে তুললেন ও পরে দ্বিতীয় আর একটি যন্ত্র নির্ম্মাণে হাত দিলেন।

১৮৩৭ সালে মর্স টেলিগ্রাফিযন্ত্রের কার্য্য প্রদর্শনের জন্য তাঁর বন্ধুবান্ধব ও অন্য কয়েকজন পরিচিত ভদ্রলোককে তাঁর পরীক্ষাগারে নিমন্ত্রণ করলেন। যাঁরা দেখতে এলেন তাঁরা সকলেই তাঁর যন্ত্রের কাজ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, এবং এই অপূর্ব্ব উদ্ভাবনের জন্য মর্সকে খুবই প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁর যন্ত্রের কার্য্য যাঁরা দেখতে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে য়্যালফ্রেড্ ভেল্ (Alfred Vail) নামক একজন যন্ত্রশিল্পী মর্সের টেলিগ্রাফযন্ত্র দেখে এমন মুগ্ধ হয়ে যান যে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, এই টেলিগ্রাফযন্ত্রের সবিশেষ উন্নতিসাধনের জন্য প্রয়োজনমত অর্থাদি দিয়ে মর্সকে সাহায্য করবার জন্য অগ্রসর হলেন। এই সময় হ'তে ভেল মর্সকে অকাতরে অর্থ সাহায্য করতে লাগলেন, ও পরে তাঁর এই ব্যবসায়ের একজন অংশীদার হন।

ভেলের সহায়তায় মর্স তাঁর সমস্ত যন্ত্রাদি নিখুঁত করে তুললেন, এবং এবার তিনি সর্ব্বসমক্ষে তা' প্রদর্শন করবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

এপর্য্যন্ত মর্স ও ভেল গবর্ণমেণ্টের বিনাসাহায্যে, তাঁদের পক্ষে যতটা সম্ভব, টেলিগ্রাফ সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেন। এবার তাঁরা এই নূতন যন্ত্র যুক্তরাজ্যের কংগ্রেসের সমক্ষে প্রদর্শন করলেন। কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্যই সমধিক উৎসাহের সহিত এই নূতন যন্ত্রের সম্বর্দ্ধনা করলেন। কিন্তু আবার কয়েকজন বড় বড় মহারথী মর্সের বিরোধী হয়ে দাঁড়ালেন, ও তাঁরা বিদ্যুতের সাহায্যে সংবাদাদি প্রেরণের প্রস্তাব হেসেই উড়িয়ে দিলেন।

যখন মার্কিন যুক্তরাজ্যের সভাপতির নিকট, মর্সের প্রস্তাবানুযায়ী টেলিগ্রাফ লাইন প্রতিষ্ঠাকল্পে, মর্সকে প্রয়োজনীয় অর্থপ্রদান করবার নিমিত্ত এক বিল (Bill) উপস্থিত করা হল, তখন ডাক বিভাগের বড় কর্ত্তা বললেন যে একাজের জন্য অর্থনষ্ট করা ভয়ানক নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হবে। মর্সের বন্ধুবান্ধবেরা কংগ্রেস হতে কোন রকম সাহায্য পাওয়া অসম্ভব হবে ভেবে বড়ই নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লেন। মর্স কিন্তু আশা ছাড়লেন না। তিনি ভাবলেন কংগ্রেস পরে নিশ্চয়ই তাঁকে এই কার্য্যের জন্য অর্থ সাহায্য করবে।

যেদিন কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষ দিন, সেদিনই ওয়াসিংটন হতে ব্যাল্টিমোর পর্য্যন্ত একটি টেলিগ্রাফ লাইন নির্ম্মাণকল্পে মর্সকে ৩০ হাজার ডলার সাহায্য প্রদান করবার জন্য একটি বিল নিম্নপ্রতিনিধিসভায় গৃহীত হয়ে উর্দ্ধতন সিনেটসভায় গৃহীত হওয়ার বিষয় বিবেচিত হবে স্থির হয়েছিল। রাত্রি যখন ১০টা তখনও সিনেটে আলোচিত হবার জন্য আরও অনেক বিল অবশিষ্ট আছে—আর মাত্র ২ ঘণ্টা সময় বাকি। মর্স সেখানে সেদিন উপস্থিত ছিলেন। সিনেটের

অনেক সভাই মর্সকে বললেন যে তিনি অনর্থক অপেক্ষা করছেন; কারণ তাঁর বিল আর মাত্র দু'ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আলোচিত হওয়া অসম্ভব, আর যদিও তা' আলোচিত হয় তবু তা' গৃহীত হবার সম্ভাবনা মোটেই নেই।

তাঁদের কথা শুনে মর্স নিরাশচিত্তে হোটেলে ফিরে এলেন, এবং পরদিন নিউইয়র্কে যাবার জন্য তাঁর জিনিষপত্র গুছোতে সুরু করলেন। তিনি ১০ বৎসর প্রাণান্ত পরিশ্রম করে যে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের এতটা উন্নতি সাধন করলেন, আজ তা' কার্য্যকরী হবে না বলে যদি পরিত্যক্ত হয়, তবে তাতে তাঁর মনে কি ভীষণ আঘাত লাগতে পারে তা' কল্পনা করতে পার। এই সময়ে তাঁর হাতে আর টাকাপয়সা কিছুই ছিল না বল্লেই হয়। যা সামান্য তাঁর হাতে ছিল, নিউইয়র্কের একখানি টিকিট কিনে আনতে তাও প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেল।

মর্স কংগ্রেস ত্যাগ করে চলে আসবার পরেই কিন্তু তাঁর সেই অর্থ-বিল সিনেটে আলোচিত হয়ে গৃহাত হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি মর্সের জাবনের একটি স্মরণীয় দিন, কারণ সেদিনই সিনেট সেই বিল গ্রহণ করেন; মর্স এসম্বন্ধে সে রাত্রে কিছুই জানতে পারলেন না। ভয়ানক উদ্বেগ ও অশান্তিতে তিনি সমস্ত রাত্রি যাপন করলেন।

পরের দিন তিনি ঘুম হতে উঠে ঘরের বাইরে আসতেই দেখতে পেলেন যে, একটি অল্পবয়স্কা যুবতী, তাঁকে তাঁর বিল সিনেট কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এই সুখবর দিয়ে অভিনন্দন করবার জন্য উপস্থিত। মর্সের এতদিনকার সমস্ত কষ্ট ও পরিশ্রম আজ সার্থকতায় মণ্ডিত হয়ে উঠল। এক পরম আনন্দে তাঁর হৃদয়-মন পূর্ণ হয়ে গেল। তিনি দেখলেন তাঁর অদূর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও রঙ্গীন হয়ে উঠেছে।

মর্স আর নিউইয়র্কে ফিরে না গিয়ে, অবিলম্বে ওয়াসিংটন ও ব্যাল্টিমোরের মধ্যে তাঁর প্রস্তাবিত টেলিগ্রাফ লাইন সংস্থাপনের কার্য্যে নিযুক্ত হলেন। এই সময় তাঁর অংশীদার ভেল তাঁর সর্ব্বপ্রধান সহায় হয়ে দাঁড়ালেন।

প্রথম মর্স টেলিগ্রাফের লাইন মাটির নীচ দিয়ে নিতে চেষ্টা করলেন। তিনি যে টাকা পেলেন তার প্রায় অর্দ্ধেকই এই চেষ্টায় ব্যয়িত হ'য়ে গেল। তাই তখন এই সঙ্কল্প ত্যাগ করে তিনি স্থির করলেন যে মাটিতে খুঁটি পুতে, সেই খুঁটির ওপর দিয়ে তার নিয়ে যাওয়াই সমীচীন হবে, কারণ তাতে ব্যয় খুব কম হওয়ারই কথা। এই উপায়ে এবার তাঁদের লাইন নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হল। যাতে খুঁটির ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ মাটিতে না প্রবেশ করতে পারে এইজন্য প্রত্যেক খুঁটির ওপরে কাঁচ নির্ম্মিত ইনসুলেটার (Insulator) বসাবার বন্দোবস্ত করলেন। ওয়াসিংটন ও ব্যাল্টিমোর এই দুই স্থানে নূতন টেলিগ্রাফযন্ত্র বসান হল। যে যুবতী মর্সকে প্রথম তাঁর বিল পাশের সুখবরটি দেন, তিনিই কি খবর এই লাইনের উপর দিয়ে সর্ব্বপ্রথম প্রেরিত হবে তা বলে দেন। "যা ভগবানের দয়ায় সম্ভব হ'ল"—এই বার্ত্তাটি সর্ব্বপ্রথম প্রেরিত হল' মর্সের টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে। এই প্রথম বার্ত্তাটি প্রেরণের সময় একশ সেলের (cell) ব্যাটারি হতে তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হয়েছিল, ও প্রত্যেক রিলেটা প্রায় ১০০ পাউণ্ড ওজনের ছিল। পরে এই রিলে সংক্রান্ত অনেক দোষ ও অসম্পূর্ণতা দূর করা হয় ও এইরূপ নানাবিধ প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধন দ্বারা মর্স তাঁর যন্ত্রাদি যথাসম্ভব নির্দ্দোষ করে তুলেন।

মর্সের টেলিগ্রাফ লাইন প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই রাষ্ট্রীয় অধিনায়ক মনোনীত করবার জন্য ব্যাল্টিমোরে জাতীয় সঙ্ঘের এক অধিবেশন হয়।

এই সভাতে পল্‌ক (Polk) সভাপতি, ও সাইলাস রাইট (Silas Wright) সহকারী সভাপতি মনোনীত হন। ভেল তারযোগে ব্যাল্টিমোর হতে ওয়াসিংটনে মর্সের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করেন। মর্স সে সংবাদ পেয়েই সাইলাস রাইটকে এই নির্ব্বাচনের কথা বলেন। রাইট তখনই মর্সকে বললেন যে, তিনি সেই পদ গ্রহণ করতে রাজি নন, এই মর্ম্মে একটি তারবার্ত্তা যেন পাঠান হয়। মর্স তাঁর নির্দ্দেশ মত সেই খবরটি ব্যাল্টিমোরে প্রেরণ করেন। ভেল সে সংবাদ পেয়েই তা জাতীয় সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করেন। সঙ্ঘের সদস্যেরা এই খবর কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না। এত অল্প সময়ের মধ্যেই যে ওয়াসিংটনে কোন খবর প্রেরণ করে তার উত্তর পাওয়া যেতে পারে, ইহা তাঁদের কল্পনার অতীত ছিল। এই খবরের সত্যতা নিরূপণের জন্য জাতীয় সঙ্ঘের কয়েকজন সদস্যকে তখনই ওয়াসিংটনে রাইটের নিকট প্রেরণ করা হয়। তাঁরা গিয়ে জানতে পারলেন যে তারের সংবাদ যা ব্যাল্টিমোরে পৌছেছিল তা ঠিকই। এই ঘটনায় মর্সের টেলিগ্রাফ আমেরিকার জনসাধারণের নিকট খুব বিশেষ-রূপে পরিচিত হল, এবং টেলিগ্রাফের প্রতি সকলের শ্রদ্ধাও স্বভাবতই খুব বেড়ে গেল।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল সাধারণের ব্যবহারের জন্য এই টেলিগ্রাফ লাইনটি খোলা হল। ভেলকে করা হল ওয়াসিংটনের প্রথম যন্ত্রের প্রথম কার্য্যকারক (operator)।

এখন 'সাধারণ' তারের খবর পাঠাতে একটি শব্দের জন্য এক আনা করে মাশুল দিতে হয়। আমেরিকায় টেলিগ্রাম পাঠাবার মাশুল এই নূতন লাইনে, প্রথম ধার্য্য হয় প্রত্যেক চারটি শব্দে দুপয়সা করে।

তোমরা শুনে হাসবে যে, এই লাইনে প্রথম চারদিনের আয় হল মাত্র

একসেণ্ট বা দুপয়সা। একদিন একজন লোক তারের খবর কি করে পাঠান হয় তা দেখতে চায়। সে কার্য্যকারককে বলে যে, তার সঙ্গে পয়সাকড়ি কিছু নেই, তাই দয়া করে যেন বিনা মাশুলে একটি খবর পাঠিয়ে তাকে দেখান হয়। কিন্তু বিনা মাশুলে কোন খবর পাঠাবার আদেশ ছিল না। কাজেই ভেল বললেন, "তা' করবার হুকুম নেই।" তখন সে লোকটি পকেটে হাত দিয়ে দেখলে যে তার কাছে মাত্র একটি সেণ্ট আছে। সে তখন ভেলকে বলল, "আমার কাছে মাত্র একটি সেণ্ট আছে এই একসেণ্ট মূল্যের একখানি টেলিগ্রাম পাঠান।" তখনকার দিনে একটি শব্দের প্রত্যেক অক্ষরটি আলাদা আলাদা করে পাঠাবার নিয়ম ছিল না। কতকগুলো সঙ্কেতের একটা তালিকা ছিল, যাতে প্রত্যেক শব্দের প্রত্যেক অক্ষরটি পৃথক্ পৃথক্ করে পাঠাতে যতটা সময়ের প্রয়োজন, তার চাইতে ঢের কম সময়ের মধ্যে সে সমস্ত সঙ্কেতের সাহায্যে সংবাদ পাঠান যেত। যেমন তখনকার দিনে "৪" এই সঙ্কেতটির অর্থ ছিল—"এখন কটা বেজেছে?" ভেল এই ব্যক্তিকে দেখাবার জন্য "৪" এই সঙ্কেতটি তার করলেন। এই সঙ্কেতের উত্তর এল "১", অর্থাৎ একটা বেজেছে। এই একটি মাত্র সঙ্কেত প্রেরণের মাশুল আধ সেণ্ট হলেও, সেই ব্যক্তিটি সন্তুষ্ট মনে তার কাছে যে একটি সেণ্ট ছিল তাই দিয়ে দিল। এই যে একটি সেণ্ট তাই হল সেই টেলিগ্রাফ লাইনের প্রথম চারদিনের আয়। পঞ্চম দিনে এই লাইনের আয় হল সাড়ে বার সেণ্ট। ইহার পরে ক্রমশঃ এই লাইনের আয় বাড়তে লাগল।

এবার মর্স তাঁর টেলিগ্রাফের সমস্ত স্বত্ব গভর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রী করবার প্রস্তাব করেন। যদিও আমেরিকার সকলেই টেলিগ্রাফের উপকারিতা সম্বন্ধে এখন নিঃসংশয় হল, তবু গভর্ণমেণ্টের ভয় হল যে

এরকম টেলিগ্রাফ লাইন রাখতে যা খরচ পড়বে সেই ব্যয় অনুযায়ী আয় হবার সম্ভাবনা নেই। গভর্ণমেণ্ট এই ভয়ে তাঁর স্বত্ব ক্রয় করতে অস্বীকৃত হলেন। কিন্তু দেখতে দেখতে অনেক বে-সরকারী কোম্পানী গঠিত হয়ে উঠল। টেলিগ্রাফ লাইন নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করে, তারা তা থেকে বেশ লাভবান্ হ'তে লাগল। অবিলম্বে দেশের নানা জায়গায় এই টেলিগ্রাফের সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা হল।

টেলিগ্রাফির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আগেকার দিনের সহজ সঙ্কেতের সাহায্যে সমস্ত কার্য্যাদি চালান আর সম্ভব হল না। মর্স এবার প্রত্যেক ইংরাজি বর্ণমালার সঙ্কেত, বিন্দু ও রেখার সাহায্যে সৃজন করে তুললেন। মর্সের এই সব সঙ্কেতই আন্তর্জাতিক "সঙ্কেত বিধি" বলে পরিগণিত হল। এখনকার দিনে এই সাঙ্কেতিক বর্ণমালাগুলি কি উপায়ে প্রেরিত ও গৃহীত হয় সে সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি কথা বলে এই প্রসঙ্গের শেষ করব।

প্রত্যেক টেলিগ্রাফযন্ত্রেরই এক একটি চাবি আছে। এই চাবিটি হারমোনিয়ামের চাবির মতন আঙ্গুলে টিপলে নেমে পড়ে ও ছেড়ে দিলে একটি স্প্রিংয়ের জোরে আপনা হতে উঠে আসে। এই চাবিটি এমন সুন্দর কৌশলে যন্ত্রের মধ্যে বসান থাকে যে, যতক্ষণ তা টিপে রাখা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তারের ভিতর দিয়ে একটি তড়িৎ-প্রবাহ চলে, আর চাবিটি ছেড়ে দিলেই তা উঠে পড়ে ও বিদ্যুৎ-প্রবাহটিও বন্ধ হয়ে যায়। এই চাবিটি যখন মুহূর্ত্তের জন্য টিপে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন যে ষ্টেশনে খবর পাঠান হয় সেখানকার যন্ত্রে একটি বিশেষ রকমের শব্দ হয়। আবার চাবিটি যখন একটু বেশি সময়ের জন্য টিপে রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন তাতে অন্য রকমের আর একটি শব্দের উৎপত্তি হয়। টেলিগ্রাফযন্ত্রে "টরে" ও "টক্কা" এই দুটি শব্দ হয়,—টরে শব্দটি বিন্দুসূচক

ও টক্কা শব্দটি রেখাসূচক। টেলিগ্রাফযন্ত্রে একটি কাগজের ফিতে সংলগ্ন থাকে, যাতে এই "টরে" ও "টক্কা" শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বিন্দু ও রেখাপাত হয়। এই বিন্দু ও রেখাকে নানাভাবে সাজিয়ে নিয়ে, মর্স প্রত্যেক বর্ণমালার এক একটি সঙ্কেত সৃজন করেন, যাকে বলা হয় "মর্সকোড"। এইরূপ সঙ্কেতের সাহায্যেই টেলিগ্রাফে সংবাদের আদান-প্রদান হয়।

এই রেখা ও বিন্দুর সাহায্যে কি সংবাদ এল তা কি করে বোঝা যায় তা' এবার শোন। প্রত্যেক টেলিগ্রামই ইংরাজি বর্ণমালার সাহায্যে প্রেরিত হয়, আর প্রত্যেক বর্ণমালারই এক একটি সাঙ্কেতিক বর্ণমালা আছে,—যেমন "a" অক্ষরের সাঙ্কেতিক বর্ণ হচ্ছে প্রথম একটি বিন্দু ও পরে একটি রেখা (∘—), "b" অক্ষরের সঙ্কেত হল প্রথম একটি রেখা ও পরে তিনটি বিন্দু (—∘∘∘)। এইরূপ প্রত্যেক সংখ্যারও এক একটি সঙ্কেত আছে, যেমন ১ এর সঙ্কেত হল প্রথম একটি বিন্দু ও পরে চারটি রেখা (∘— — — —); ২ এর সঙ্কেত হল প্রথম দুটি বিন্দু ও পরে তিনটি রেখা (∘∘— — —)। সমস্ত ইংরাজি অক্ষর ও সংখ্যার এরূপ সাঙ্কেতিক বর্ণমালা আছে। আর এইরূপ রেখা ও বিন্দুর সাহায্যে প্রেরিত অক্ষরগুলি মিলিয়ে নিয়ে, কি সংবাদ এল তা বুঝে নিতে হয়।

মর্সের জীবিতকালে প্রায় এক লক্ষ মাইল টেলিগ্রাফ লাইন নির্ম্মিত হয়। মর্স প্রথম চিত্রবিদ্যায় খ্যাতি অর্জ্জন করবেন মনে করেছিলেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় তাঁর জীবন অন্য কার্য্যে নিয়োজিত হল। টেলিগ্রাফযন্ত্র উদ্ভাবনের দ্বারা মর্স জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। এই অমূল্য উদ্ভাবনের ফলে তিনি জগদ্বাসীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপ অতুল ও অক্ষয় সম্পদ লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন।

টেলিফোনের কথা

টেলিগ্রাফের কথা তোমাদের আগেই বলেছি। কিরূপে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন খবর এক জায়গা হ'তে অন্য জায়গায় পাঠান হয় তা বোধ করি তোমরা কতকটা বুঝতে পেরেছ। এবার তোমাদের টেলিফোনের কথা বলব। টেলিগ্রাফযন্ত্রের সাহায্যে কতকগুলো সঙ্কেত পাঠান যায়; এবং এরূপ সঙ্কেতের দ্বারা আমরা দূরদেশে খুব ক্ষিপ্রতার সহিত সবরকম খবরই পাঠাতে পারি। এখন যে টেলিফোনের কথা বলব, তার সাহায্যে আমরা তারের ভিতর দিয়ে পাঠাই আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্ত্তা। এই টেলিফোনের দ্বারা আমরা বহুদুর থেকেও পরস্পরের সঙ্গে বেশ কথাবার্ত্তা বলতে পারি।

এখনকার দিনে, রোজ টেলিফোনের ভিতর দিয়ে যে পরিমাণ খবর যাওয়া আসা করে, এত খবর টেলিগ্রাফ কি ডাক—এ দুটোর সাহায্যে দৈনিক যাতায়াত করে না। টেলিফোনযন্ত্রটি কিভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে, পরে এই বিস্ময়কর যন্ত্রের গূঢ় রহস্যটি—কে কোথায় আবিষ্কার করেছিলেন সে গল্পটি তোমাদের বলব।

টেলিফোনযন্ত্রের সাহায্যে এক জায়গা হ'তে কথা বলা হয়, এবং অন্য যে কোন দূরবর্ত্তী জায়গা হ'তে তা শোনা হয়। আমরা ঘরে বসে যেমন পরস্পর কথাবার্ত্তা বলি, বহুদূর থেকেও এই যন্ত্রের সাহায্যে তেমনি আরামে ও সহজে কথাবার্ত্তা বলতে পারি।

যখন আমরা কথা বলি, তখন আমাদের মুখের কাছে থাকে প্রেরক-যন্ত্রটি, আর যাঁর সঙ্গে কথা বলি তাঁর কাণের কাছে থাকে গ্রাহকযন্ত্রটি। এই প্রেরকযন্ত্র ও গ্রাহকযন্ত্রের ঠিক ওপরে বসান থাকে দুখানি খুব পাতলা লোহার পাত, ও একটি সরু তামার তারের দ্বারা এ দুখানি পাত সংযুক্ত থাকে। আবার এই তামার তারটি একটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর সহিত সংযুক্ত থাকে। এই বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর সাহায্যে টেলিফোনের তারের মধ্য দিয়ে একটি বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলাফেরা করে। আমরা যখন কথা বলি তখন আমাদের মুখের কাছের প্রেরকযন্ত্রের পাতলা পাতখানি আমাদের শব্দের আঘাতে কেঁপে ওঠে। আমাদের উচ্চারিত প্রত্যেক শব্দের উচ্চতা, নীচতা, কঠিনতা ও কোমলতা প্রভৃতির প্রকৃতি অনুযায়ী সেই পাতলা পাতখানিতে নানারূপের কম্পন সৃজিত হয়। এই পাতখানির বিভিন্ন রকমেব কম্পন, তামার তারটিতে বিবিধ প্রকারের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃজন করে তুলে। এই তারটির বিভিন্ন রকমের বৈদ্যুতিক তরঙ্গই আবার গ্রাহকযন্ত্রের পাতখানিতেও অনুরূপ কম্পন জাগ্রত করে দেয়। গ্রাহকযন্ত্রের পাতখানি এইভাবে কেঁপে উঠতেই আমাদের প্রত্যেক শব্দটি আকার পেয়ে ওঠে, ও শ্রোতা আমাদের কথা বেশ পরিষ্কার শুনতে পান। এই হল টেলিফোনযন্ত্রের ভিতরকার মোটামুটি কথা।

টেলিফোন উদ্ভাবন সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। য়্যালেকজেণ্ডার গ্রেহাম বেল ও এলিসা গ্রে, দুজনই একই দিনে এই টেলিফোনযন্ত্রের উদ্ভাবক বলে স্বীকৃত হবার জন্য পেটেণ্ট অফিসে আবেদন করেন। ১৮৭৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তাঁরা পেটেণ্ট লাভের জন্য আবেদন করেন। পরে যখন প্রমাণিত হয় যে, গ্রেহাম বেলই এই যন্ত্রের প্রথম উদ্ভাবন করেন, তখন তিনিই টেলিফোনের উদ্ভাবক বলে স্বীকৃত হন।

গ্রেহাম বেলের জীবনী হল একটু অদ্ভুত রকমের। বেল, যুবকদের বাগ্মিতা-কৌশল শিক্ষা দিতেন, অর্থাৎ কিরূপে সুন্দরভাবে বক্তৃতা করতে পারা যায় তা'র উপায় শিক্ষা দিতেন। তিনি মানুষের কণ্ঠ-ধ্বনি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করবার জন্য প্রথম একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। বিদ্যুৎ সম্বন্ধে কোন রকম জ্ঞানলাভের জন্য তাঁর তখন কোন উৎসাহই ছিল না। তাঁর পিতা ও পিতামহ দুজনই মানুষের কণ্ঠধ্বনি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হ'তেই এবিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা পান, এবং শব্দ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অল্প বয়সেই বেশ জ্ঞান লাভ করেন।

বেল স্কট্‌লণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র ষোল বৎসর, তখন থেকেই তিনি বাক্‌পটুতা লাভ করবার বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে একদিন তিনি দেখেন যে, তখনকার দিনের কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, টেলিগ্রাফের তারের উপর দিয়ে সঙ্গীত-ধ্বনি পাঠাবার চেষ্টা করছেন। ইহার অনতিকাল পরেই বেলের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, ও তিনি তাঁর মাতাপিতার সঙ্গে ক্যানেডায় হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য যান। তিনি ক্যানেডা হ'তে কিছুকাল পরে মূক ও বধিরদের শিক্ষা দেবার জন্য বোষ্টনে যান। বোষ্টনে তিনি একজন খুব সমৃদ্ধিশালী লোকের পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত হন ও তাঁর বাড়ীতে থেকেই ছেলেটিকে শিক্ষা দিতেন। সেই বাড়ীর নীচেকার একখানি ছোট ঘর তিনি তাঁর পরীক্ষাগারে পরিণত করে নিলেন, এবং সেই ঘরে তিনি বৈদ্যুতিক ব্যাটারী ও টিউনিং ফর্কের (Tuning Forks) সাহায্যে, দূরে কোনরূপ শব্দ পাঠান যেতে পারে কিনা সে বিষয়ে নানা রকম পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ করলেন।

প্রায় ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত বেল এই পরীক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

টেলিফোন যন্ত্র

গ্রেহাম বেল

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—১০১ পৃঃ
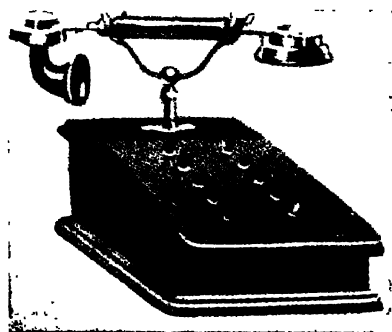
তিনি এমন একটি যন্ত্রের উদ্ভাবন করতে ইচ্ছা করলেন যা টেলিগ্রাফ-যন্ত্রের অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়কর হবে। শুধু সঙ্কেত প্রেরণ নয়,—আমাদের সমস্ত কথাবার্তা, আমাদের কণ্ঠোচ্চারিত সমগ্র স্বরগ্রামের প্রতি পর্দা যেন আমরা ইচ্ছা করলে দূরে পাঠাতে পারি, তার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় তিনি নিমগ্ন হলেন। বেল, মূক-বধির ছেলেদের শিক্ষা দেবার সময়, মানুষের অতি সূক্ষ্ম কর্ণপটহ বাইরের প্রত্যেক শব্দ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে কি ভাবে সাড়া দেয়, তা খুবই মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করেন।

তিনি কর্ণপটহের অনুরূপ করে দুখানি লোহার পাতলা পাত নির্ম্মাণ করলেন, এবং পাতদুখানিকে একটি বিদ্যুন্ময় তারের দুই প্রান্তে সংযুক্ত করে নিলেন। একদিককার একখানা পাত কোন শব্দের আঘাতে কম্পিত হয়ে উঠে, সেই বিদ্যুদ্বাহী তারের সাহায্যে অন্য প্রান্তের পাতখানাতে একটি স্পন্দন জাগ্রিত করে দিয়ে, ঠিক তদনুরূপ শব্দের সৃজন করে তুলতে পারল। এই উপায়ে তিনি প্রথম খুব নিকটের জায়গায় কণ্ঠধ্বনি প্রেরণ করতে পারলেন; কিন্তু দূরবর্ত্তী জায়গায় কি উপায়ে তা প্রেরণ করা যায় এবার তাই ভাবতে লাগলেন। তখন বেলের বয়স প্রায় ২৮ বৎসর।

এসময়ে একবার তিনি ওয়াসিংটনে বেড়াতে যান। ওয়াসিংটনে অবস্থানকালে ঘটনাক্রমে তাঁর সঙ্গে জোসেফ্ হেনরির (Joseph Henry) সঙ্গে দেখা হয়। হেনরি তখনকার দিনে ওয়াসিংটনে তড়িৎ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। হেনরিকে বেল তাঁর কল্পিত যন্ত্র সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই খুলে বলেন। হেনরিও বেলের সব কথাই খুব উৎসুক চিত্তে শুনে, বেলকে বললেন যে, তাঁর এই কল্পিত যন্ত্র উদ্ভাবিত হলে, উহার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ

সাধিত হবে। বেল, হেনরিকে বললেন যে, তিনি তড়িৎ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না বলেই তাঁর যত অসুবিধা। হেনরি উত্তরে বললেন—"আপনি সে জ্ঞান ইচ্ছা করলেই অর্জ্জন করে নিতে পারেন। একটি সুমহান কল্পনা আপনার মনে উদয় হয়েছে।" হেনরির এই উৎসাহ-বাক্যে বেলের প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ়তর হল। তিনি এবার বোষ্টনে ফিরে গিয়ে একখানি ঘর ভাড়া করলেন, এবং তড়িৎ সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য অক্লান্ত ভাবে দিনরাত অধ্যয়নে নিযুক্ত হলেন। এসময়ে তোমাস্ ওয়াটসন নামে তাঁর একজন অনুরক্ত বন্ধু, এসমস্ত পরীক্ষাকার্য্যে তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। তোমাস্ ওয়াটসনের সহায়তায় বেল প্রথম তাঁর Vibrating discs তৈরি করেন।

১৮৭৬ সালে একদিন তাঁরা দুই বন্ধুতে মিলে কাজ করছিলেন। বেল ছিলেন তাঁর পরীক্ষাগারে, ও ওয়াটসন ছিলেন তার পাশের ঘরে। বেল যখন বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর সঙ্গে তারের একদিকটা সংলগ্ন করে দিয়ে, সেই প্রান্তটি বিশেষ করে পরীক্ষা করে দেখছিলেন, তখন তাঁর ঘরের বৈদ্যুতিক তারের সহিত সংলগ্ন লোহার পাত হতে হঠাৎ একটি শব্দ হ'ল। বেল এবার উচ্চস্বরে ওয়াটসনকে ডেকে বললেন যেন তাঁর দিককার তারের প্রান্তভাগ হতে তিনি একটু পূর্ব্বে যেরূপ শব্দ করেছিলেন, ঠিক সেইরূপ শব্দ আবার করেন। এবারও বেল তাঁর ঘরের পাতখানি হতে অবিকল সেই পূর্ব্বের শব্দটি শুনতে পেলেন। যে কোন শব্দ, একটি বিদ্যুদ্বাহী তারের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্তে পাঠান যেতে পারে, এ বিষয়ে তিনি এখন একেবারে নিঃসংশয় হলেন।

বেলের শ্রান্তিহীন পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই সামান্য সফলতা, তাঁকে দ্বিগুণ উৎসাহিত করে তুলল। অবশ্য প্রথম প্রথম তাঁর সেই

লোহার পাত হ'তে একটা উঁচু গোলমেলে রকমের শব্দ ছাড়া পরিষ্কার কিছুই শোনা গেল না।

বেল ভাবলেন যে, মানুষের উচ্চারিত নানা রকমের শব্দগুলি যখন বিভিন্ন প্রকারের কম্পন ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন এক রকম শব্দ-কম্পন যদি এই বিদ্যুন্ময় তার বহন করে নিয়ে যেতে পারে, তবে সব রকমের শব্দ-কম্পনই নিশ্চয় ইহার সাহায্যে পাঠান যেতে পারবে। তাঁর এই সঙ্কল্প অবিলম্বে তিনি কার্য্যে পরিণত করে তুললেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ, তাঁর নূতন যন্ত্রের সাহায্যে তিনি প্রথম কথা বলতে সক্ষম হন। সেদিন তিনি তারের একপ্রান্ত বাড়ীর একেবারে নীচের তলায় রেখে, ওয়াট্‌সনকে সেই প্রান্তে পাঠিয়ে দিলেন, আর তিনি নিজে থাকলেন উপরে, তারের অন্য প্রান্তে। বেল প্রথম কথা বললেন—"ওয়াট্‌সন, উপরে এস কাজ আছে।" ওয়াট্‌সন আনন্দে অধীর হয়ে সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় ছুটে এসে বেলকে বললেন—"আমি তোমার সব কথা বেশ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি।"

এইরূপে প্রথম বেলের টেলিফোনযন্ত্র উদ্ভাবিত হয়। বেলের মানব কণ্ঠ সম্বন্ধীয় জ্ঞান, তাঁকে এই আবিষ্ক্রিয়া কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করে। যাঁরা শুধু বৈদ্যুতিক জ্ঞানের সাহায্যে এরূপ যন্ত্রের উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ উৎপাদন করতে পেরেছিলেন তা ঠিক, কিন্তু তাঁরা মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত প্রত্যেক শব্দের সুপরিস্ফুট বিশিষ্টতাটুকু উৎপাদন করতে পারেন নি। আমাদের উচ্চারিত প্রত্যেক শব্দের এই পরিস্ফুট বৈশিষ্ট্যই, আমাদের পক্ষে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা সম্ভবপর করে তোলে।

বেল, টেলিফোনযন্ত্র উদ্ভাবন করে ভাবতে লাগলেন কি উপায়ে সাধারণের দৃষ্টি তাঁর এই নূতন যন্ত্রের দিকে আকর্ষণ করা যায়।

এসময়, ভগবানের কৃপায়, এমন এক সুযোগ ঘটল যাতে বেলের টেলিফোনযন্ত্র সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করবার বিশেষ সুবিধা হয়ে উঠে।

বেলের এক ছাত্রী ছিলেন মিস্ হাবেল (Miss Hubbel)। মিস্ হাবেল মূক ও বধিরদের শিক্ষা বিষয়ে খুবই উৎসাহী ছিলেন। এসময় মিস্ হাবেলের সঙ্গে বেলের বিবাহ হবে স্থির হয়ে যায়। একারণে মিস্ হাবেলের পিতারও, বেলের উদ্ভাবিত যন্ত্রের প্রতি একটি বিশেষ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়। হাবেলের পিতা ছিলেন সেখানকার একজন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক। তাঁরই বিশেষ চেষ্টায় বেলের নূতন টেলিফোন, ফিলেডেলফিয়ার প্রাদেশিক প্রদর্শনীতে দর্শনীয় রূপে একটি স্থান পেল। শীঘ্রই মিস্ হাবেল, তাঁর পিতা ও বেল এই প্রদর্শনী উপলক্ষে ফিলেডেলফিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন।

ফিলেডেলফিয়ার প্রদর্শনীতে বেলের টেলিফোন স্থাপিত হবার পরে, সে যন্ত্রটিকে একটি বাজে খেলনা মনে করে সকলেই তা' অগ্রাহ্য করতে লাগল। এমন কি প্রদর্শনীর কর্তারাও এই যন্ত্রটিকে খেলনার সামিল করে দেখলেন।

একদিন বেল তাঁর যন্ত্রের নিকট দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় ব্রাজিলের সম্রাট্ প্রদর্শনীর সেপাশ দিয়ে যাবার পথে হঠাৎ বেলকে দেখলেন, ও তাঁকে দেখেই চিনতে পারলেন। ব্রাজিলের সম্রাট্, একবার মূক ও বধির বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে যান। বেল ছিলেন তখন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সেখানেই বেল সম্রাটের সহিত পরিচিত হন।

সম্রাট্ বেলের কাছে এসেই তাঁকে বললেন—"আপনার টেলিফোন-যন্ত্রের কথা আমি শুনতে চাই।" এই বলে তিনি টেলিফোনের

পরিগ্রাহকটি (Receiver) কাণের কাছে ধরলেন। বেলের একজন কর্ম্মচারী টেলিফোনের অপর প্রান্ত হতে কথা বল্লেন। সম্রাট্ পরম বিস্ময়ে ও আনন্দে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন—"এ কি! এ যে দিব্যি কথা বলে!" তখন সম্রাটের সঙ্গে ছিলেন সেই জোসেফ হেনরি যাঁর সঙ্গে ওয়াসিংটনে বেলের পরিচয় হয় এবং সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin)। লর্ড কেলভিন টেলিফোনের কথা শুনে বললেন যে, এমন বিস্ময়কর দ্বিতীয় কোন জিনিষ তিনি আমেরিকায় আর কখনও দেখেন নি।

এবার বেলের কপাল ফিরে গেল। এই বিখ্যাত কয়েকজন লোক বেলের টেলিফোনের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়াতে, সেই শতবার্ষিক প্রদর্শনীতে বেলের টেলিফোনযন্ত্রই অচিরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনীয় বস্তু বলে গণ্য হয়ে উঠল। খেলনা ভেবে সকলেই যা তুচ্ছ করে যাচ্ছিল, এ ঘটনার পরে, সেই খেলনাই সব চাইতে সেরা জিনিষ হয়ে দাঁড়াল।

বৈজ্ঞানিকেরা এই যন্ত্রটি দেখে প্রীত হলেও, যাঁরা ব্যবসায়ী লোক তাঁরা ভাবলেন ইহা দ্বারা কোন প্রয়োজনই সাধিত হবে না, ইহা দেখতেই যা বেশ। তখনকার দিনের ব্যবসায়ীরা যা' একান্ত তুচ্ছ মনে করলেন, সেই টেলিফোনই এখনকার দিনে ব্যবসায়ীদের একান্ত অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে।

বেলের ব্যবসায়-বুদ্ধি খুব সামান্যই ছিল, ও তাঁর হাতে পয়সাকড়িও এমন বেশি কিছু ছিল না যাতে এই যন্ত্রটিকে চারদিকে পাঠিয়ে, বিশেষ ভাবে তার বিক্রীর চেষ্টা করতে পারেন। তিনি টেলিফোন সম্বন্ধে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করলেন, ও যতটা পারেন এ সম্বন্ধে দেশে দেশে ঘুরে বক্তৃতা করতে লাগলেন। বেলের প্রচার কার্য্যের ফলে, আট মাসের মধ্যেই প্রায় সাত শত টেলিফোন দেশের নানা

জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হল। দেখতে দেখতে চারদিকে এই টেলিফোন-যন্ত্রের ব্যবহার বাড়তে লাগল, এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই ইহার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা পৃথিবীব্যাপী হয়ে পড়ল।

এখনকার দিনে রেডিওতে মানুষের কথাবার্ত্তা, গানবাজনা, বক্তৃতা প্রভৃতি চারদিকে প্রেরিত হবার নূতন যন্ত্রাদি উদ্ভাবিত হয়েছে, এবং এই বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে ঘরে বসেই এসব আমরা শুনতে পাই; কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই টেলিফোনকে লোকে পরম বিস্ময়কর বলে মনে করত। ইহা মানুষকে উন্নতি ও সভ্যতার পথে এগিয়ে দিতে কি পরিমাণ সহায়তা করেছে তা' আজকের এই বেতারবার্ত্তার দিনে আমরা যেন না ভুলি।

বেতারবার্ত্তা ও মার্কণি

তোমাদের টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের কথা আগেই বলেছি। টেলিগ্রাফে কোন খবর পাঠান কি টেলিফোনে কোন কথাবার্ত্তা বলা সম্ভব হয়, যখন দু'টো ষ্টেশনের দুই "সেট্" যন্ত্র কোন তারের দ্বারা সংযুক্ত থাকে। টেলিগ্রাফ কি টেলিফোনের তার যদি কোন কারণে ছিঁড়ে যায়, কি খারাপ হয়ে যায়, তখন আর টেলিগ্রাফে খবরও পাঠান যায় না কিংবা টেলিফোনে কথাবার্ত্তা কওয়াও চলে না।

এখন যে বিনাতারে বার্ত্তা প্রেরণের কথা বলব, তা'তে আর এরকম কোন তারের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। বেতারবার্ত্তা এক অদৃশ্য বাহনের সাহায্যে যেখানে সেখানে আসা যাওয়া করতে পারে। এই অদৃশ্য বাহনটির কথা, ও এই বেতারবার্ত্তার ভিতরকার কৌশলটির বিষয় তোমাদের পরে বলব। তার পূর্ব্বে যাঁর অক্লান্ত সাধনা ও অফুরন্ত উৎসাহের ফলে বর্ত্তমান সময়ে বিনাতারে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ সম্ভবপর ও এমন সহজ হ'য়ে উঠেছে, সেই মনস্বী মার্কণি সম্বন্ধে দু' একটি কথা তোমাদের বল্‌ছি।

গুলিয়েলমো মার্কণি (Guglielmo Marconi) বোলনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গাইসেপি ছিলেন ইটালীদেশীয় ও তাঁর মাতা ছিলেন আয়র্লণ্ডবাসী এণ্ড্রু জেম্‌সেনের কন্যা কুমারী এনি জেম্‌সেন্। গাইসেপির দুই পুত্রের মধ্যে মার্কণিই হলেন কনিষ্ঠ।

বাল্যকাল হ'তে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা মার্কণির খুবই প্রবল ছিল। তাঁর একান্ত ব্যগ্রতা ও চেষ্টার ফলে তিনি অল্প বয়সেই বিজ্ঞান সম্বন্ধে এতটা জ্ঞান অর্জ্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, তাঁর বয়স যখন মাত্র একুশ তখনই তিনি বিনাতারে সংবাদ প্রেরণের এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন।

ঈথর-তরঙ্গের সাহায্যে বিনাতারে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করা হয়। মার্কণির পূর্ব্বে কয়েকজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এই ঈথর-তরঙ্গের আবিষ্কার করেন, এবং সে সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষাকার্য্যও সম্পন্ন করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ও ক্রুক্‌স্ ঈথর-তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। সুবিখ্যাত জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক হার্টজ (Hertz) একটি অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করে, তার দ্বারা সর্ব্বপ্রথম ঈথর-তরঙ্গ উৎপন্ন কর্‌তে সমর্থ হ'ন। নানারকমের পরীক্ষা দ্বারা ঈথর-তরঙ্গের প্রকৃতি ও বিশেষত্ব আবিষ্কার করে, তিনি বিশদভাবে তা বর্ণনা করেন। হার্টজ বলেন এই ঈথর-তরঙ্গের দ্বারা ভবিষ্যতে অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদিত হবে। অলিভার লজ্ এবং পপফ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্ম্মাণ করে, এ সম্বন্ধে আরও নানা রকম পরীক্ষা কার্য্য সম্পাদন করেন, ও এ বিষয়ে আরও কয়েকটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। হার্টজ ঈথর-তরঙ্গ সৃজনের উপায় উদ্ভাবন করবার পরে প্রায় নয় বছর কেটে গেল, কিন্তু কেউ এই হার্টজ-তরঙ্গকে কোনও একটি প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিয়োজিত করতে পারলেন না।

ঈথর-তরঙ্গের সাহায্যে কোনপ্রকার বিশেষ সঙ্কেত প্রেরণ করা যেতে পারে এই চিন্তাটি প্রথম আমাদের দেশের বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের মনে উদিত হয়। তিনি এরূপ খবর প্রেরণের জন্যে একটি ছোট খাট যন্ত্রেরও উদ্ভাবন করেন। কিন্তু এবিষয়ে তিনি আর অধিকদূর অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করেন নি। মনীষী মার্কণির মনে এই ঈথর-তরঙ্গের সাহায্যে সঙ্কেত প্রেরণের চিন্তাটি একটি মূর্ত্ত ও কার্য্যকরী আকার ধারণ করে। তিনিই হার্টজ-তরঙ্গের সাহায্যে বিনাতারে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করা সম্ভবপর করে তুললেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে, একদিন ঈথর-তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষাকার্য্য করতে গিয়ে

মার্কণির হঠাৎ এই মনে হ'ল যে, এই তরঙ্গের সাহায্যে দূর দেশান্তরে সংবাদ প্রেরণ করা হয়ত সম্ভবপর হ'বে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তিনি একার্য্যে সফলতা লাভ করবার জন্য তাঁর পিতার পন্‌লেচিওস্থ (Ponlechio) পল্লীভবনে নানারকমের পরীক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

ঈথর-তরঙ্গ সৃজন করবার জন্য, হার্টজ একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেছিলেন। মার্কণি হার্টজের সেই যন্ত্রের অনুকরণে আর একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করে নিলেন। মার্কণি দেখলেন এরূপ যন্ত্রের সাহায্যে যে ঈথর-তরঙ্গ সৃজিত হয়, তা' বেশি দূরে যেতে পারে না। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন কি উপায়ে এই ঈথর-তরঙ্গকে খুব দূরে প্রেরণ করা যেতে পারে। রুশিয়ার বৈজ্ঞানিক পপফ (Popoff) ইতিপূর্ব্বে একটি খুব উঁচু মাস্তুলের মাথায় একখানি তার ঝুলিয়ে দিয়ে, সেই তারের সাহায্যে আকাশ হ'তে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। মার্কণি ভাবলেন যদি এরূপ তারের সাহায্যে আকাশ হ'তে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করা যেতে পারে, তবে সেই তারে বৈদ্যুতিক কম্পন সঞ্চার করে, তা' হ'তে দূরদূরান্তরে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছড়িয়ে দেওয়া হয় ত সম্ভব হতে পারে। তিনি খুব উঁচুতে একখানি তার ঝুলিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, এই উপায়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ অনেক দূরে পাঠান যায়। ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক ব্রাঁলি (Branley) ঈথর-তরঙ্গ গ্রহণ করবার জন্য যে সংযোজক যন্ত্র বা কোহেরার (Coherer) উদ্ভাবন করেন, মার্কণি সে যন্ত্রের সাহায্যে এরূপ ছড়ানো ঈথর-তরঙ্গ কুড়িয়ে নিতে সমর্থ হ'লেন। এরকমের কাঁচা ও অপরিণত যন্ত্রাদির দ্বারা তিনি এ বিষয়ে যেরূপ ফললাভ করলেন, তা'তে তিনি নিজেই বিস্মিত হয়ে গেলেন। মার্কণি অল্পদিনের মধ্যে তাঁর যন্ত্রাদির এমন উন্নতি বিধান

করলেন যে, এক বৎসরেই তিনি এক মাইলের মধ্যে বিনাতারে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করতে সমর্থ হলেন।

যখন মার্কণি তাঁর যন্ত্রের ঈথর-তরঙ্গ প্রেরক ও ঈথর-তরঙ্গ সংগ্রাহক আকাশ-তারগুলোকে বহু উর্দ্ধে স্থাপন করে, নীচেকার প্রজনক যন্ত্রের (Generator) ও পরিগ্রাহক যন্ত্রের (Receiver) ভিতর দিয়ে নিয়ে মাটির সঙ্গে তা' সংযুক্ত করে দিলেন, তখন তাতে তিনি অত্যাশ্চর্য্য ফললাভ করলেন। এই নূতন পরীক্ষাক্রিয়াটি তাঁকে এ বিষয়ে আরও বহুদূর অগ্রসর করে দিল।

১৮৯৬ সালে মার্কণি ইংলণ্ডে গমন করেন, এবং সে বৎসরই তাঁর উদ্ভাবিত নূতন বেতার টেলিগ্রাফযন্ত্রের পেটেণ্ট লাভ করেন। মার্কণি ইংলণ্ডে এসে, প্রথমতঃ ডাক-বিভাগের কর্ত্তা ও ব্রিটিশ ও বিদেশীয় শাসন বিভাগের প্রতিনিধিবর্গের সম্মুখে তাঁর এই অভিনব যন্ত্রের কার্য্য প্রদর্শন করে তাঁদের সকলকেই বিস্মিত করেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি ব্রিষ্টল প্রণালীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে বিনাতারে সংবাদ প্রেরণ করতে চেষ্টা করেন এবং সেকার্য্যে সফলকাম হন।

১৮৯৭ সালে ইটালীর সম্রাটের অনুরোধে তিনি স্পেজিয়া গমন করেন, ও সেখানে সমুদ্রতীরের উপর একটি বেতার টেলিগ্রাফের ষ্টেশন প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ষ্টেশন হ'তে বার মাইল দূরস্থ যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে বিনাতারে সংবাদ আদান-প্রদানের এবার উপায় হল। ইহার পরে তিনি আবার ইংলণ্ডে ফিরে যান, এবং ১৮৯৮ সালে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য প্রথম তার-হীন টেলিগ্রাফের প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০৯ সালে মার্কণি আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে, দক্ষিণ করণওয়াল (Cornwall) হতে প্রেরিত এক বেতারবার্ত্তা, আমেরিকার

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের অন্তর্গত সেণ্টজন্স (St. Johns) সহর হ'তে গ্রহণ করতে সমর্থ হ'লেন। তিন হাজার মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হ'তে বেতারবার্ত্তা গ্রহণ করতে পেরে তাঁর কি পরিমাণ আনন্দ হ'ল তা তোমরা সহজেই কল্পনা করতে পার। যেদিন প্রথম তিনি করণওয়াল হ'তে প্রেরিত বেতারবার্ত্তা সেণ্টজন্স থেকে গ্রহণ করতে সমর্থ হন, সেদিনকার ঘটনাটি তোমাদের বলছি।

মার্কণি দক্ষিণ করণওয়াল হ'তে রোজই একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেণ্টজন্সে তাঁকে একটি বিশেষ সঙ্কেত প্রেরণের সমস্ত বন্দোবস্ত করে, নিজে সেণ্টজন্স চলে আসেন। এই সঙ্কেতটি গ্রহণ করবার জন্য একদিন তিনি তাঁর সেণ্টজন্সের বাড়ীর একটি ঘরে বসলেন, ও তাঁর যন্ত্রটি একটি জানালার সম্মুখস্থ টেবিলের ওপর রাখলেন। সেই যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত একখানি সুদীর্ঘ তারের সাহায্যে তিনি একটি বেশ বড় ঘুড়ি আকাশে উড়িয়ে দিলেন। ঘুড়িখানি প্রায় চারশ' ফিট ওপরে উঠে উড়তে লাগল। তিনি যন্ত্রের পরিগ্রাহকটি (Receiver) ধরে কাণে লাগিয়ে রাখলেন। সে ঘরে তাঁর সহকারী কেম্প (Kemp) ছাড়া তখন আর কেউ ছিল না। তারের সাহায্যে ঘুড়ি ওড়াবার কথা বোধ করি ইতিপূর্ব্বে তোমরা কেউ শোননি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের অনেক সময় এরকমের অনেক অদ্ভুত কাণ্ড করতে হয়। মার্কণি হঠাৎ তাঁর সেই বিশেষ সাঙ্কেতিক শব্দটি শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর সহকারী কেম্পের হাতে টেলিফোনের পরিগ্রাহকটি দিয়ে বললেন—"দেখ দেখি কেম্প, কিছু শুনতে পাও কিনা।" কেম্প তাঁর হাত হ'তে পরিগ্রাহকটি নিয়ে শুনতে চেষ্টা করলেন, ও অচিরে আনন্দে অধীর হ'য়ে মার্কণিকে বললেন যে, তিনি খুব স্পষ্ট তিনটি টিক্ টিক্ টিক্ এরূপ শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। এরূপ তিনটি

শব্দই মর্সের সাঙ্কেতিক বর্ণমালার একটি অক্ষর S। আর এই বিশেষ সঙ্কেতটিই মার্কণি দক্ষিণ করণওয়াল হতে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে-ছিলেন। এই সাঙ্কেতিক শব্দটি বার বার প্রেরিত হ'তে লাগল, আর মার্কণি ও তা' প্রতিবারেই বেশ স্পষ্ট শুনতে পেলেন। এসম্বন্ধে মার্কণির আর কোন সন্দেহ রইল না। তাঁর পক্ষে ১৯০১ সাল একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর, কারণ সে বৎসরই তিনি তিন হাজার মাইল দূরবর্ত্তী আট্‌লান্টিক মহাসাগরের অপর প্রান্ত হ'তে প্রেরিত বেতারবার্ত্তা গ্রহণ করতে সমর্থ হন। এই বার্ত্তা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর একটি তথ্যেরও প্রমাণ পেলেন যে, দূরত্ব কি পৃথিবীর বক্রতা ঈথর-তরঙ্গের কোন রকম গতিরোধ করতে পারেনা, ও পৃথিবীর যে কোন জায়গা হ'তে অন্য যে কোন জায়গায় তারহীন টেলিগ্রাফের সাহায্যে সংবাদ গ্রহণ ও প্রেরণ করা সম্ভব। তাঁর এই কৃতকার্য্যতার সংবাদ দেখতে দেখতে ইউরোপ ও আমেরিকার সব জায়গায় প্রচারিত হ'য়ে গেল। ইউরোপ ও আমেরিকার নানা জায়গা হ'তে অভিনন্দন-সূচক অসংখ্য টেলিগ্রাম ও পত্রাদি তাঁকে যেন ছেকে ধরল। সংবাদপত্রে এসম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে পাঠাবার অনুরোধ-উপরোধে তিনি একেবারে হাঁপিয়ে উঠলেন। এবার যখন তিনি নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ছাড়লেন তখন পথে তাঁর ট্রেন যে যে ষ্টেশনে থামল, প্রত্যেক ষ্টেশনেই এই সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভাবনকর্ত্তাকে দেখবার জন্য অগণিত লোকের সমাবেশ হ'ল, ও সেই বিপুল জনতার সম্মিলিত জয়ধ্বনি আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত করে তুলল।

তারহীন টেলিগ্রাফের কার্য্যকারিতার প্রতি আর এখন কারও কোনরূপ সন্দেহ রইল না। ইউরোপ ও আমেরিকার নানা জায়গায় এবার বেতার টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠার সমারোহ পড়ে গেল। মার্কণির বেতারবার্ত্তা প্রেরণের কৃতকার্য্যতার সংবাদ প্রথম তারহীন টেলিগ্রাফে

তাঁর পিতামাতার নিকট প্রেরিত হয়। রাজকীয় কার্য্যসংক্রান্ত প্রথম বেতারবার্ত্তা প্রেরণ করেন আমেরিকার সভাপতি রুসভেল্ট, সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের নিকট।

আজ যে বেতার যন্ত্রাদির (Wireless set) সাহায্যে বহুদূরের কথা-বার্ত্তা, গানবাজনা ও বক্তৃতা প্রভৃতি তোমরা ঘরে বসে সব শুনতে পাও, তাও মার্কণির এই বেতার টেলিগ্রাফির সাফল্য হতে সম্ভব হয়েছে।

এখন দেখা যাক বিনাতারে কি করে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়। এ বিষয়টি একটু কঠিন। তোমরা বড় হ'লে তা ভালরূপে বুঝতে পারবে। তবু তোমাদের মধ্যে হয়ত অনেকের এখনই এসম্বন্ধে কিছু জানতে ইচ্ছে করছে, তাই এসম্বন্ধে সরলভাবে মোটামুটি কয়েকটি কথা বলছি। আশা করি তোমরা এর ভিতরকার রহস্যটুকু একটু বুঝতে পারবে।

আমাদের চারদিক, এবং আমাদের ওপরকার অসীম নীল আকাশ যেখানে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগণিত গ্রহ নক্ষত্র নিয়ত স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে ঘোরাফেরা করে বেড়াচ্ছে, এই অসীম বিশ্বমণ্ডলকে পূর্ণ করে, পরিব্যাপ্ত করে আছে এক বিরাট, বিশাল ঈথর-সমুদ্র। এই ঈথর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বিশেষ কিছুই নাই। বাতাস জিনিষটির অস্তিত্ব আমরা নানাভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু এই ঈথর বস্তুটি সম্বন্ধে শুধু ইহা আছে, এ ছাড়া আর বিশেষ কিছু জানতে পারিনা, কারণ এবস্তুটি আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কোন ইন্দ্রিয়ের কাছে কিছুতেই ধরা দেয় না। পরম রহস্যময় এই বস্তুটি!

পৃথিবীর ওপরে বড় বেশি এক'শ কি দু'শ মাইল পর্য্যন্ত বায়ুর বিস্তৃতি। তার ওপরে শূন্য আকাশ, এই ছিল পূর্ব্বে সকলের ধারণা। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা গভীর গবেষণা ও নানারকম পরীক্ষাকার্য্যের দ্বারা

বুঝতে পারলেন, যাকে সকলে শূন্য ব'লে কল্পনা করত, সত্য সত্য তা' শূন্য নয়। এই আকাশবাতাস এবং বিশ্বচরাচরকে পূর্ণ করে, আচ্ছন্ন করে রয়েছে এক সুবিশাল বস্তু, যার নাম দিলেন তাঁরা ঈথর।

নানা রকম পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে তাঁরা এই বিরাট ঈথর-সমুদ্রের মধ্যে আবিষ্কার করতে সমর্থ হ'লেন এক অপরূপ তরঙ্গের খেলা। তাঁরা এই বিচিত্র তরঙ্গের নাম দিলেন ঈথর-তরঙ্গ।

সূর্য্যরশ্মি আমাদের কাছে এসে পৌঁছবার পূর্ব্বে, তাকে এই বিশাল ঈথর-সমুদ্র অতিক্রম করে আস্‌তে হয়। সূর্য্যরশ্মি ঈথরের মধ্য দিয়ে আসবার পথে, তা'র তীব্র গতিবেগ ঈথর-রাজ্যে একটি চঞ্চল তরঙ্গপ্রবাহ সৃজন করে তোলে। এরূপ তরঙ্গগুলিকে প্রথম আবিষ্কার করতে সমর্থ হন বৈজ্ঞানিকেরা, একথা পূর্ব্বেই বলেছি। একবার এই ঈথর-তরঙ্গের খোঁজ পেয়ে, তাঁরা এ সম্বন্ধে আরও বেশি জ্ঞান লাভ করবার জন্য খুবই ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সুবিখ্যাত জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক হার্টজ এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা, পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাকার্য্য দ্বারা বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করতে সমর্থ হন। হার্টজ্ প্রমাণ করেন যে, যেমন পুকুরের জলে একটা ঢিল নিক্ষেপ করলে, সেই আহত স্থানের চারিদিকে বৃত্তাকারে কতকগুলো ঢেউ বিকীর্ণ হতে থাকে, ঠিক তেমনি, বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের আঘাতেও ঈথর-সমুদ্রে কতকগুলো তরঙ্গ সৃষ্ট হয় এবং সে তরঙ্গগুলিও বৃত্তাকারে চারিদিকে প্রসারিত হ'তে থাকে।

এরূপ অতি দ্রুতকম্পনশীল কতকগুলো ঈথর-তরঙ্গ আলোক সৃজন করে, আর কতকগুলো তরঙ্গ যাহা অতটা দ্রুত কম্পনশীল নয়, তাতে সৃষ্ট হয় উত্তাপ, আবার অন্য প্রকৃতির কতকগুলো তরঙ্গ বিদ্যুৎরূপে প্রকাশ পায়। যদি ঈথর ৪৩৫ ট্রিলিয়ন বার প্রতি সেকেণ্ডে কম্পিত হ'য়ে

ওঠে, তবে তাতে আমরা দেখি লাল আলো, যদি তা প্রতি সেকেণ্ডে ৭৩৫ ট্রিলিয়ন বার কম্পিত হয়ে ওঠে তবে আমরা দেখি বেগুনে রঙের আলো। আবার যদি তা' ২৩০ মিলিয়ন বার প্রতি সেকেণ্ডে কম্পিত হ'তে থাকে, তবে তা'তে সৃষ্ট হয়ে ওঠে হার্টজ-তরঙ্গ, যার সাহায্যে সম্ভব হ'য়ে উঠেছে মার্কণির এই বেতারবার্ত্তা প্রেরণ।

ঈথর জিনিষটি বায়ু নয়। বায়ু ও ঈথর এ দু'টি যে একেবারে আলাদা জিনিষ তা মনে রাখবে। বায়ুর কম্পনের দ্বারা শব্দের উৎপত্তি হয়। বায়ু যদি না থাকতো তবে আমাদের পক্ষে কোন শব্দই শোনা সম্ভব হ'ত না। বায়ুতরঙ্গগুলো ঈথর-তরঙ্গ হ'তে অনেক ধীরগতিতে চলে। আমরা আকাশে যে বিজলীর প্রকাশ দেখি সেই বিজলীর আলো আমাদের কাছে আসে এই ঈথর-তরঙ্গের সাহায্যে। আর মেঘগর্জ্জনের শব্দ আমাদের কাছে নিয়ে আসে বায়ু-তরঙ্গ। ঈথর-তরঙ্গের গতিবেগ বায়ু-তরঙ্গের গতিবেগ অপেক্ষা বেশি বলে, আগে আমাদের কাছে এসে পৌছয় বিজলীর চমক, আর পরে আমরা শুনি বাজের শব্দ।

মার্কণি কি উপায়ে প্রথম এই বেতারবার্ত্তা পাঠাবার ভাষা সৃজন ক'রে তুললেন তা এখন শোন। প্রথমত তাঁর বাড়ীর প্রাঙ্গনে, তিনি কয়েকটি খুঁটি পুতে তার ওপর টিনের কয়েকটা বাক্স লাগিয়ে দিলেন, ও আর একটি খুব উচু খুঁটি পুতে, তা'থেকে একখানি তার ঝুলিয়ে দিলেন। পরে বৈদ্যুতিক ব্যাটারী হতে একটি তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চার করে, সেই তারের সাহায্যে প্রবাহটি ঈথর রাজ্যে সংক্রমিত করবার ব্যবস্থা করলেন। আবার এই তড়িৎ-প্রবাহটি যখন খুসি বন্ধ করে দেবার জন্য টেলিগ্রাফযন্ত্রের চাবির মতন একটি চাবি নির্ম্মাণ করলেন। এইরূপে তড়িৎ প্রবাহের সঞ্চার ও প্রতিরোধের দ্বারা তিনি "মর্স কোডের" সমস্ত বর্ণমালাগুলির এক একটি সঙ্কেত সৃজন করে তুললেন।

এরূপ সাঙ্কেতিক বর্ণমালার সাহায্যে আকাশ-পথে কোন বার্ত্তা প্রেরণ করা খুব সহজ হ'ল ঠিক, কিন্তু সেই প্রেরিত বার্ত্তা যথাযথভাবে গ্রহণ করার উপায় উদ্ভাবন করাই হল কঠিন। এই বেতারবার্ত্তা গ্রহণ করবার একটি যন্ত্র প্রথম উদ্ভাবন করেন ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক ব্রাঁলি। মার্কণি এই যন্ত্রটির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও উন্নতি বিধান করে, তাঁর একাজের জন্য তা' খুব উপযোগী করে তুললেন। যন্ত্রটির নাম হ'ল সংযোজক যন্ত্র বা কোহেরার (Coherer)। কোহেরারটি হচ্ছে এই বেতারবার্ত্তার একটি প্রধান ও একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র। তা' দেখতে ঠিক পেন্সিলের আকারের একটি সরু স্ফটিকের নলের মত। দৈর্ঘ্যে যন্ত্রটি একটি পেন্সিলের অর্দ্ধেক এরকম হবে। এই সরু টিউবটির দুই প্রান্তভাগ রূপোর ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়, ও তার মাঝখানে সামান্য একটুখানি জায়গাতে থাকে রূপো ও নিকেলের চূর্ণ। এই নিকেল ও রূপোর চূর্ণ যখন সম্মিলিত হয়, তখন তার ভিতর দিয়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ খুব সহজে যেতে পারে। বেতারবার্ত্তার প্রেরকযন্ত্র (Transmitter) যখন বহু সহস্র যোজন দূর হতে ঈথরতরঙ্গ সঞ্চারিত করে, তখন সেই তরঙ্গগুলো এসে গ্রাহক যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত আকাশ-তারে আঘাত করেই বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। আর এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গগুলো এসে যেন ঝাঁকা দিয়ে কোহেরারের অন্তর্গত নিকেল ও রূপোর গুঁড়োগুলিকে মিশিয়ে নিয়ে, তার ভিতর দিয়ে গিয়ে মার্কণির গ্রাহকযন্ত্রে ধরা দেয়। এই রূপে একটি তরঙ্গ আসবার পরেই, আবার আর একটি যন্ত্রের সাহায্যে সেই মিশ্রিত চূর্ণগুলি নিমিষে পৃথক হয়ে পড়ে, ও তখনই দ্বিতীয় আর একটি তরঙ্গ আবার তেমনি তাদের মিশিয়ে নিয়ে আপনার পথ করে নেয়, ও মার্কণির গ্রাহকযন্ত্রকে চালিত

করে। এইভাবে, প্রেরিত বার্ত্তার প্রত্যেক তরঙ্গটি আসে ও আমরা গ্রাহকযন্ত্রের সাহায্যে তা ধরতে পারি।

যখন বিনাতারে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করা সম্ভব হ'ল, তখন প্রশ্ন উঠল, এই উপায়ে যে সংবাদ আমরা পাব, যে কোন লোক ইচ্ছা করলে ঠিক এরূপ আর একটি যন্ত্রের সাহায্যে, তা' যখন যে কোন জায়গা হতে গ্রহণ করতে পারবে, তখন কোন গোপনীয় সংবাদ বেতার টেলিগ্রাফযোগে কি করে পাঠান যেতে পারে। মার্কণি ভেবেচিন্তে তারও উপায় উদ্ভাবন করলেন। এই উদ্ভাবিত নূতন কৌশলটি হ'ল "টিউনার।"

যখন দুটি ষ্টেশনের মধ্যে কোন বেতারবার্ত্তা প্রেরণ ও গ্রহণের প্রয়োজন হয়, তখন দুদিককার যন্ত্রদুটিকে এমন সমভাবে মিলিয়ে নিতে হয় যেন একদিককার যন্ত্রপ্রেরিত বিশেষ দৈর্ঘ্যের ঈথর-তরঙ্গ অন্য দিককার সমভাবাপন্ন যন্ত্রকেই চালিত করে, কিন্তু অসমভাবাপন্ন অন্য কোন যন্ত্রের ওপর কোন কাজই করতে না পারে। এই উপায়ে দুই ষ্টেশনের দুটি যন্ত্রকে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত করে মিলিয়ে নেওয়াকে বলা হয় সুর-বাঁধা বা "টিউনিং।" "টিউনিং" হচ্ছে বেতারবার্ত্তা সম্বন্ধে মার্কণির একটি শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন। এই উদ্ভাবিত নূতন কৌশলের দ্বারা প্রেরকযন্ত্র (Transmitter) হ'তে ইচ্ছামত একটি বিশেষ দৈর্ঘ্যের—যেমন ৩০০, ৩৫০ কি ৪০০ মিটার দীর্ঘ—ঈথর-তরঙ্গ প্রেরণ করা সম্ভব হয়; এবং গ্রাহকযন্ত্রটিও প্রেরক যন্ত্রটির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপ মিলিয়ে নিয়মিত করে নেওয়া হয় বলে, প্রেরকযন্ত্রের সেই বিশেষ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের আঘাতে তা' ঠিক মত সাড়া দিতে পারে। এরূপ যুগ্ম যন্ত্রদ্বয়ের দ্বারা ইচ্ছানুরূপ দৈর্ঘ্যের ঈথর-তরঙ্গের সাহায্যে যে কোন গোপনীয় সংবাদ আদান-প্রদান করা এখন সম্ভব হয়েছে। বেতার টেলিগ্রাফিতে এখনকারদিনে কোন বিশেষ সঙ্কেতের দ্বারাও গোপনীয় সংবাদ পাঠান যেতে পারে।

হার্টজ-তরঙ্গ আলোকতরঙ্গের মত খুবই দ্রুতগামী। এই হার্টজ তরঙ্গগুলি প্রতি সেকেণ্ডে পৃথিবীর চারদিকে প্রায় আটবার ঘুরে আসে। এখন বুঝতে পার কেমন তীব্রগতিতে এই সব ঢেউগুলো চলাফেরা করে। এই তরঙ্গগুলোই মার্কণির বেতারবার্ত্তার বাহন।

এখনকারদিনে প্রত্যেক বেতারটেলিগ্রাফ ষ্টেশনে সমুচ্চ স্তম্ভের ওপর কতকগুলো তার বসানো থাকে। এই তারগুলোকে বলা হয় আকাশ তার বা য়্যান্‌টেনে (antennae)। জাহাজে, এই আকাশ তার মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়।

যদি কোন বিশেষ জায়গায় বেতারবার্ত্তা পাঠাতে হয়, তবে যন্ত্রের কার্য্যকারক (operator) তাঁর যন্ত্রের সহিত য়্যান্‌টেনের যোগসাধন করে দিয়ে, তা আবার মাটির সঙ্গে সংলগ্ন করে দেন, এবং পরিগ্রাহকটি (Receiver) কাণের কাছে ধরে থাকেন। তিনি যে ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণ করতে ইচ্ছা করেন, সে ষ্টেশনের যন্ত্রের অনুরূপ শক্তিতে তাঁর পরিগ্রাহকযন্ত্রটিকে নিয়মিত করে নিয়ে, প্রথম সে ষ্টেশনে কয়েকটি সঙ্কেত পাঠান। যখন তিনি এই সঙ্কেতের কোন একটি উত্তর পান তখন বুঝতে পারেন যে, তিনি যে সংবাদটি পাঠাতে চান তা এবার ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌছবে।

যে সব বার্ত্তা সাধারণভাবে চারদিকে পাঠান হয়, তা' যে কোন যন্ত্র সেই বার্ত্তা গ্রহণের অনুরূপ শক্তিতে নিয়মিত করা থাকে, তার দ্বারাই গৃহীত হয়।

এই বেতার টেলিগ্রাফি যেন স্বর্গীয় দেবদূতের মত মর্ত্ত্যে নরনারীর কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হয়েছে। মানুষের যে কত শক্তি বেড়ে গেছে এই বেতার টেলিগ্রাফির প্রসাদে, তা তোমরা কল্পনা করতে পার।

এখনকারদিনে সমুদ্রগামী কোন ষ্টীমার বন্দর পরিত্যাগ করেও

বেতার টেলিগ্রাফ ষ্টেশন

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—১৬৮ পৃঃ
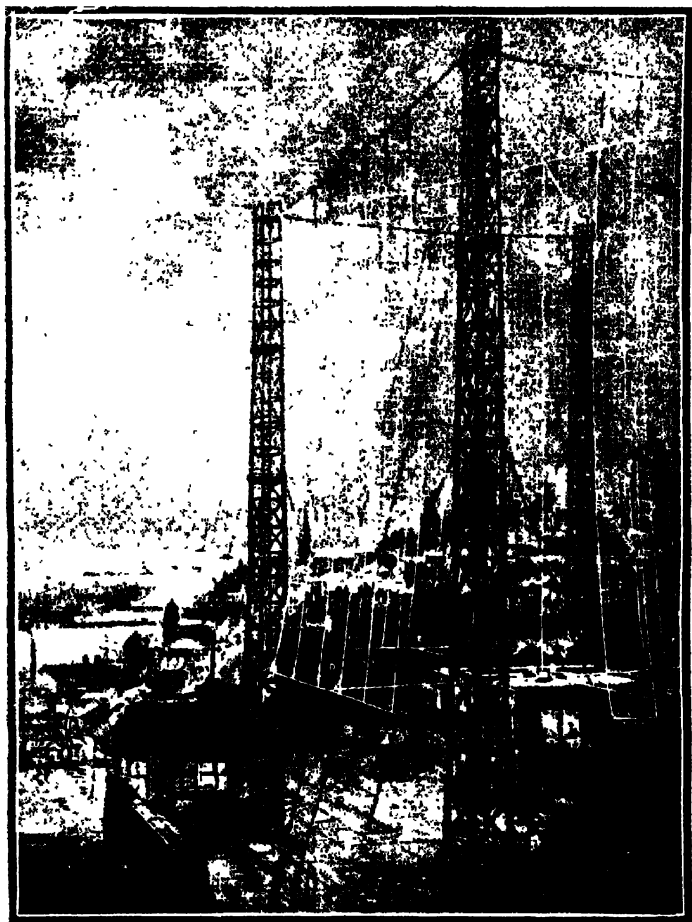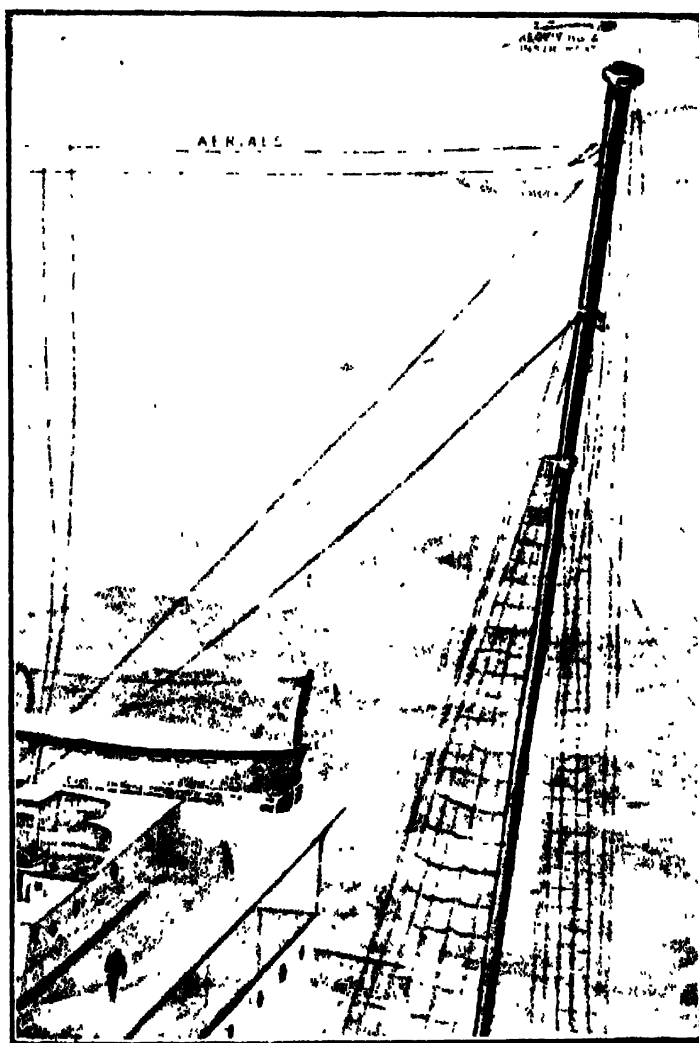
জাহাজে বেতারবা

নিয়তই উপকূলের সঙ্গে ও অন্যান্য সমুদ্রগামী ষ্টীমারের সহিত বেতার টেলিগ্রাফির সাহায্যে যোগযুক্ত থাকে। যদি কোন ষ্টীমার সমুদ্রবক্ষে কখনো বিপদাপন্ন হয়, তখন ত্বরিতে এই বেতার টেলিগ্রাফির সাহায্যে অন্য সমস্ত নিকটবর্ত্তী ষ্টীমার তা জানতে পেরে বিপন্ন যাত্রীদের উদ্ধার করে আনতে সক্ষম হয়। ষ্টীমার কোম্পানিগুলো এই বেতার টেলিফোনির নিকট অশেষরূপে ঋণী। বিগত মহাযুদ্ধের সময় বেতার টেলিগ্রাফির দ্বারা অনেক অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য সাধিত হয়েছে। যুদ্ধের সময় সমস্ত ষ্টীমার, সাবমেরিণ, এরোপ্লেন প্রভৃতি এই বেতার টেলিগ্রাফির সাহায্যে নিজদের স্ব-স্ব কেন্দ্রস্থানের সহিত যোগরক্ষা করে কাজ করতে সমর্থ হয়েছিল। বেতার টেলিগ্রাফি এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন অত্যাশ্চার্য্য উন্নতি লাভ করেছে যে, আজ ইহার প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও প্রভাব সমগ্র পৃথিবীব্যাপী হয়ে পড়েছে। মার্কণির বিনাতারে বার্ত্তা প্রেরণের কৃতকার্য্যতার ফলস্বরূপ এখন বেতার টেলিফোনিও সম্ভব ও সহজ হয়ে উঠেছে। এবার এই বেতার টেলিফোনি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

বেতার টেলিগ্রাফিতে ঈথর-তরঙ্গ সৃজন করে সঙ্কেতের সাহায্যে বার্ত্তা প্রেরণ ও গ্রহণ করা হয়, আর বেতার টেলিফোনিতে সঙ্কেত নয়, কিন্তু আমাদের কথাবার্ত্তা, গানবাজনা ও বক্তৃতা প্রভৃতি সবই বিনাতারে এক জায়গা হ'তে প্রেরকযন্ত্রের সাহায্যে পাঠান হয়, ও গ্রাহকযন্ত্রের সাহায্যে অন্য জায়গা হ'তে তা' সব বেশ শোনা হয়। সম্প্রতি আবার বেতারে ফোটো ও হস্তলিপি প্রভৃতিও পাঠান সম্ভব হয়ে উঠেছে। মাত্র অল্প কয়েক বৎসর হ'ল বেতার টেলিফোনির উদ্ভাবন হয়েছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তা'র অসাধারণ উন্নতি সাধিত হয়েছে। এখন পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায়, এই বেতার টেলিফোনের কাজ নিয়মিতরূপে চলছে।

এখনকারদিনে কোন এক জায়গায় একটি প্রেরক যন্ত্র রেখে, চারদিকে বক্তৃতা ও সঙ্গীত প্রভৃতি প্রেরণ করা হয়, আর যাঁরা এ সব শুনতে চান, তাঁরা তাঁদের বাড়ীতে একটি গ্রাহকযন্ত্র রাখলেই তা অনায়াসে শুনতে পারেন। এই যে চারদিকে গানবাজনা, বক্তৃতা প্রভৃতি একটি যন্ত্রের সাহায্যে বিনাতারে প্রেরণ করা হয়, একে বলা হয় ব্রডকাষ্টিং (Broadcasting)। বেতার টেলিগ্রাফে এক জায়গা হ'তে অন্য জায়গায় সংবাদ পাঠাতে হ'লে ঈথর-তরঙ্গ সঞ্চার করেই তা পাঠান হয় তা পূর্ব্বে বলেছি ; বেতার টেলিগ্রাফের এই ঈথর-তরঙ্গ, খণ্ডাকারে ও বিচ্ছিন্নভাবে তুলেই সঙ্কেত প্রেরণ করা হয়, কিন্তু বেতার টেলিফোনের জন্য এরূপ খণ্ড খণ্ড তরঙ্গ তুল্লে চলে না। কথাবার্ত্তা গানবাজনা প্রভৃতি এক জায়গা হ'তে অন্যত্র পাঠাতে হলে, ঈথরবক্ষে অবিচ্ছিন্ন, অবিরলপ্রবাহী তরঙ্গের সঞ্চার করা প্রয়োজন। বেতার টেলিগ্রাফের জন্য এভাবের অবিচ্ছিন্ন ঢেউ তোলার প্রয়োজন না হওয়াতে, তার কোন চেষ্টাই পূর্ব্বে হয়নি। কিন্তু বেতার টেলিফোনের প্রয়োজনে এরূপ ঢেউ তুলবার জন্য উদ্ভাবিত হল মাইক্রোফন নিয়মিত "ভ্যাল্‌ভ টিউব"। "ভ্যাল্‌ভ টিউব" উদ্ভাবনের দ্বারা টেলিফোনের ইতিহাসে এক যুগান্তর প্রবর্ত্তিত হল। এই নূতন যন্ত্রের সাহায্যে গ্রাহকযন্ত্র-গৃহীত অতি ক্ষীণ শব্দগুলোকেও লক্ষ লক্ষ গুণ পরিবর্দ্ধিত করা সম্ভব হল। খুব দূরদেশের সঙ্গে বেতার টেলিফোনে কথাবার্ত্তা বলতে হলে, প্রেরকযন্ত্রকে খুব শক্তিমান করে নিতে হয় ও গ্রাহকযন্ত্রের ক্ষীণ শব্দগুলিকে পরিবর্দ্ধিত করে তুলবার যন্ত্রাদিও যথাসম্ভব নিখুঁত ও নির্দ্দোষ করে নেওয়া প্রয়োজন।

ফোটগ্রাফ বা আলোকচিত্রের কথা

তোমরা ফোটগ্রাফের কথা সকলেই জান। তোমাদের নিজেদের বাড়ীতেই তোমাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব অনেকের ফোটো ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গান আছে দেখতে পাও। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত ক্যামেরার (camera) সাহায্যে ফোটো তুলতেও শিখেছ। কিন্তু এই ফোটগ্রাফ যন্ত্র কে উদ্ভাবন করেন ও কোন সময়ে তা প্রথম উদ্ভাবিত হয়, এ খবর তোমরা বোধ হয় অনেকেই জান না।

এখনকার দিনে ঘরেবাইরে চারদিকে ফোটোর ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়। তোমরা এই আলোকচিত্রের দ্বারা তেমন আর আকৃষ্ট হওনা যেমনটি হও একটি নূতন কোন বিস্ময়কর জিনিষ দেখলে। কিন্তু প্রথম যখন এই ফোটগ্রাফ যন্ত্রের উদ্ভাবন হয় ও সেই যন্ত্রের সাহায্যে ছবি তোলা হয়, তখন সে সব ফোটো সকলের নিকট পরম বিস্ময়কর জিনিষ ব'লে মনে হত। সে সময়ে এরকম আলোকচিত্রের দিকে অবাক হয়ে, বিমুগ্ধনেত্রে সবাই চেয়ে থাকৃত।

এই আলোকচিত্রের সাহায্যে, তোমরা যে সব আত্মীয় স্বজনদের কখনো দেখনি তাঁদেরও দেখবার তোমাদের সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটে, এবং নানাদেশের বিখ্যাত মহাপুরুষদের প্রতিকৃতিও তোমরা ঘরে বসেই মাসিক ও দৈনিক কাগজ প্রভৃতিতে দেখতে পাও। পৃথিবীর যাবতীয় দর্শনীয় বস্তুর ছবি তোমরা এই ক্যামেরার প্রসাদে অনায়াসে দেখতে পাও। আমাদের প্রিয় আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব যাঁরা ইহলোক ত্যাগ করেছেন, মৃত্যুর পরেও তাঁদের ফোটো দেখে তাঁরা যেন আমাদের নিকটেই আছেন এরূপ অনুভব করে আমরা কতকটা সান্ত্বনা লাভ করি।

এমন একদিন ছিল যখন এই ভাবে সকলের ছবি তুলে রাখা সম্ভব ছিল না। তখনকার দিনে আত্মীয়স্বজনদের মৃত্যুর পরে তাঁদের মূর্ত্তি স্মৃতি-পটে মাত্র আঁকা থাকত। ধনশালী লোকেরা অবশ্য তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের প্রতিকৃতি চিত্রকরকে দিয়ে আঁকিয়ে রাখতে পারতেন, কিন্তু সাধারণের পক্ষে হস্তাঙ্কিত চিত্র রাখা সম্ভব হ'ত না, কারণ এরূপ চিত্রাঙ্কন কার্য্য তখন একান্ত ব্যায়সাধ্য ছিল।

এখনকার দিনে এই ফোটগ্রাফির সাহায্যে সাধারণ গৃহস্থদের পক্ষেও নিজেদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের প্রতিকৃতি রাখা সম্ভব ও সহজ হ'য়ে উঠেছে।

কি কৌশলে ফোটো তোলা হয় সে সম্বন্ধে মোটামুটি দুয়েকটি কথা বলে, পরে এই ফোটগ্রাফ যন্ত্রের উদ্ভাবনকাহিনীটি তোমাদের বলব।

যে যন্ত্রের সাহায্যে ফোটো তোলা হয় তার নাম হ'ল ক্যামেরা (camera)। এই ক্যামেরার সম্মুখভাগে একখানি কাঁচ (Lens) বসান থাকে, ও সেই কাঁচের ভিতর দিয়ে আলো না প্রবেশ করতে পারে এজন্য তার মুখে একটি আচ্ছাদন লাগানো থাকে। এই আচ্ছাদন খানি যখন খুসী সরিয়ে নেওয়ার ও লাগাবার একটি কৌশল প্রায় প্রত্যেক ক্যামেরাতেই থাকে। যন্ত্রের যেদিকটায় এই কাঁচখানি বসানো থাকে, সেই মুখের দিকটা প্রয়োজন মত প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করবার মতন ব্যবস্থা করে প্রত্যেক ক্যামেরাটি তৈরি হয়। এইরূপ সঙ্কোচন ও প্রসারণের দ্বারা কাঁচখানিকে ঠিক রশ্মিকেন্দ্রে (Focus) স্থাপন করা যায়। ক্যামেরার সমুখস্থিত বস্তুর ছবি প্রথম এই কাঁচখানার ওপর এসে পড়ে। ছবিখানি ঠিক হয়ে পড়েছে কিনা দেখবার জন্য ক্যামেরার পেছন দিকটায় একখানা ঘসা কাঁচ বসানো থাকে। সম্মুখবর্ত্তী ছবিখানি লেন্সের ভিতর দিয়ে এসে প্রতিফলিত হ'য়ে এই ঘসা কাঁচখানির ওপর পড়লে দেখা

যায় ক্যামেরার সম্মুখের লেন্সখানি ঠিক রশ্মিকেন্দ্রে আছে কিনা। যখন দেখা যায় ছবি ঠিক হয়ে পড়েছে, তখন পেছনদিককার ঘসা কাঁচখানি তুলে নিয়ে, তার জায়গায় রাসায়নিক বস্তুতে প্রলিপ্ত একখানি কাঁচের প্লেট —যাকে বলা হয় "নেগেটিভ"—বসিয়ে দেওয়া হয়। এই নেগেটিভখানি বসানো হয় একখানি কাঠের কি টিনের খাপের ভিতর স্থাপন করে। এই খাপটি আবার তৈরি হয় এমন সুন্দর উপায়ে যে তার সম্মুখের ঢাকনিটি খুসীমত তুলে নিয়ে নেগেটিভের সামনের দিকটা খুলে দেওয়া যায়। নেগেটিভখানিকে একটি খাপের মধ্যে রাখা হয় এই কারণে যে, তাতে ছবি প্রতিফলিত হবার আগে কি পরে যদি আলো লাগে তবে তা দিয়ে আর ছবি তোলা যায়না। যেরূপ রাসায়নিক মালমসলা দিয়ে তা তৈরি হয়, ছবি পড়বার আগে তাতে আলো লাগলেই তা ছবি গ্রহণ করবার শক্তি হারিয়ে ফেলে। এই নেগেটিভখানি ক্যামেরায় বসিয়ে দিয়ে, পরে তার খাপের সম্মুখের ঢাকনিটি তুলে নিতেই তার সামনের দিকটা অনাবৃত হয়ে পড়ে। সে সময়ে ক্যামেরার লেন্সের মুখের পর্দাটি একবার সরিয়ে নিয়ে ত্বরিতে আবার তা' লাগিয়ে দেওয়া হয়। লেন্সের মুখের পর্দাটি সরিয়ে নিতেই সম্মুখস্থ বস্তুর ছবি লেন্সের ভিতর দিয়ে গিয়ে নেগেটিভের ওপর এসে পড়ে। বেশিক্ষণ লেন্সটি খোলা রাখলে আবার বেশি আলো লেগে নেগেটিভ নষ্ট হয়ে যাবার ভয় থাকে। ছবি তোলবার সময় কতক্ষণ লেন্সটি খোলা রাখা প্রয়োজন তা নির্ভর করে অনেকটা সেই লেন্সের ও বাহিরের আলোর শক্তির ওপর। যাঁরা ফোটো তোলেন তাঁদের এবিষয়ে খুব ভাল রকম জ্ঞান থাকে।

লেন্সের ভিতর দিয়ে সম্মুখের বস্তুর ছবিখানি এসে নেগেটিভের ওপর পড়তেই লেন্সের মুখের পর্দাটি ত্বরিতে আবার লাগিয়ে দেওয়া

হয়। এই ভাবে নেগেটিভে ছবিখানি গৃহীত হবার পরে, খাপের সম্মুখের ঢাকনিটি লাগিয়ে দিয়ে, তা' বের করে নেওয়া হয়। পরে কোন অন্ধকার ঘরে নেগেটিভখানিকে তার খাপ হ'তে খুলে নিয়ে, কয়েকটি রাসায়নিক মিশ্রণে তা ধুয়ে তার ওপরকার ছবিটিকে যথানিয়মে স্থায়ী করে নেওয়া হয়। এই নেগেটিভখানি একবার তৈরি হ'লে, তা হ'তে আলোকের সাহায্যে, রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত একরূপ ছাপবার কাগজের ওপর যত খুসী ফোটো তুলে নেওয়া যায়। এই হ'ল আলোকচিত্রের ভিতরকার মোটামুটি কথা।

এই উপায়ে ছবি তুলবার বুদ্ধিটি কার মাথায় প্রথম এল ও কে প্রথম এই ক্যামেরা যন্ত্রের উদ্ভাবন করলেন সে কথা এবার তোমাদের বলছি।

বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিকেরা কতকগুলো রাসায়নিক বস্তুর ওপর সূর্য্যালোকের প্রক্রিয়া কি রকম হয়, তা জানবার জন্য এ সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষা করতে আরম্ভ করেন।

সার্ হাম্‌ফ্রে ডেভি (Sir Humphrey Davy) প্রথম দেখতে পেলেন যে সাদা কাগজ সিলভার নাইট্রেটে (Silver Nitrate) ডুবিয়ে নিয়ে, তার ওপর কোন বস্তুর ছায়াপাত করলে, সেই ছায়াটি কিছুক্ষণের জন্য সেই কাগজের ওপর আঁকা থেকে আবার শীঘ্রই মিলিয়ে যায়। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কিছুতেই সেই ছায়াটিকে কাগজের ওপর স্থায়ীভাবে অঙ্কিত করে রাখতে পারলেন না। কিন্তু রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত কোন বস্তুর ওপরে ছায়াছবিকে (Sun Picture) গ্রহণ করে, তাকে স্থায়ী ভাবে অঙ্কিত করে নিতে প্রথম সফল হলেন তিনজন ফরাসী। এই আলোকচিত্রের সর্ব্বপ্রথম সাফল্যের সত্যিকার গৌরব তাঁদেরই প্রাপ্য। এই তিনজন ফরাসী হ'লেন নিপস্

(Niepce) ভ্রাতৃদ্বয় ও লুই জ্যাক্ দাগুয়্যার (Louis Jacques Daguerre)

জোসেফ্ নিপ্‌স্ (Joseph Niepce) একদিন একখানি নূতন অঙ্কিত ছবির উল্টোপিট খুব ভাল করে বার্ণিশ করে নিয়ে তাকে খুব স্বচ্ছ করে তুললেন। পরে বিটুমেন (Bitumen) প্রলিপ্ত একখানি ধাতুনির্ম্মিত পাতের ওপর তিনি ছবিখানি রাখলেন, এবং সেই পাতশুদ্ধ ছবিখানি নিয়ে সূর্য্যালোকে ধরলেন। দেখা গেল ছবির যে অংশ বেশ গাঢ় ছিল তার ভিতর দিয়ে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে নীচেকার ধাতুনির্ম্মিত পাতে পৌঁছতে পারেনি, কিন্তু ছবির যে যে অংশ বেশ হালকা ও পাতলা ছিল তার ভিতর দিয়ে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে নীচের পাতে বেশ একখানি ছবি এঁকে নিয়েছে। এই উপায়ে সর্ব্বপ্রথম নিপস্ এরকমের একখানি ফোটো তুলতে সক্ষম হলেন।

তিনি এই ছবিখানিকে ল্যাভেণ্ডার এসেন্স (Essence of Lavender) দিয়ে ধুয়ে স্থায়ী করতে সমর্থ হলেন। সার হ্যাম্‌ফ্রে ডেভি সিলভার নাইট্রেট্ দিয়ে যা স্থায়ী করতে পারলেন না, এবার নিপ্‌স্ ল্যাভেণ্ডার এসেন্স দিয়ে তাকে স্থায়ী করে তুললেন।

বিটুমেন প্রলিপ্ত ধাতুপাতের ওপর একখানি আলোকচিত্র অঙ্কিত করতে প্রায় ১০ ঘণ্টা সময়ের দরকার হ'ত। এজন্য নিপ্‌স্ এই উপায়ে কোন মানুষের ফোটো তুলতে পারলেন না। ১৮২৪ সালে তিনি এমন একটি ছবি এই উপায়ে অঙ্কিত করতে সক্ষম হলেন যা দেখতে হল অনেকটা আধুনিক ফোটগ্রাফের মত।

নিপ্‌স্ যখন এই কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন, বড়ই আশ্চর্য্য, ঠিক সেই সময়ে আর একজন ফরাসী লুই জাক্ দাগুয়্যারও কি করে ফোটো তোলা যায় সে চেষ্টায় রত ছিলেন। লুই দাগুয়্যার একজন দক্ষ চিত্রকর

ছিলেন। তিনি নানা রকম দৃশ্যচিত্র আঁকতেন। দাগুয়্যার প্রথম ডায়ওরামা (Diorama) চিত্রাঙ্কন উদ্ভাবন করেন। এই ডায়ওরামা চিত্র এক সময়ে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে খুব প্রচলিত ছিল।

ডায়ওরামা চিত্র বলা হ'ত নানা দৃশ্যাবলীর রঙীন স্বচ্ছ সুবৃহৎ চিত্রকে। যখন কোন অন্ধকার ঘরে এই চিত্রগুলি রেখে, পেছন থেকে বিবিধ রঙের আলো তার ওপর ফেলা হ'ত, তখন ছবিগুলোকে যেন সত্যিকার ছবি বলে মনে হত, ও তা ভারি সুন্দর দেখাত।

এই ডায়ওরামা চিত্র উদ্ভাবনের সময় দাগুয়্যারকে নিয়ত নানা রকম পরীক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকতে হ'ত। সে সময়ে তিনি নানাবিধ বস্তুর ওপর আলোকরশ্মির বিচিত্র প্রক্রিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করবার সুবিধা পান।

যখন দাগুয়্যার শুনতে পেলেন যে, জোসেফ নিপ্‌স্‌ সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে ছবি তুলে তা' স্থায়ীভাবে রক্ষা করতে কৃতকার্য্য হয়েছেন, তখন তিনি অবিলম্বে শাঁলে-সু-শায়োনে (Chalon-sur-saone) গিয়ে নিপ্‌সের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের উভয়ের মধ্যে অচিরে খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়। এই ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁরা দুজনে এ ব্যবসায়ে অংশীদার হ'য়ে একত্রে কাজ করতে আরম্ভ করেন। নানা রকম পরীক্ষাকার্য্যের পরে তাঁরা এবিষয়ে আরও অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কার করেন।

একদিন তাঁরা বিটুমেনের পরিবর্ত্তে আইওডিন দিয়ে "সিলভার প্লেট" প্রস্তুত করে দেখলেন যে, বিটুমেনের চাইতে আইওডিনে ঢের বেশি ফললাভ হয়। কিন্তু আইওডিন বিটুমেনের চাইতে শতগুণ ভালফল দিলেও, তাতেও যেন ছবিগুলো ঝাপসা ও অপরিষ্কার ভাব কাটিয়ে উঠতে পারল না। তাঁদের ওপর একদিন দেবতা সুপ্রসন্ন

হলেন। এবার দেবতা যেন নিজের হাতে তাঁদের এরূপ পরিশ্রম ও একনিষ্ঠতাকে এক সুন্দর সার্থকতায় মণ্ডিত করে দিলেন। যা' ঘটল তা বড় অদ্ভুত। দাগুয়্যার একদিন রাত্রে বিশ্রাম করতে যাবার পূর্ব্বে কয়েকটি কাঁচা "সিলভার প্লেট" একটি পাত্রের মধ্যে রেখে দেন। পরদিন সকালবেলা ঘুম হতে উঠে, প্রাতরাশ খেয়ে, সেই প্লেটগুলোকে বার করে আনতে গেলেন ও প্লেটগুলো দেখে অবাক্ হলেন। এ কি! এ যে সুন্দর ছবি প্লেটের ওপর আঁকা হয়ে রয়েছ। বেশ পরিষ্কার স্পষ্ট ছবি! তাঁরা হাজার চেষ্টা করেও কোন ছবিকে এমন পরিষ্কার ও পরিস্ফুট করে তুলতে পারেন নি। কোন কুহকিনীর যাদুবলে আজ যেন অসম্ভব সম্ভব হয়ে গেছে। বিস্ময়ে ও আনন্দে তাঁর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

কি করে এই অসম্ভব সম্ভব হ'ল তিনি তখন শুধু তাই ভাবতে লাগলেন। সেই পাত্রটিতে কোন্ কোন্ রাসায়নিক পদার্থ ছিল, তিনি তা বেশ ভাল করে দেখলেন। তিনি সে সব রাসায়নিক বস্তু দিয়ে আবার পৃথক্ ভাবে কাঁচা "সিলভার প্লেট" পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। পরীক্ষার দ্বারা তিনি বুঝতে পারলেন যে, সেই পাত্রটির মধ্যে যে পারা ছিল তাই সে রাত্রে এমন অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটন করে তোলে।

এই আবিষ্কারের পরে, অতি অল্পকালের মধ্যেই আলোকচিত্রের নানা দিক দিয়ে অশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম কাচের প্লেট উদ্ভাবিত হয়।

এখনকার দিনে চলমান বস্তুর ফোটো তোলাও অতি সহজ হয়ে উঠেছে। খুব দ্রুতগামী ট্রেন ও মোটরগাড়ীর ফোটোও এখন অতি সহজে তোলা যায়।

এখন এমন শক্তিমান লেন্স তৈরি হয়েছে যার সাহায্যে অনায়াসে মুহূর্তের মধ্যে যে কোন বস্তুর ফোটো তোলা যায়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ফিল্ম উদ্ভাবিত হয়। এরকম নানাবিধ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সাহায্যে, ক্যামেরার দ্বারা শুধু যে কোন বস্তুর প্রতিকৃতি তোলা কিংবা দ্রুত ধাবমান ট্রেন ও মোটরগাড়ী প্রভৃতির ছবি তোলা সহজ হয়ে উঠেছে তা নয়, ফোটগ্রাফির এরূপ অভাবনীয় ও অপ্রত্যাশিত উন্নতিতে সম্ভব করে তুলেছে আর একটি পরম আমোদপ্রদ জিনিষ—বায়স্কোপ। কি করে ফোটগ্রাফি বায়স্কোপের সৃজন করে তুলল, সে কথা পরে চলচ্চিত্রের কথা বলতে গিয়ে বলব।

বায়স্কোপ বা চলচ্চিত্রের কথা

তোমরা সকলেই বায়স্কোপ দেখেছ। বায়স্কোপের সাহায্যে দেশ দেশান্তরের যে কত ছবি, কত গল্প, ও কত বিচিত্র দৃশ্যাবলী দেখান হয় তা বলে শেষ করা যায় না। আমরা দূর দেশে না গিয়েও সে সব দেশের লোকজন, পথঘাট প্রভৃতির জীবন্ত ছবি এখানে বসেই বায়স্কোপের প্রসাদে সহজে দেখতে পাই। ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় প্রসিদ্ধ সহর লণ্ডন, প্যারি, বার্লিন, নিউইয়র্ক প্রভৃতিকে তাদের বিচিত্র নরনারী, বাড়ীঘর, যানবাহনসহ যেন কোন মায়াবলে এই অদ্ভুত যন্ত্রটি আমাদের সাম্‌নে উপস্থিত করে। পৃথিবীর যাবতীয় রম্য ও পরম বিস্ময়কর জিনিষ আজ ঘরে বসে আমাদের দেখা সম্ভব করে তুলেছে এই অপূর্ব্ব বায়স্কোপ। দেশ বিদেশের অচেনা নরনারী ও অজানা বস্তুসমূহ দেখবার মানুষের একান্ত বাসনাকে সফল করবার জন্যই বোধ করি ভগবান তার মনে এমন বুদ্ধিকৌশল সৃজন করে দিলেন, যা'তে তার পক্ষে এই বায়স্কোপযন্ত্র উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়ে উঠল।

বায়স্কোপযন্ত্রের উদ্ভাবন কি করে হ'ল, ও কে এই যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন সে কথা জানতে বোধ করি তোমাদের অনেকের ইচ্ছা হয়। এখন সে কথা তোমাদের বলব।

প্রায় একশ বছর পূর্ব্বে ফ্রান্সে একজন লোক একটি নূতন ধরণের খেলনা তৈরি করেছিল। এই অভিনব খেলনাটির নাম ছিল

"থমেট্রোপ" (Thaumatrope)। এই থমেট্রোপটি তৈরি হ'ল একখানা তাস ও একগাছি সূতোর সাহায্যে। তাসের একপিঠে আঁকা থাকত একটি ঘোড়ার ছবি ও অন্য পিঠে, ঠিক এই ঘোড়ার উল্টো দিক করে, একটি মানুষের ছবি আঁকা থাকত। এই সূতোগাছি খুব করে পাকিয়ে নিয়ে তা যখন হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া হ'ত তখন সূতোয় লাগানো কার্ডখানি সূতোর সঙ্গে বেশ জোরে ঘুরতে আরম্ভ করত, ও কার্ডের দু'পিঠে অঙ্কিত ছবি দুটি যেন এক হয়ে গিয়ে মনে হ'ত, মানুষটি ঠিক ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। এই সামান্য খেলনাটি তখনকার দিনে সকলের খুবই বিস্ময় উৎপাদন করে। এই খেলনাটি উদ্ভাবিত হবার পরে এরকমের আরও অনেক খেলনা তৈরি হয়।

এর পরে লণ্ডন সহরের একজন আলোকচিত্রশিল্পী (Photographer) একবার একটি ম্যাজিকলণ্ঠনে ছবি দেখাতে গিয়ে দেখলেন যে, ম্যাজিকলণ্ঠনের ছবিগুলি যদি খুব ক্ষিপ্রগতিতে আলোকের সম্মুখ দিয়ে চালান হয়, তবে তা যেন একটি সজীব, সচল ছবির মতন হয়ে ওঠে। এই আলোকচিত্রশিল্পীর নাম ছিল ফ্রিস্-গ্রীন্। ফ্রিস্ গ্রীন্ এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে নিজেই অতিমাত্র বিস্মিত হলেন। পরে তিনি এই উপায়ে স্বাভাবিক, গতিশীল ছবি দেখাবার জন্য খুব চেষ্টা করতে লাগলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রিস্-গ্রীন্ স্ফটিক-ফলকের ওপর পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত চিত্রশ্রেণীর এক একটি "সেট" অঙ্কিত করে, তা' লণ্ডনের আলোকচিত্র সমিতিতে প্রদর্শন করেন। যখন স্ফটিকফলকে অঙ্কিত ছবির এক একটি "সেট" খুব ক্ষিপ্রগতিতে আলোকের সম্মুখ দিয়ে চালান হ'ল, তখন সেই ছবিগুলি বৃহদাকারে সম্মুখের পর্দার ওপরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে সচল ও সজীব হয়ে দেখা দিল। এরূপ চলমান ছবি দেখে
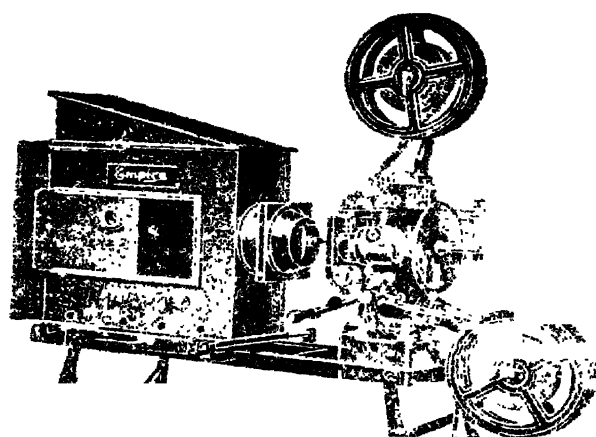
দর্শকবৃন্দ একেবারে অবাক্ হয়ে গেল। প্রথমে এরকমের যে সব ছবি তৈরি হয় তা'তে শুধু দৌড়ান, লাফান, বেড়ান এরকমের ছবিই বেশি ছিল। এভাবেই প্রথম বায়স্কোপের জন্ম হয়। ম্যাজিকলণ্ঠনের সাহায্যেই প্রথমে এরূপ চলমান ছোট ছোট নানারকমের চিত্রাদি দেখান হত।

ম্যাজিকলণ্ঠনের চিত্রাঙ্কিত স্ফটিক-ফলকগুলি ছিল বড়ই ভঙ্গুর। একটু আঘাতেই তা ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যেত। এই অসুবিধা দূরী-করণের জন্য এরূপ চিত্রাঙ্কনের উপযোগী স্বচ্ছ অথচ বেশ শক্ত কোন রকম জিনিষ উদ্ভাবন করবার জন্য ফ্রিস্-গ্রীন্ খুব চেষ্টা করতে লাগলেন। পরিশেষে সেলুলয়ড একাজে খুব উপযোগী হবে ভেবে তিনি তাই গ্রহণ করলেন। পার্কেস নামক বারমিংহামের একজন লোক এই সেলুলয়ড প্রথম প্রস্তুত করেন। সেলুলয়ডের ওপর অঙ্কিত চিত্রের দ্বারাই এখন চলচ্চিত্রের সমস্ত ফিল্ম প্রস্তুত হয়।

যতদিন না আলোকচিত্রের গুটানো ফিল্ম (Roll film) তৈরি হয়ে খুব ক্ষিপ্রতার সহিত সচল বস্তুর প্রতিমুহূর্ত্তের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা বিশেষের ছবি অবিচ্ছিন্ন ভাবে পর পর তুলে নেওয়া সম্ভবপর হ'ল, ততদিন পর্য্যন্ত বায়স্কোপের আর বেশি কিছু উন্নতি সাধিত হ'তে পারেনি।

ম্যাজিকলণ্ঠনের সাহায্যে চলমান চিত্র কিছু কিছু দেখান সম্ভবপর হ'লেও তা'কে ঠিক বায়স্কোপ বলা চলে না।

আমাদের বর্ত্তমান বায়স্কোপের উদ্ভাবনকর্ত্তা বলা যেতে পারে সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক তোমাস্ য়্যাল্‌ভা এডিসনকে। তিনিই প্রথম কাইনেটেস্কোপ (Kinetescope) যন্ত্রের উদ্ভাবন ক'রে, তা' প্রথম আমেরিকার যুক্তরাজ্যের চিকাগো সহরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রদর্শন করেন।

কাইনেটেস্কোপের একটি হাতল ঘুরালেই সেই যন্ত্রের ভিতরকার কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটো পর পর এমন দ্রুতগতিতে চোখের সাম্‌নে দিয়ে চলে যেত যে, সব ফোটোগুলো মিলে একটি গতিশীল ছবি সৃজন করে তুলত। তাঁর উদ্ভাবিত এই যন্ত্রই নানাদিক দিয়ে নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হয়ে বর্ত্তমান বায়স্কোপযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। অনেকের মতে এডিসন বায়স্কোপের উদ্ভাবনকর্ত্তা ব'লে স্বীকৃত হ'লেও, ঠিক এই ধরণের যন্ত্র স্বাধীনভাবে অন্য তিনজন ব্যক্তিও যে তাঁদের নিজ নিজ দেশে উদ্ভাবন কর্‌তে সমর্থ হয়েছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। ফ্রান্সে লুই-লুমীয়্যার, ইংলণ্ডে আর-পল ও ওয়াসিংটনে জেনকিস এরকমের ছোটখাট বায়স্কোপযন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন।

এডিসন, লুমীয়্যার, পল ও জেনকিসের সমবেত চেষ্টা ও সাধনার ফলে বর্ত্তমানের এমন সুন্দর বায়স্কোপযন্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়েছে। এঁদের সকলকেই বায়স্কোপযন্ত্রের উদ্ভাবনকর্ত্তা বল্‌লে মনে হয় যেন সুবিচার করা হয়।

পূর্ব্বে বায়স্কোপের ফিল্মগুলোর দোষ ছিল নানা রকমের। সে সব ফিল্মে কোন ছবিই তেমন পরিষ্কার উঠত না। সব ছবিগুলো কেমন ঝাপসা ঝাপসা দেখাত। কিন্তু এখনকার দিনে এই ফিল্মের নানাদিক দিয়ে এমন উন্নতি সাধিত হয়েছে যে, তাতে আর আগেকার কোন দোষই দেখা যায় না।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের আগে, বায়স্কোপে দেখান হ'ত চলন্ত ট্রেনের ছবি, মোটরগাড়ীর দৌড়ের প্রতিযোগিতা ও এই রকমের অন্য সব ছবি।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের পর হতে বায়স্কোপের সাহায্যে নানারকমের গল্প ও নাটকের নীরব অভিনয় দেখানই সব চাইতে প্রধান বিষয় ব'লে গণ্য হয়ে উঠল। ১৯১০ সালেও সকলেরই এই ধারণা ছিল যে,

যতদিন বায়স্কোপের নূতনত্ব থাকবে, ততদিনই তা টিকে থাকবে, আর এই নূতনত্বের মোহ যখন কেটে যাবে তখন বায়স্কোপ আর কেউ দেখতে চাইবে না। কিন্তু ফল হ'ল তার ঠিক উল্টো। যতই পুরানো হতে লাগল, ততই বায়স্কোপ সকলকে আরও বেশিরকম আকর্ষণ করতে লাগল। ১৯২০ সালে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বায়স্কোপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমোদপ্রদ জিনিষ বলে পরিগণিত হ'ল।

এই দশবছরের মধ্যে বায়স্কোপ অসাধারণ বিস্তার লাভ করে। ১৯২০ সালে হিসাব করে দেখা গেল, পৃথিবীর মধ্যে এই চলচ্চিত্রের ৪০,০০০ থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১৭,০০০, ইংলণ্ডে ৫০০০, জার্ম্মানিতে ১২০০, ফ্রান্সে ২৭০০, ইটালিতে ১০০০ এর কিছু অধিক, স্পেনে ১০০০, অষ্ট্রেলিয়ায় ৮০০, সুইডেনে ৭০০, জাপানে ৬০০। তা ছাড়া তখন ভারতবর্ষে ও অন্যান্য কয়েকটি দেশেও বায়স্কোপের সংখ্যা খুব কম ছিল না।

বায়স্কোপের ইতিহাসে আর একটি খুব প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হ'ল যখন সব দেশেই এক নির্দ্দিষ্ট মাপের ফিল্ম তৈরি করবার নিয়ম হয়ে গেল। এই নিয়মের ফলে যে কোন দেশে প্রস্তুত ফিল্ম যে কোন বায়স্কোপযন্ত্রে লাগিয়ে ছবি দেখান সম্ভব হ'ল।

ফিল্মগুলোর দু'ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুটো করা থাকে। তাদের নিয়মিত বহর হ'ল ১⅜ ইঞ্চি। তাদের এক একটি নাটাইতে (Reel) জড়িয়ে রাখা হয়। প্রত্যেক নাটাইতে সাধারণতঃ এক হাজার ফিট ছবির ফিল্ম থাকে। এখনকার দিনে রীল বলতে একটি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের পরিমাণ বুঝায়—যেমন দশ রীলের ছবি বললে বুঝায় দশ হাজার ফিট দীর্ঘ ছবির ফিল্ম। ফিল্মের দুধারে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুটোগুলো থাকে তা ছবি দেখাবার সময় বায়স্কোপের প্রক্ষেপক

যন্ত্রের একটি চাকার দুধারের দাঁতের সঙ্গে ঠিকভাবে লাগিয়ে দিয়ে, ফিল্মের রীলটাকে সেই যন্ত্রের আর এক অংশে বসিয়ে দেওয়া হয়। পরে একটি হাতল ঘুরিয়ে, কি বৈদ্যুতিক শক্তি যোগে সেই প্রক্ষেপক যন্ত্রের চাকাটি ঘুরাতে আরম্ভ করলে, তা রীল হতে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রাঙ্কিত ফিতেখানি খুব ক্ষিপ্রগতিতে টেনে নিতে থাকে। এই উপায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রগুলো একটির পর একটি খুব ত্বরিতে আলোর সাম্‌নে এসে পড়ে, ও বায়স্কোপের কাচের ভিতর দিয়ে গিয়ে তোমাদের সম্মুখের পর্দার ওপর বৃহদাকারে প্রক্ষিপ্ত হ'তে থাকে। এই পৃথক্ পৃথক্ চিত্রগুলো যন্ত্রের সাহায্যে এমন বিদ্যুৎবেগে তোমাদের সম্মুখ দিয়ে চলে যায় যে, তোমরা আর চিত্রগুলোকে আলাদা করে দেখতে পাও না, কিন্তু তাদের মিলনযোগে যে চলমান ছবিটি তোমাদের চোখের সাম্‌নে সৃজিত হয়ে ওঠে তাই দেখ। এক মুহূর্তে অন্ততঃ একফুট ছবির ফিল্ম তোমাদের সম্মুখ দিয়ে চালিত হ'লে তোমরা সচল ছবি দেখবে। ফিল্মের ছবিগুলো একটির পর একটি এত তাড়াতাড়ি তোমাদের সাম্‌নে দিয়ে চলে যায় যে, তোমরা তার কিছুই টের পাও না ; তোমরা যা দেখ তা হ'ল জলজ্যান্ত সত্যিকার ছবি। এই হ'ল বায়স্কোপের ভেল্কীবাজি।

এসব ভিন্ন ভিন্ন ফোটো-চিত্র কি ক'রে এভাবে দ্রুত চালিত হয়ে, একখানি পর্দার ওপর এমন অপরূপ বাস্তব রাজ্যের সৃজন ক'রে তোলে তা' সংক্ষেপে তোমাদের বলছি। ফিল্মে আঁকা ছোট একটি ফোটো-চিত্র যখন তোমাদের চোখের সাম্‌নে দিয়ে চলে যায়, তখন তা তোমাদের চোখের সাম্‌নে আর না থাকলেও, তার ছাপটি তোমাদের চোখের সাম্‌নে ক্ষণেকের জন্য আঁকা থাকে। আর তার ঠিক পরের চিত্রখানিও যখন বিদ্যুদ্বেগে তোমাদের সাম্‌নে দিয়ে যায় তাও চলে

যাবার সময় তোমাদের চোখের সাম্‌নে তার একটি ছাপ রেখে যায়। এই ছাপটি তার ঠিক পূর্ব্বেকার ছবির ছাপের সহিত মিলে যায়। এইরূপে ফিল্মের পর পর ছবিগুলো তোমাদের দৃষ্টির সাম্‌নে যথাক্রমে মিলে গিয়ে, এক অপূর্ব্ব উপায়ে সৃষ্টি করে তোলে জীবন্ত সচল ছবি। এ বিষয় তোমরা বড় হ'লে আরও ভাল করে বুঝতে পারবে।

এখনকার যে সব ছবি তোমরা বায়স্কোপে দেখ, তার সঙ্গে পঁচিশ বছরের আগেকার বায়স্কোপের ছবিগুলো তুলনা করে দেখলে, আগেকার ছবিগুলো দেখে তোমাদের খুবই হাসি পাবে। গত পঁচিশ বছরের মধ্যে বায়স্কোপের নানাদিক দিয়ে অসাধারণ ও অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি হয়েছে।

জগতে আজ পর্য্যন্ত যত বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন হয়েছে তার মধ্যে খুব কম উদ্ভাবনই এত অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর ওপর এমন আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে।

মানবসমাজের শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকেই দেখি, কি মানব সভ্যতার উচ্চতর বিকাশের দিক থেকেই দেখি, এমন কি শুধু নিছক আমোদের দিক থেকেও যদি দেখি, মনে হয়, এই চলচ্চিত্রের উদ্ভাবনটি জগতে একটি যুগান্তরের প্রবর্ত্তন করেছে।

যাঁদের অক্লান্ত চেষ্টা ও একান্ত সাধনার ফলে চলচ্চিত্রের আজ এমন অপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে, ও তা' দেশ বিদেশে এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, মানবসমাজ আজ তাঁদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন।